# দুই বাংলার সেরা গল্প

শ্যামল চক্রবর্তী
সম্পাদিত

বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

Dui Banglar Sera Galpa : Edited by—Shyamal Chakrabor

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬৭, ১৩৭৮

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীসতীশচন্দ্র সিকদার
বন্দনা ইম্প্রেশন (প্রাঃ) লিমিটেড
৯এ, মনমোহন বসু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

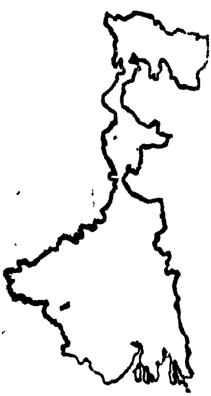
প্রচ্ছদ অঙ্কন :
শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত

ওপার বাংলার স্বাধীনতা মুক্তিকামীদের উদ্দেশ্যে



## ওপার বাংলার
## লেখক সূচী


মাছ/বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ১
রক্তাক্ত আলো এবং আত্মরতি/আজিজুল হক ৭
অনুক্ষণ অনুভবে/শামসুল আলম ২০
চন্দনে মৃগপদচিহ্ন/সাযযাদ কাদির ৩০
গোর নিদ্রা/শওকত ওসমান ৪০
হাত/রাবেয়া খাতুন ৪৬
বাসনার সৈকতে/আনিসুর রহমান ৫৩
বুড়িগঙ্গা/মীর আবুল হোসেন ৬৬
অপূর্ণ তুমি ব্যর্থ বিশ্ব/কায়েস আহমেদ ৭৪
অন্ধকার আছে/শেখ আতাউর রহমান ৮০
দূরদৃষ্টি/জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ৯৬
মন-গহন/কাজী আবুল হোসেন ১০৩

## এপার বাংলার
## লেখক সূচী


খরা/সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১১০
ঘরের পথ/শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১২৩
এক হাত গণ্ডারের ছবি/অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪১
কালবেলা/বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ১৫৩
রাখাল কড়াই/শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ১৭৪
ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন/মতি নন্দী ১৯৪
মৃত্যুর পথ/দিব্যেন্দু পালিত ২০৪
জহ্লাদ/পার্থ চট্টোপাধ্যায় ২১৪
মাটি/সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ২২২

মাত্র

বেলা

# সামান্য কিছু কথা…

র্ববাংলা—আজ 'বাংলাদেশ' মাধ্যমেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে রক্তপাত বীনতার অত্যুগ্র বাসনায়। এই দুঃসাহসিক ও মানুষের চিরন্তন আকাঙ্খার পূর্ণ দবার আয়োজন ওপার বাংলার সর্বস্তরের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের অন্তরে নানা প্রশাখায় পল্লবিত হচ্ছিল দীর্ঘ দুই দশক ধরে। বাংলা ভাষা আন্দোলনের মেই ওপার বাংলার ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও লেখক সম্প্রদায় স্বাধীন বাংলাদেশের এই দালনের সূচনা করেন। ওপার বাংলায় সাধারণ মানুষ বাংলা ভাষার প্রতি সীম অনুরাগ ও ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত বাংলা ভাষা-দুই বাংলার সমগ্র মানুষের সম্মুখে স্থাপন করে। গত দুই দশকে বাংলা ভাষার হিত্যের উন্নতিতে ওপার বাংলার তরুণ লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা স্বাধীনতাকামী রণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে অসামান্য প্রয়াসে ব্রতী হন। সৃষ্টি করেন বাংলার নিজস্ব সাহিত্য। যদিও রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর ও নানন্দের সৃষ্টি ও চিন্তাধারা তাঁদেরকে পথ নির্দেশ দিয়েছে তথাপি তাঁদের সৃষ্ট ত্য পূর্ববাংলার নিজস্ব ভাষা ও আকাঙ্খাকেই রূপ দিয়েছে। তাঁদের এই আশা খা নানাভাবে পল্লবিত হয়েছে ছোট গল্পের মাধ্যমে। গত দুই দশকে ছোটগল্প আশ্চর্যভাবে পূর্ববাংলার সাহিত্যকে মর্যাদা এনে দিয়েছে। আমরা এপার পার বাংলা ভাষাভাষী মানুষ, ওপার বাংলার এত নিকটে উপস্থিত থেকেও সেই দের সংবাদ এতদিন জানতে পারিনি।

বর্তমানের উদ্বুদ্ধ এই স্বাধীনতা যুদ্ধ দুই বাংলার মানুষকে এক আকাশ ও পরম নন্দের নৈকট্যে এনে উপস্থিত করেছে। আজ আমরা দুই বাংলার মানুষ পরস্পরকে নবার আগ্রহে ব্যাকুল, উভয়ের সাহিত্য ও চিন্তায় উৎসাহী। সেই অমূল্য ইচ্ছা আশায় এবং এই স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দুই বাংলার মানুষের চিন্তা ও খাকে একত্রে রূপ দেবার বাসনায়, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের দুই বাংলার তরুণ বা প্রতিনিধি স্থানীয় লেখকদের এই গল্প সংকলন সম্পাদনায় বিনীত ভাবে র হয়ে সমগ্র বাংলাদেশের সাহিত্যের পাঠকের নিকট সংকলনটি উপস্থিত করলাম। নির্বাচনে ও সময়ের স্বল্পতা এবং সংকলনের পরিসরের জন্য উল্লেখযোগ্য কজনের গল্প এখানে উপস্থিত করতে পারলাম না। কিন্তু, আশা করি ভবিষ্যতে রবর্তী সংস্করণে সেই ত্রুটি সংশোধন করতে পারবো। যেমন—ওপার বাংলার

গল্পকারদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা ও তাঁদের পরিচিতি দেবার ইচ্ছে আমার ছিল কিন্তু স্থানাভাবে সেও সম্ভব হল না। এই সংকলনে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের তরুণ গল্পকারদের রচনাই স্থান পেয়েছে, শুধুমাত্র ওপার বাংলার শওকত ওসমান ব্যতিক্রম। বিশেষ কারণেই শওকত ওসমান সাহেবের গল্পটি এই সংকলনে গ্রহণ করেছি। অন্য যাঁদের গল্প এই সংকলনে স্থান পেয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই তরুণ এবং দুই বাংলার আধুনিক গল্প আন্দোলনের প্রতিনিধি স্থানীয়। আমার বিশ্বাস—যদিও লেখকদের পরিচিতি দিতে পারলাম না, তথাপি তাঁদের গল্পের মাধ্যমেই পাঠক পাঠিকারা লেখকদের চিন্তা ও রচনা শৈলীর অন্তরঙ্গ স্পর্শ অনুভব করবেন। দুই বাংলার কয়েকজন শক্তিশালী তরুণ গল্পকারের গল্প এই সংকলনে স্থানাভাবে উপস্থিত করতে না পেরে আমি ব্যক্তিগতভাবে অসুখী এবং সম্পাদনায় তৃপ্ত হ'তে পারিনি। তথাপি যতটুকু কর্ম সম্পাদন করেছি, পাঠক পাঠিকা ও সাহিত্য রস পিপাসুদের নিকট তা তৃপ্তিদায়ক হলেই আমার আংশিক আনন্দলাভ ঘটবে।

এই সংকলনটি প্রকাশে শ্রদ্ধেয় শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমায় যে সুযোগ দিলেন, সেজন্য তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। দুই বাংলার গল্প মালাকে একত্রে তুলে ধরার চিন্তায় তিনিও সানন্দে আমায় উৎসাহ দিলেন, এই ঘটনায় আজো আমি বিস্মিত। আমার কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক বন্ধু সংকলনটির জন্য নানাভাবে আমায় সাহায্য করেছেন, তাঁদের ঋণও এই সঙ্গে স্বীকার করছি।

**শ্যামল চক্রবর্তী**

# মাছ

## বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

কার্তিকের শেষ, জলায় পানি কমে গেছে। ধানখেতের মধ্যে দিয়ে দাড়া বেরিয়েছে, নৌকা চলে ঐ পথে। ধানপাতার খসখস আওয়াজ ওঠে, শিশির ঝরে পড়ে গলুইয়ের ওপর, কোথাও মাছ ঘাই মারে।

পুকুরে পোনামাছ জিয়াবার মরশুম এখন। তাই চলেছি মেছোগাঙ্গে, বাড়ি থেকে দশ মাইল দূর। ভোর-ভোর পৌঁছুতে হবে, যাতে করে পোনা নিয়ে ফেরা যায় বিকেল নাগাদ। হাজারখানেক পোনা কেনার কথা, রুই, কাতলা, মিরকা, সঙ্গে বাবা দিয়েছেন ইসহাক মাঝিকে। পাটাতনের তলায় চ্ছল চ্ছল করে নাচছে পোনারা। সেই আওয়াজ যেন অবিকল শুনতে পাচ্ছি। ধলপহর দেখা দিয়েছে আকাশে, সামনের গলুইতে বসে বৈঠা মারছে ইসহাক, জলা পেরিয়ে গেছি, নৌকো এখন বলজরী খালে।

ইসহাক আশ্চর্য মানুষ। চেহারা দশাসই কিন্তু ভারী মিঠেল গলা। গুন্‌গুন্‌ করছে গলুইতে বসেঃ আসমানের তারা বাজানের মাথায়, আসমানের তারা মা-জানীর কবরে···।

খালের স্রোতের টান বাড়ছে। ঘরবাড়ি গাছপালা আবছায়া। দূরে উঁচু হয়ে আছে নারায়ণপুরের পুল। ঐ পুল চিহ্ন, দুপাশের গ্রামের নাম তাই মনে পড়ে গেল। ডানদিকে ভালোচ, মদ্দির ভাগ; বাদিকে দোজানা, এনাতপুর। ইসহাকের গলা ঘরবাড়ি গাছপালা পুল দু'পাশের গ্রামের ওপর দিয়ে যেন উড়াল দিয়ে যাচ্ছে।

ইসহাককে প্রথম কখন দেখি? মাছধরার সখ ছিল আমার। সময় পেলেই বেরিয়ে পড়তাম বড়শি নিয়ে। বড়পুকুরে মাছ নাকি গিজগিজ করে। পুকুরটি গ্রামের একটেরে, উঁচু পাড় পাহাড়ের মতো। একপাশে কবরস্তান, আম জাম গোলাপজাম বেতবন বাঁশঝাড়ে ভরা। দাদা পরদাদাদের আমলের কবর, কোনটি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, কোনটি গর্ত হয়ে

গেছে, আর কোনটিতে আগাছা বেড়ে উঠেছে। কেউ সহসা পা ওদিকে বাড়ায় না, সেজন্য হয়তো বড়পুকুরে মাছের কমতি নেই। সিঁদুরে গজার নাকি আছে, দশসেরী রুই-কাতলাও নাকি আছে। গুড়ি পানায় পুকুর ভরা, একটু ফাঁক করে বড়শি ফেলে বসে আছি, চোখ ফাৎনার ওপর, একহাতে মাছের আদার গোলা বানাচ্ছি, কেঁচো চিটেগুড় হিং উই পোকার গোলা, গন্ধে মাছের চারা পড়েছে, ফাৎনার কাছে ঘাই মারছে, তাই দেখে মনে হয় নিশ্চয়ই বড়ো মাছ, সাতসেরী আটসেরী তো হবেই।

পেছনে গুন্‌গুন্‌ শুনে ভয় ও অবাক দুইই হলাম। কে গান করছে এমন বিরান জায়গায়। হঠাৎ বাতাস লেগে শরশর করে কেঁপে উঠছে পাতা। নিজেকে সাহস দেবার জন্য বলে উঠলাম, কে?

মিয়াভাই আমি।

ইসহাক রেতের কাঁটা সরিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে। কালো দীর্ঘ দেহ, চোখের ভুরু ভারী, হাতে দা।

কখনো একে দেখেছি বলে মনে হয় না।

ইসহাক মনের কথা বুঝি টের পেল। একটু হেসে বলল, আমারে চিনবেন কি করে। শহরে থেকে স্কুলে পড়েন। আসেন হঠাৎ হঠাৎ। চাচাজানরে জিজ্ঞেস করবেন আমি কে।

গলায় সেই গানের সুর গুন্‌গুন্‌ করতে করতে ইসহাক ফের আগাছার আড়ালে গেল চলে।

ঘরে ফিরে বাবাকে বললাম সব। তিনি একটু চুপ থেকে বললেন, ওর নাম ইসহাক। বুনো বেদে হতচ্ছাড়া।

বাবার মুখ থেকে বুঝে নিলাম এর বেশী খবর মিলবে না।

সমবয়েসীদের জিগগেস করতেই অনেক খবর জানা গেল। ইসহাকের তিন কুলে কেউ নেই। থাকার মধ্যে আছে এক নৌকো। বেশ ক'বছর নাকি টিপরাদের মধ্যে থেকে এসেছে, বেজাত কাজ করেছে, এমনকি খেয়েছে নাকি শুয়োরের গোস্ত। হাজিগঞ্জে তার মেয়েমানুষ আছে, সপ্তাহে একবার করে সেখানে থেকে আসে। স্বভাবে বেপরোয়া, তবে ভারী সুন্দর গান করে।

আর খুব বিশ্বাসী। কোন কাজের ভার দিলে জান দিয়ে করে।

কেন জানি, হয়তো ঐসব শুনেই ইসহাকের প্রতি আমার মনের টান গেল বেড়ে।

আর গান। অমন গান কখনো শুনিনি। সেবারে কলেরা দেখা দিল আমাদের এলাকায় মহামারীর মতো। চারপাশের গ্রামে লেগেছে, শুধু আমাদেরটি বাদে। রোজই একজন দু'জন মারা যাচ্ছে। দিনের বেলা ঘর থেকে লোকজন কম বেরোয়, দোয়াদরুদ পড়ে, আর রাত কবরের মতো। এর মধ্যে শোনা গেল উজানের প্রথম নৌকো ফিরে এসেছে। গিয়েছিল ধান কাটতে, ফিরে এসেছে ধান নিয়ে। প্রথম নৌকোয় গেছে সমির আর গমির দু'ভাই। ঘাটে নৌকো ভিড়েছে, তাদেরও ভেদবমি শুরু হয়েছে। ভিন গ্রামের ইমাম সাহেব এসে খবর দিয়ে গেছেন। কে যাবে? ভয়ে কেউ এগোয় না। সমির আর গমিরের মা কেঁদে আকুল। কে যেন বলে উঠল, অত যখন কাঁদছ তুমিই যাও না, তোমারইত ছেলে, শুনে বুড়ি খেপে আগুন, আমি নিজে নড়তে পারি না, বাতের বেদনায় কাহিল, আর তোরা এমন করিস আমার সঙ্গে। এ গ্রামের কি হবে, খোদার গজব নাজেল হবে, বলে বলে বুড়ি কাঁদতে লাগল। সন্ধ্যা নেমেছে, আজান শোনা যাচ্ছে আর আজানের ফাঁকে ফাঁকে বুড়ির কান্না গেঁথে যেতে লাগল।

একটু বাদে দূর থেকে ভেসে এল গান: আসমানের তারা বাজানের মাথায়, আসমানের তারা মা-জননীর কবরে···। কথা ক'টি ডানা ঝাপটাতে লাগল পাখির মতো, যেন উড়ে আসছে বহুদূর থেকে। কলেরাক্রান্ত গ্রাম, ভয়, বুড়ির কান্না সবই ডুবে গেল গানের মধ্যে, শুধু গান সত্য হয়ে জেগে উঠল, কান খাড়া করে আমরা গান শুনতে লাগলাম, ঘাটের পথ থেকে ভেসে আসছে, দূরে যেখানে উজানী নৌকো গাবগাছের মতো ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে, যে নৌকোয় দু'ভাই কলেরায় হয়তো গোঙাচ্ছে, সেই সেখান থেকে গান ভেসে আসছে, গান যত স্পষ্ট হতে লাগল ততই দেখা গেল একটি মানুষ পিঠে বস্তার মতো কি নিয়ে আসছে, অন্ধকারে ঠাহর করে বোঝা যায় না।

ইসহাকের পিঠে সমির। বুড়ির দাওয়ায় নামিয়ে দিয়ে বলল, গমিরকে নিয়ে আসি।

কলেরা এতদিন অন্য গ্রামের বিষয় ছিল। এখন কলেরা গ্রামের মধ্যে, বাড়ির মধ্যে এসে গেছে। সেই ভয়ে বুড়ির দাওয়া শূন্য হয়ে গেল। আড়াল থেকে শোনা গেল কারো গর্জন : না হয় মরত ঘাটে। এখন কলেরা গ্রামের মধ্যে ঢুকেছে। কেউ বাঁচব না। বুড়ি ত মরার জন্য দাঁড়িয়ে, আমাদেরও শমন এসে গেছে।

গমিরকে নিয়ে এল ইসহাক পিঠে করে ?

বললাম, তুমি এলে কি করে।

একটু হাসল ইসহাক, কেরায়া নিয়ে গিয়েছিলাম। ঘাটে এসে দেখি দু'ভাই কাতরাচ্ছে। কি করি ফেলে ত দিতে পারি না।

আস্তে বললাম, ভয় করে না ?

হাসল বুঝি ইসহাক, না গো মিয়াভাই করে না।

ফের বললাম, যাচ্ছ কই ?

একটু থেমে বলল, হাজিগঞ্জ।

সেখানে কি ?

জানো না আমার মেয়েমানুষ আছে।

ইসহাক সেই গানের স্বর গুন্‌গুন্‌ করতে করতে ফের নাও-ঘাটের দিকে গেল চলে : আসমানের তারা বাজানের মাথায়, আসমানের তারা মা-জানীর কবরে।

দাওয়ায় পাশাপাশি দুই ছেলে শুয়ে, বুড়ি হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদছে, কেউ কোথাও নেই, শুধু দূর থেকে ভেসে আসা গানের স্বর বাদে।

সেই প্রিয় গান গুন্‌গুন্‌ করতে করতে এখন নৌকো বাইছে ইসহাক। ভোরাই তারা দপদপ করছে আকাশে। নারায়ণপুরের পুল কাছে এসে গেছে।

ইসহাক আচমকা বলে উঠল, মেলায় যাবেনি মিয়াভাই ?

কোথায় ?

শামপুর, মেছোগাঙ্গের ঐ পাড়।

আমি আস্তে আস্তে বললাম, বাবা যে বলে দিয়েছেন সকাল-সকাল পোনা নিয়ে ফিরতে।

সায় দিল ইসহাক, তাতো ঠিক।

শামপুরের মেলার কথা বহুদিন ধরে শুনেছি। এ তল্লাটের সবচেয়ে বড়ো মেলা বসে। এত কাছে এসেও দেখা যাবে না বলে মন গেল খারাপ হয়ে।

ইসহাক ফের বলে উঠল, জানো তিন সন আগে শামপুরের মেলায় বাচ্চা ছেলে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। সারাদিন মেলায় চরকির মতো ঘুরেছি। নিশুত রাতে কি খেয়াল হল কে জানে। নাও ছেড়ে উঠে এলাম। সার্কাসের তাবুর কাছে এসে দেখি একটি বছর চারেকের ছেলে কাঁদছে। কি করি কোথায় নিয়ে যাই। ছেলেটিও সঠিক কিছু বলতে পারে না। সার্কাসের লোকজন ঘুমিয়ে। ভালুকওয়ালার নাক ডাকছে। মেলার এমাথা-ওমাথা ঘুরলাম ছেলেটিকে কোলে নিয়ে। পরে গাঙ্গের পাড়ে এসে দেখি বেদের বহর বাঁধা, কে কাঁদছে ইনিয়ে বিনিয়ে। গলুইতে পা দিয়ে দেখি বেদে বৌ কাঁদছে ছেলের জন্য। সাপের খেলা দেখানোর ফাঁকে ছেলে গেছে হারিয়ে। কালো টান-টান শরীর, আর কি বাহারে ঘন লম্বা চুল। ছেলেকে কোলে তুলে দিলাম। বেদে বৌ কান্না থামিয়ে বলল, ছেলের বাপ নাই, তুমি হবা। জানো মিয়াভাই তিন সন ঘুরেছি বেদের বহরে, ফের একদিন ফিরে এসেছি বাড়িতে।

চুপ করে থাকলাম। কি জবাব দেব। অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। দু'টি একটি মাল বোঝাই নৌকো পাশ কেটে ভাটির দিকে যাচ্ছে। জেলে পাড়ার ঘাটে নাও ভেড়ানো, সরু গলুইগুলি গাছের ডালপালার মতো ছড়ানো। ইসহাক গুন্‌গুন্‌ করতে গিয়েও থেমে গেল। শুধু বৈঠার চ্ছল চ্ছল ছাড়া আর কিছু নেই।

হঠাৎ আওয়াজ ভেসে এলো, কে যায়। গলা মেয়ের, আমাদের দু'জনের কান খাড়া হল।

ইসহাক বলল, মেছোগাঙ্গে।

আমারে নিয়ে যাবা ? শামপুর যাব।

ইসহাক দ্বিরুক্তি না করে নৌকো ভেড়াল।

মাঝারী বয়েস মেয়েটির। পরনের কাপড় কেমন খোলামেলা। কালো ঠোঁটে পানের ছোপ লাগা, চুল থেকে নারকোল তেলের গন্ধ আসছে।

ছৈয়ের নিচে বসে বলল, আগুন আছে?

ক্যান?

বিড়ি খাব। শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে।

ইসহাক দেশলাই দিয়ে বলল, তা শামপুর কেন যাচ্ছ?

হাসল মেয়েটি, মেলায় বিস্তর কাম আছে।

আমার কেন জানি খারাপ লাগল। একটু দূরে সরে বসলাম।

মেয়েটি বলে উঠল, কি ঘিন লাগছে?

মুখে আমার কোন কথা জোগাল না। ইসহাক বৈঠা মারছে, ফের গুন্‌-গুন্‌ করা শুরু করেছে। ভোর হতে আরো ঘণ্টা দুই বাকী। মেছোগাঙ্গে পৌঁছোব, ভোরও হবে।

ইসহাক জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল। পরে গলা খুলে গান ধরল: আসমানের তারা বাজানের মাথায়, আসমানের তারা মা-জানীর কবরে…।

মেয়েটি হেসে উঠল জোরে, ক্যান এত দুখ কিসের?

হাসি আর গান পাল্লা দিয়ে বেজে উঠল দূর থেকে দূরে।

মেয়েটি ফের বলল, ঘুম পাচ্ছে জোর। হাই টেনে চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে থাকল।

ইসহাক হঠাৎ বলল, মিয়াভাই একটু বৈঠায় বসবা?

ওর হাত থেকে বৈঠা নিয়ে নিলাম। ইসহাক ঝাঁপ টেনে দিল নৌকার মুখে। মেয়েটির ফিসফিস কথা ভেসে এলো, পয়সা কামাতে কামাতে শরীর নষ্ট। যখন মন ধরে তখন মজা লাগে না। শরীরে সুখ আর নাই।

মনে হল গোঁ গোঁ করে মেয়েটি শুয়ে পড়েছে ইসহাকের পাশে। ইসহাক কি যেন বলল আস্তে আস্তে। খালের স্রোতে টান পড়ছে। বৈঠা মারার দরকার নেই। স্রোতের টানে নৌকো চলছে, আমি শুধু হাল ধরে। হঠাৎ ঘুম পেল আমার। মনে হল চোখের মধ্যে পোনামাছ লাফালাফি করছে।

———

# রক্তাক্ত আলো এবং আত্মরতি

## আজিজুল হক

দক্ষিণের জানালা খুলে দিয়েছিল। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকেছিল হয়তো। সে কথা অনেকক্ষণ ভুলে আনমনে এগিয়ে এসেছিল জানালার ফ্রেমের সান্নিধ্যে। ঠাণ্ডা একটা স্পর্শও লেগেছিল মুখের কোন এক জায়গায়। জানালার না বাতাসের, না কিসের সঠিক মনে নেই। মনটা হাসিনার শরতের হাল্কা মেঘের মত পৃথিবীর অনেক কিছুর ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে দিগন্তের ঘ্রাণ নিতে চায়। অথবা শেষ বিকেলের রোদের সংগে দিগন্তে মেঘের খেলায় আত্মস্থ হতে চায়। কী সে চায়! সত্যি মন তার অনেক ঝাপ্সা ঝাপ্সা, কখনো কখনো কট্কটে রঙ মিশিয়ে নিয়ে কী যে চায়—সে কি সত্যি তা জানে। অথবা জানতে বা ভাবতে যেতেই ভেতরটা গুলিয়ে ওঠে। জিভে বিস্বাদ জমা হয় মুহূর্তে। ঠাণ্ডা বাতাস আসা জানালা গলিয়ে থুথু ফেলে হাসিনা। চোখ নেমে আসে, স্থির হয় ঘনিষ্ঠ কাছে।

সাদা প্রকাণ্ড একটা গাড়ী আভিজাত্যের শৈথিল্য ছড়িয়ে গতি স্তিমিত করে তাদের বাড়ীর সামনে। দাঁড়িয়ে পড়ে একেবারে। একজন ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নেমে তাদের দরজার দিকে এগিয়ে আসেন। কলিং বেল বেজে ওঠে। একবার। তারপর আবার। তারপরও। আবার। এক টানা। অনেকক্ষণ। বিরক্তিকর।

কেউ তো নেই বাসায়। পিয়নটাও (অফিসের পর বাসায় কাজ করতে হয় বলে ফাঁকি দেবার কায়দা শিখে নিয়েছে) বোধহয় পালিয়েছে কাছের কোন পানের দোকানে বা চায়ের ষ্টলের আড্ডায়।

তাকেই যেতে হবে হয়তো। ভদ্রলোক চলে যাচ্ছেন না যখন। কী বিশ্রী! আবার থুথু ফেলতে হয় হাসিনাকে। এভাবে কারো সামনে যাওয়া যায় নাকি। (ভদ্রলোক বেশ ফিট্ফাট্। চেহারা দেখে বোঝাই যায় না যে নাছোড়বান্দা ধরনের। কিন্তু এতক্ষণে ধারণা হয়, সেই প্রকৃতির, না হলে চলে যাচ্ছেন না কেন?)

'আপনি—'

'জ্বী', বোধ হয় অন্য কাউকে সামনে আশা করেছিলেন; চকিতে সে ভাবটা গোপন করে বলেন, 'কবীর সাহেব কি বাসায় নেই!'

'জ্বী—না। বসুন।'

'হ্যাঁ, একটু বসি। কেন এসেছি বলেই যাই। আচ্ছা—'

'আমি তাঁর মেয়ে। বলুন, কি বলবো আপনার কথা?'

'তোমাকে কখনো দেখিনি। মণ্টুকে দেখেছিলাম। তখন ও ছিল বছর পাঁচেকের।' ভদ্রলোক চোখের কোণ প্রসারিত করে হাসিনাকে ভাল করে দেখতে উৎসাহী হন।

'কী, বড় ভাইকে তো। উনি করাচীতে থাকেন।'

'তা হবে। অনেকদিন হলো। ফেনীতে আমি ছাত্র ছিলাম তোমার আব্বার। অল্পদিন। বাইশ বছর আগে। সে বছর আমি ডিগ্রি পরীক্ষা দিই। দুই এক মাসের ছাত্র, তবু স্যারের সাথে—মানে তাঁর স্নেহের পাত্র হয়ে উঠেছিলাম। যাক। তুমি—তোমাকে তুমিই বলছি বলে কিছু মনে করো না।'

'বারে—তাই তো বলবেন। কত ছোট আপনার—বলুন।'

হাসিনা ভদ্রলোকের কাঁচা-পাকা পাতলা হয়ে আসা চুলের মাথার দিকে তাকায়। ভদ্রলোক একটু দমে যান।

গলার এতক্ষণের স্বাভাবিকতা হারিয়ে বলেন, 'বলো আমি এসেছিলাম। কয়েকদিন হলো এখানে বদলি হয়ে এসেছি। শুনলাম স্যার এখানে আছেন। তাই দেখা করার জন্য ছুটে এলাম।'

'জ্বী, বলবো। কিন্তু—।'

'নাম তো। বলো মিঃ শাফিক দীন, মানে শাফিক। তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুশী হলাম।'

হাসিনার সারা শরীরে এবার মুগ্ধ দর্শকের মত চোখ ছড়িয়ে দেন শাফিক দীন। প্রাকৃতিক মানচিত্র দেখার বিচিত্র আকর্ষণের চমক তাঁর দৃষ্টিতে চক্‌চক্‌ করে।

হাসিনা চোখ নামিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলে, 'আব্বাকে বলবো। আপনি আবার আসবেন।'

'আসবো, নিশ্চয়ই আসবো। স্যারের সংগে দেখা তো হলোই না। দেখবে তিনি কত স্নেহ করেন আমাকে।'

হাসিনা মিষ্টি করে নীরবে হাসে। শাফিক দীন চলে যান। একটু পরিমিত অথচ যেন কত পরিচিত হাসি উপহার পায় হাসিনা।

এবং সে জন্যেই ভেতর থেকে উঠে আসা এক ঝলক লালার মত পদার্থ ঢোক গিলে ফেলে। হঠাৎ তার ভাল লাগে। ছুটে গিয়ে জানালায় দাঁড়ায়—যদি সেই রাস্তায় ডানা মেলানো সাদা গাড়ীটা দেখা যায়। না। চলে গেছে। রাস্তা জুড়ে রেখে গেছে চাকার অগণিত সুস্পষ্ট চিহ্ন। ( ভদ্রলোকটি কিন্তু বেশ ! )

তারপরও হাসিনা দাঁড়িয়ে থাকে। সন্ধ্যার কপালে বেশ বড় করে টিপ একে দেয় চাঁদ। হাসিনার চোখে তার ছায়া। মন মেঘের সাথে লুকোচুরি খেলতে খেলতে চাঁদের বুড়ির মত বোনে অনেক কথা। বোনে ঘটনার জাল দিয়ে কথামালা। নিজের মনের মত করে সাজিয়ে তোলে সব। নিজেকে প্রসাধন দিয়ে সাজিয়ে সুন্দর করে তোলার মতই।

ইতিমধ্যে আসা-যাওয়া হয়েছে অনেক। সামাজিকতা অন্তরংগতায় গাঢ় হয়েছে। শাফিক দীন এ পরিবারে ঘনিষ্ঠতা প্রসারিত করেছে আপন জনের মতো। কত বড় চাকুরী করে, অথচ কত সহজ। অনেক বিস্ময় হাসিনাও নিজের করে নিয়েছে। একজনের জীবনে কত ঘটনা আছে, আছে কত ব্যথা, বেদনা সুখ-দুঃখের জ্বালা-যন্ত্রণা—এ সব জানা হয়েছে তার অসীম কৌতূহলে। সহানুভূতিতে ভরে উঠেছে মন। এত বড় মানুষ, কত বড় প্রাণ, কত কথা ; কিন্তু কত দুঃখ। পাষাণও গলে, হাসিনা কি পারে না ! তার জীবন যেন এক বঞ্চিতের বিমূর্ত শিল্প। কখনো বিস্মিত হয়, এত বয়সে এমন স্মার্ট আছে কি করে ভদ্রলোক। নতুন করে এক অতৃপ্তির গভীরতায় ডুবে যায় হাসিনা।

আজকাল প্রতীক্ষা করতে ভাল লাগে। মনের একটা স্তর যেন অতিক্রম করে ফেলেছে। ঝেড়ে ফেলেছে দ্বিধা, সংশয় এবং অনিকেত গোপনতা। ঘন ঘন থুথু ফেলার ইচ্ছা তার নষ্ট হয়ে গেছে। শরীরটাও বেশ ভাল যাচ্ছে। আগেকার অলস অবসন্নতাও নেই। বুকের ভেতরটা অকস্মাৎ

ধড়্ ফড়্ করে না। বরং লক্ষ্য করেছে, বুকের রূপরেখা সমতল থেকে সুস্পষ্ট হয়ে নিজের অস্তিত্বের আকর্ষণ সৃষ্টি করছে। দেহের কতকগুলি ভাঁজও তার চোখে পড়ছে। বিশেষ করে, শাফিক দীন যখন কথা বলতে বলতে সুকৌশলে সেদিকে তাকিয়ে নেয়, তখন মনে মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়ের উত্তেজনা অনুভব করে। একটা শারীরিক অভূতপূর্ব যন্ত্রণায় কাঁপতে ভাল লাগে তার। তখন অনেক কাছে যায় শাফিক দীনের আবার ফিরে আসে ইংগিতের প্রগলভ্ আচরণ থেকে। এ এক ইঁদুর-বেড়াল খেলার রহস্যময়তা তাকে পেয়ে বসে। শাফিক দীন এ খেলার সুচতুর পরিণত ইঁদুর যেন। আর মনে মনে হাসিনা বেপরোয়া খেলার স্বাদে।

প্রায় বিকেলে শাফিক দীন আসেন। হাসিনা বেড়াতে যায়। ভালবাসেও। বিশেষ করে একটা প্রকাণ্ড গাড়ীর সীটে আলতো হেলান দিয়ে দৃশ্যের পর দৃশ্যের মাঝ দিয়ে নিজেকে গতিশীল অনুভব করতে ভাল লাগে তার। এ সব হয় তার ইচ্ছায়। নিজের ইচ্ছার এত দাম সে কি কখনো ভেবেছে। ইচ্ছার যন্ত্রণায়, ইচ্ছার ভাললাগার এতরূপ সে কি কখনো অনুভব করেছে। তার কথাতেই আজ বানেশ্বর, কাল প্রেমতলী, কখনো নৌহাটা, কখনো নাটোর। কি আশ্চর্য! এ কি সেই হাসিনা। শাফিক দীন শতপাকে জড়ায়। রোগা পাতলা ছোট্ট মত মেয়ে। পাণ্ডুর লাবণ্যের ভারে অবনত যার শ্যামল রূপ। সে কিনা তার মত এক প্রবীণ মানুষের ব্যস্ততার পরম উৎস। তাই নিজের স্মৃতির তারুণ্যের আস্বাদ চেখে দেখার জন্য বারবার ছুটে আসেন। অন্তহীন চলায় ছুটতে চান।

তবু হাসিনা বলে, 'এতো দেরী। খুব বুঝি কাজ ছিল?'

'দেরী কোথায়। এই তো পাঁচটা।' শাফিক দীন অভ্যেস মত হাত-ঘড়ি দেখেন।

'ঘড়িতে কি মনের দেরী ধরা যায়। তুমি কিচ্ছু বোঝ না। নাও, চল। নাহলে ফিরতে রাত হবে যে।' হাত ধরে হাসিনা টেনে নিতে চায়।

'তুমি দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ।' হাত ছেড়ে গাড়ীর দরজা খুলতে খুলতে বলেন শাফিক দীন, 'আজ কোন দিকে?

'পশ্চিমে এবং প্রেমতলী।'

উচ্চ কণ্ঠে হাসি শুরু করে আভিজাত্যে ফিরে আসেন শাফিক দীন, 'কত সুন্দর করে কথা বলতে পারো। অথচ দেখে মনেই হয় না তুমি এত কথা জানো?'

'তোমাকে দেখে কি মনে হয় তুমি আমাকে নিয়ে প্রেমতলী যেতে পারো।'

'শুধু প্রেমতলী কেন' নীচুগলায় শাফিক দীন বলেন, 'তুমি বললে আমি মিলনপুরও নিয়ে যেতে পারি।' রসিকতার পর কেমন যেন বিবর্ণ দেখায় শাফিক দীনের মার্জিত চেহারা।

'যা! কি যে বলো। মিলনপুর কোথায়?'

এবার সহজ হন শাফিক দীন, 'কেন যেখানে তোমার আমার মিলন হবে—সেই জায়গা।'

'সেই জায়গায় কি আমরা পৌঁছিনি?'

'না হাসি, এখনো পৌঁছিনি। তোমার লজ্জা এখনো অদৃশ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে আছে।' শাফিক দীন আরো কিছু বলতে চান।

হাসিনার সত্যিকার লজ্জা বাধা দেয়,—'কি যে বলো। যাক্ না কিছুদিন। ইস্, আর একটু হলেই লোকটা চাপা পড়েছিল আর কি।'

ছোট রাস্তার ভীড়ের মধ্যে চলার অতি-সাবধানতা আর নেই। সামনে প্রসারিত ফাঁকা দীর্ঘ রাস্তা। ছুটে চলে গাড়ী। হাসিনা বাইরে তাকায়। দ্রুত সরে যাচ্ছে সব। গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর, পড়ন্ত রোদে ভেজা গ্রাম চাপ চাপ সবুজ স্মৃতির মত সরে সরে যাচ্ছে। ক্রমাগত পিছনেই যাচ্ছে। হাসিনা সামনে চলেছে, পাশে শাফিক দীন। আর সব পিছনে। কত অনুভূতি, কত ঘটনা, হয়তো বা সারা অতীতটাই। ক্ষতি কি? হাসিনা তো সামনেই চলতে চেয়েছিল। এক্ষেত্রে শাফিক দীন তার অনিবার্য সাথা। পরিণত বয়সের নিরাপত্তা। নিজেকে তাঁর হাতে সমর্পণ করতে কোনো দ্বিধা নেই হাসিনার। ইতিমধ্যে নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে পরীক্ষা করেছে সে। শাফিক দীনকে তার আদর্শ মনে হয়েছে। কোন প্রতিবাদ নেই, নেই তা পালনের কোনো সামর্থ্যের অভাব। তাইতো হাসিনা এতো নিজেকে উন্মুক্ত করেছে তাঁর কাছে। অতীতের চেয়ে বর্তমানের উষ্ণতা অনেক মনোরম।

খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে হাসিনা। শাফিক দীন স্পীড কমিয়ে ফেলেন। সামনে একটা দীঘির উঁচু পাড় দেখে ব্রেক করেন, 'চলো ওখানে বসি। ছায়াঘেরা দীঘির ধারে বেশ ভাল লাগবে।'

'বেশ তো।'

শাফিক দীন নিজেই অবাক হয় কোথায় তার রোমান্টিক মন এত দিন ঘুমিয়ে ছিল। নাকি সাহচর্যের ফল। তাই বলতে পারেন দীঘিটার পাড়ে বসতে যেয়ে, 'কি ভাষাময় পানি, না! ঠিক তোমার চোখের মতো।'

'সে তো তোমার চোখে।' হাসিনা মিষ্টি করে হাসে। প্রসারিত হাসি। ইচ্ছা করলেও বেশী ব্যবহার করা যায় না। হাসিনা জানে এর ব্যবহাররীতি। অন্যকে মুগ্ধ করতে কতটা প্রয়োগ করতে হবে। শরীরের অন্যান্য প্রকাশিত অংশের আকর্ষণের সাথে কতটা হাসির পাঞ্চ মিশিয়ে দিলে অন্যের স্নায়ু অবশ হয়ে ওঠে।

এমনি অবশ শাফিক দীন বলেন, 'তুমি খুব সুন্দর করে কথা বলতে পারো।'

হাসিনা বাঁকা চোখের কটাক্ষে বলে, 'তোমার চেয়েও। কি সুন্দর তোমার কথার ধরণ, যেন একটা পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। এ জন্যেই আমার ভাল লাগে।'

শাফিক দীন অভিভূত হয়ে পড়েন। এমন করে তাকে কখনো কেউ বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করেনি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ দিনের কথা বলার অভ্যেসকে কেউ মূল্য দেয়নি। অথচ এই রোগা ছোট মেয়েটি তাকে সহজেই চিনতে পেরেছে। আবেগে শাফিক দীন বলেন, 'তুমি আমাকে মূল্য দিয়েছো হাসি। আমি চাই চিরদিন তুমি আমার হয়ে থাকো। বলো, কথা দাও।'

'আ! কী যে করো। হাত ছাড়। কেউ দেখে ফেলবে।' নিজেকে মুক্ত করে হাসিনা। কিন্তু শাফিক দীনের অসহায় ব্যাকুলতা তার অন্তরে গাঁথা হয়ে যায়। এই কি চেয়েছিল সে! এমন মানুষের আর্তনাদের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেবে। কে জানে। বলে সে, 'আজ নয়। অন্যদিন। চলো আজ উঠি।'

তবু এ আনন্দ হাসিনা অস্বীকার করতে পারে না। একটা মানুষকে অধিকার করা রাজ্য জয়ের চেয়ে কম কিসে। বিজয়ীর ইচ্ছা-অনিচ্ছায় একটা রাজ্য চলে—তাঁর ইশারায় চলবে একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ। ফিরে আসার সময় বিশ শতকের জার্মাণ কোম্পানীর গাড়ীকে হাসিনার মনে হয় প্রাচীন কালের রাজপুত্রের রথ। মেঘের পর মেঘের স্তর অতিক্রম করে ক্রমশঃ ওপরে উঠছে। ঘন মেঘ-স্বপ্নের মধ্যে আর কেউ নেই। সে আর শাফিক দীন। সামনে সোনালী ভবিষ্যতের নিশ্চিন্ত দিগন্ত। হাসিনা বিভোর।

আরো দিন যায়। শাফিক দীন জোর করেন না। তাঁর পরিশীলিত ব্যক্তিত্ব নীরবে প্রতীক্ষা করে। তবু তাঁর সংশয় কাটে না। বয়সের ব্যবধান তো আর অস্বীকার করা যায় না। তবু এটুকু বুঝে নিয়েছেন, হাসিনা মত দিলে কেউ কোনো কথা আর তুলবে না। কিন্তু হাসিনা এত দেরী করছে কেন। কি এত তার ভাববার থাকতে পারে। না কি তার পদ্ধতিতে কোথাও ভুল থেকে গেছে যার জন্যে এত সময় নিচ্ছে হাসিনা। রুগ্ন মেয়েটার মনটা কিন্তু বেশ শক্ত। তা হোক। আর সবুর করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। দীর্ঘ দিনের অবদমিত প্রাকৃতিক যন্ত্রণা তাঁকে ক্রমশঃ উন্মত্ত করে তুলছে। কে জানে হঠাৎ কখন প্রকাশিত হবে আর হাসিনা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যাবে। এসব ঘটার আগেই একটা শেষ সিদ্ধান্ত বের করতে হবে হাসিনার মুখ থেকে।

এ জন্য প্রায় ছুটে আসেন শাফিক দীন,—'আজ কোন দিকে, নৌহাটা -বানেশ্বর-নবাবগঞ্জ না নাটোর।' উৎফুল্ল তারুণ্যময় চেহারা তাঁর। বয়স যেন এক ধাক্কায় কয়েক দশক পিছনে নেমে গেছে। চোখে দীপ্তি, কথায় চাঞ্চল্য, মনে আবেগ। প্রবীণের ক্যানভাসে তরুণ নায়ক যেন।

হাসিনাও সপ্রতিভ প্রাণবন্ত। শাফিক দীনের চোখে দেখে নিজেকে। সভাঁজ দেহে বাঁকা তলোয়ারের চমক। বিমুগ্ধ শাফিক দীনকে বলে, 'নাটোর'।

'বেশ।'

বুক ভরে নারী দেহের একরাশ গন্ধ নিয়ে ড্যাশ বোর্ডে চাবি ঘুরান

শাফিক দীন। গুমরে ওঠে যান্ত্রিক অনুভূতি। গতিশীল হয়ে ওঠে হাসিনার আধুনিক রথ।

উইণ্ড-স্ক্রীন নামিয়ে হাসিনা অলসভাবে দৃষ্টি মেলে দেয় পথের ওপর, কখনো দৃশ্যের ওপর। শহর এলেকা শেষ হয়। ভীড় কমে আসে। মতিহার। বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রাবাস। হঠাৎ বুকের ভেতরে কেমন করে ওঠে। ছবি বা দৃশ্যের জন্য নয়, শুধু একটা আকাঙ্ক্ষিত অনুভূতির জন্য। মুহূর্তে পিছনে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলেকা। উঃ! মুক্ত বাতাসের কি স্বাদ! হয়তো মুক্তিরও। না, কোন অতীত নেই হাসিনার। শুধু তার বর্তমান —আর ভবিষ্যৎ।

'কি ভাবছো।'

'তোমাকে?'

সুন্দর মিথ্যে। কিন্তু তার ক্ষমতা অসীম। সত্য কি অপ্রিয়। হয়তো। বাস্তব রূঢ়। অনেক যন্ত্রণার উৎস। তার চেয়ে মিথ্যেয় দোষ কি। সুন্দর সব সময় সুন্দর, তার জন্ম যেখানেই হোক না কেন? শাফিক দীন প্রস্তুত তাঁর সম্পদ, তাঁর প্রতিষ্ঠা, তাঁর নিরাপত্তা, তাঁর মনোরম ব্যক্তিত্ব নিয়ে। কাজেই দেরীর কোন সু-অর্থ হয় না।

মাঝপথে অকস্মাৎ বৃষ্টি নামে। শাফিক দীন বলে,—'আমাদের যাত্রা শুভ, তাই না। দেখো, কেমন বৃষ্টি নেমেছে।'

'হবে হয়তো।'

'কেন?'

'আমি জানতাম আকাশ কাঁদে যখন, বৃষ্টি তখনই নামে।'

'তাই নাকি?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা হাসি, এত কম কথা বলছো কেন?'

'সারা জীবন অনেক বলতে হবে তাই।'

'সারা জীবনের কথা তুমি ভাব?'

'তোমার জন্যে ভাবতে হচ্ছে।'

বাঁচলাম।' অনেক দিনের জমা দীর্ঘনিঃশ্বাস বের করে দেন শাফিক দীন।

'আমিও। আর পারছি না নিজকে বহন করতে।'

'সামনে রেষ্ট হাউস। চা খাওয়া যাক। যাবে?'

'চলো।'

পেয়ালায় চুমুক দিয়ে শাফিক দীন শুধান,—'কখন সিদ্ধান্ত নিলে?'

'পথে। মতিহার পেরিয়ে।'

'মতিহার কেন?' কৌতূহলী হন শাফিক দীন।

'ওখানে পড়তাম কিনা। তাই ভাবলাম কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে ওখানটা পেরিয়ে নেওয়াই ভাল।'

'যাকগে ওসব। আমি জানতাম তুমি আজ কিছু বলবে। স্যারকে আজ বলি, কি বলো!'

'যেমন বোঝ।'

এক ঝলক সুবাতাস বয়ে যায়। এক জোড়া কপোত-কপোতী রেষ্ট-হাউসের প্রাঙ্গণে বাক্‌ম বাক্‌ম করে। দুটো শালিক শেষ বিকেলের বৃষ্টিতে ভিজে চুপসে কোথা থেকে উড়ে আসে। তারা একে অন্যের উত্তাপে নিজেকে শুকিয়ে নিতে চায়। তাদের দেখে হাসিনা বলে, 'টু ফর জয়।'

জিজ্ঞাসা করেন শাফিক দীন, 'হানিমুনে কোথায় যাওয়া যায় বলতো।'

'নেপাল গেলে কেমন হয়! পাহাড়ের উপর ছোট্ট বাড়িতে থাকবো। নীচে দূরের গ্রামগুলি কি সুন্দর না লাগবে। পাহাড় থেকে পায়ে-চলা পথ নেমে মিশেছে সেই গ্রামগুলিতে। কখনো ভোরে, কখনো বিকেলে আমরা হারিয়ে যাব সেই পথ ধরে। দু'জনে হারিয়ে যাব। কেমন ভাল লাগবে না!'

'চমৎকার। তোমাকে এজন্যই ভাল লাগে। আমার মনের কথা কত সহজে তুমি প্রকাশ করতে পারো।' শাফিক দীন তার হাত নিয়ে খেলা করেন।

হাসিনা একসময় বলে, 'চলো। আর কত দেরী করবে?'

'চলো।'

আবার পথ।

পথে কত নেশা, কত সম্ভাবনা। হাসিনা অমন করে কখনো অনুভব

করেনি। সব পথই কি এমনি জীবনের রোমে পৌঁছে? তন্ময় হয়ে ভাবছিল সে।

ঘটনাটি ঘটল এই সময়। অপ্রত্যাশিত। চেতনার গভীর থেকে ছিটকে বাইরে পড়ে হাসিনা। একদল লোক তাদের গাড়ী থামিয়েছে। হৈ-চৈ কোলাহল। বিচিত্র শব্দের ভীড় থেকে কানে আসে এ্যাকসিডেন্ট। চমকে ওঠে হাসিনা—কার? তাদের গাড়ী তো কোন এ্যাকসিডেন্ট করেনি। তবে?

একজন লোক ঘটনাটি বলে। ছুটে আসা ট্রাকের সামনে থেকে একটি ছোট ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে এই এ্যাকসিডেন্ট। ছেলেটি বেঁচেছে। কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি সেই লোকটি যে বাঁচাতে গিয়েছিল। পা দুটি ভেঙে গেছে। এক্ষুনি হাসপাতালে পৌঁছাতে হবে লোকটিকে। গাড়ী থামিয়েছে সেজন্যে।

হাসিনার কানে আসে কে যেন বলছে—'ছাত্র। হলে থাকে।'

তাই তো। কখন তারা মতিহারে এসে গেছে জানতেই পারেনি হাসিনা। ঐ তো ছাত্রাবাস।

শাফিক দীন আপত্তি করেন না। কয়েকজন ধরাধরি করে গাড়ীতে তোলে তাকে। রক্তময় অচৈতন্য পরোপকারী।

মুখ দেখে চমকে ওঠে হাসিনা। একি দেখছে সে। কামাল! (কামাল শেষ পর্যন্ত তুমি এই করলে। এ কেমন তোমার প্রতিশোধ? ষড়যন্ত্র করে এভাবে আমার সামনে পড়লে। তোমাকে তো মহৎ বলেই জানতাম। কিন্তু এই কি মহত্ত্ব। আমার স্বপ্নের প্রাসাদ গুঁড়িয়ে দিতে চাও এভাবে। না, না, না পারবে না। অত নরোম পাওনি আমাকে)

'কি ভাবছো হাসু?' শাফিক দীন ঘটনাকে হাল্কা করতে চান।

'ভাবছি—(কামাল তুমি কি কখনো শুনেছো আমার কথা। বারবার একই জবাব দিতে, শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তা করতে পারবো না হাসু। অতটা স্বার্থপর হতে বলো না।) কি মর্মান্তিক। নিজের জীবন বিপন্ন করে অন্যকে রক্ষা করায় কত সাহস দরকার হয়। (অথচ কামাল তুমি আমার ব্যাপারে কোনো সাহস দেখাওনি। তোমার সাহসের অভাবে

আমার বুক শুকিয়ে উঠেছে। তুমি সেই শুকনো বুকের দিকে তাকিয়ে বলেছো—তোমার ওষুধ খাওয়া দরকার হাস্নু। খুব শুকিয়ে যাচ্ছ।

বলেছিলাম,—তুমিই তার কারণ। কেন আমাকে গ্রহণ করছো না!

কামাল তুমি বলেছিলে, যেভাবে আমি চাই, তুমি সেভাবে আসতে চাওনা যে।

তা কি করে পারি কামাল। বাবা-মাকে অস্বীকার করবো কি করে। তাঁরা রাজি হতেন না। তুমি তো ক্যারিয়ার তৈরী করতে চাওনি।

বলেছিলে, দেশের কাজ কি ক্যারিয়ারের চেয়ে ছোট? জানতাম ছোট নয়। কিন্তু বাবা-মা তো বুঝবেন না। মেয়ের কষ্টের ভবিষ্যৎ কেই বা দেখতে চান। তুমি রাগ করে বলেছিলে, তুমি নিজেও মনস্থির করতে পারোনি হাস্নু। তুমি সুখী নিরাপত্তা চাও। আমাকে নয়। তুমি রুগ্ন হাস্নু। ভালমত ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাও।

দুঃখ হলেও হেসেছিলাম। আমার বুক দেখে তুমি ওষুধ খেতে বলো। অথচ কখনো হাত স্পর্শ করেও অনুভব করোনি কোথায় আমার অসুখ। তোমার ব্যাখ্যায় আমার মুখ দিয়ে থুথু উঠেছিল। শরীর খারাপ হতে শুরু করে তখুনি। নারীত্বের চিহ্নগুলি ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলেছিলাম।

কামাল তুমি প্রায় বলতে, হাস্নু ওষুধ খাও। তুমি যে হারিয়ে যাচ্ছ।

তোমার সামনেই থুথু ফেলেছিলাম। কামাল—শুধু ওষুধ কি সব দিতে পারে? তুমি কত জানতে। কেবল জানতে না নিরাপত্তাই নারীর একমাত্র কাম্য। তুমি কি পারতে নিরাপত্তা দিয়ে আমাকে ঘিরে রাখতে। পারতে না। সারা জীবন তোমার পাশে থেকে সংগ্রামী বিধ্বস্ততা দেখতে হতো। দেখতে দেখতে মুখ দিয়ে থুথুর পরিবর্তে রক্ত উঠতো। না, না, কামাল তোমাকে তাই শেষ পর্যন্ত মনে অটুট রাখতে পারিনি। অনেক বোঝাপড়া করেও পারিনি।

'হাস্নু তোমার খুব খারাপ লাগছে, না?'

'খারাপ। না তো।' (শুনছো কি কামাল শাফিক দীন কতো ভাবেন আমার জন্যে। তোমার জন্য আমি যখন ভাবতে ভাবতে দিশেহারা তখন এলেন শাফিক দীন। তুমি জান না কত বড় অফিসার। কামাল

তুমি কি শুনতে পাচ্ছো? অনেক বেতন পান। আর তুমি তাঁর গাড়ীতেই হাসপাতালে যাচ্ছো। তুমি চোখ বন্ধ করে আছো কেন? দেখতে চাও না। বয়স কি তাঁর খুব বেশী? পয়তাল্লিশ অতিক্রম করেছে মাত্র। আর জানোই তো আমার বাইশ। বয়সে কি এসে যায়।

আমার বাবা-মা? এ নীরব প্রশ্ন তোমার কেন কামাল? তুমি তো জানতে তাঁরা কত উদার। তোমার সংগে মেলা-মেশাতে তাঁরা কোনদিন বাধা দেননি। এ বিয়েতেও তাঁরা বাধা দেবেন না।

তবে কি শাফিক দীনের অতীতের কথা তুমি শুনেছো? আমিও শুনেছি। বন্ধুর সংগে তাঁর স্ত্রী চলে গেছেন দু'টি সন্তান ফেলে।

তাঁর না পোষালে তিনি থাকবেন কেন? তাঁর সেই পরিত্যক্ত পুরুষকে আমি গ্রহণ করছি কেমন করে এটা জানতে চাও?

তুমি তো অনেক পড়েছো কামাল। মনমতো, একটা ব্যাখ্যা করে নিও। তবু শুনতে চাও। তাহলে বলি শোন—শাফিক দীন কাপুরুষ নন। এবং তিনি তাঁর মনোনীতাকে ওষুধ খেতে বলেন না।)

হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে এসে গাড়ী দাঁড়ায়। ওরা নিয়ে যায় লোকটিকে।

শাফিক দীন বলেন, 'ছেলেটি মহৎ। অদ্ভুত প্রাণের অধিকারী। তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। চেন নাকি!'

'কত ছাত্রই তো আছে। সবাইকে কি চিনি' (কামাল তুমি ক্ষমা করো আমাকে এ ছাড়া আর কি-ই বা বলতে পারি।)

'শেষ সময়ে এসে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কী এক দুর্ঘটনায় যে পড়লাম।'

'তাতে আর কি হয়েছে। পথে তো কত দুর্ঘটনা হচ্ছে হরহামেশা। মন খারাপ করো না।'

'আমার জন্য নয়। তোমার কথা ভাবছি। রক্তাক্ত ছেলেটির কথা ভেবে হয়তো ঘুমুতেই পারবে না।' শাফিক দীন চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়েন।

'তুমি কিচ্ছু ভেবো না। ঠিক ঘুমুতে পারবো। পথে কত কি যে দেখতে হয়, অত বিচলিত হলে কি চলে?' হাসিনা সহজ হয়ে কথা বলে।

'নিশ্চিন্ত হলাম।'

গাড়ী এসে দাঁড়ায় তাদের বাড়ীর সামনে। হাসিনা বলে, 'তুমি নামবে না? আব্বুকে কি যে বলতে চেয়েছিলে।'

'আজ নয় হাসু। কাল বলবো। অত রক্ত দেখে কিছু ভাল লাগছে না।'

'বেশ তাই বলো।'

এতক্ষণের সহজ ভাবটা ঝেড়ে ফেলে অশেষ ক্লান্তি নিয়ে বাড়িতে ঢোকে হাসিনা। সামনে পড়ে রান্নু—'কামাল ভাই বিকেলে এসেছিলেন। অনেকক্ষণ বসে থেকে তোমার জন্য চিঠি রেখে গেছে আপা।'

হাসিনা নিরুত্তর। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। রান্নু চিঠি এনে তার হাতে দেয়।

হাসিনা চিঠিটা হাতে করে নিজের ঘরে ঢোকে। ছুটে গিয়ে বিছানায় আছড়ে পড়ে। হাত থেকে ছিটকে দূরে পড়ে যায় চিঠিটা।

'কামাল! কামাল তুমি কেন এসেছিলে? কেন? কেন? কেন?'

উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে হাসিনা। তার ঝাপ্‌সা চোখের আকাশে ভাসে অচেতন রক্তাক্ত একটি মহৎ হৃদয়।

কামাল, না তার অনাঘ্রাত প্রথম সত্তার রক্তাক্ত চেহারা।

# অনুক্ষণ অনুভবে

**শামসুল আলম**

"হে ঈশ্বর, আমাকে দৃষ্টি দাও। এমন দৃষ্টি, যাতে আমি প্রাণ ভরে পৃথিবীকে দেখতে পাই। বুঝতে পারি মানুষের মুখ। সহজেই চিনতে পারি এক একটি ভিন্ন জগৎ। আমাকে এমন দৃষ্টি দাও, এমন চোখ, যে চোখ দিয়ে আমি অন্যের চোখের নির্মল আনন্দ খুঁজে পাই। তাই বলে ছদ্মবেশীর মুখোশ নয়। লোভীর ছায়া নয়। হিংসার বীভৎসতা নয়। অথবা প্রত্যুৎপন্নমতিতার বিদ্যুচ্ছটাও নয়। আমাকে সেই সহজ দৃষ্টি দাও, সেই আলো, যাতে আমি, সহজে নিজেকে চিহ্নিত করতে পারি। সেই সঙ্গে অন্যকেও। আমার আত্মা বন্দী হয়ে আছে। আমার দৃষ্টি অন্ধ। আমি অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখি না। আর কিছু জানি না। হে সুন্দর, আমাকে করুণা কর। আমাকে করুণা কর···"

কবে কোন্ দুর্বল মুহূর্তে ডায়রীর প্রথম পাতায় এ কথাগুলো পরম যত্নে সাজিয়েছিল রাশেদ। যার সঙ্গে আজ আর কোন যোগসূত্র নেই। অথচ সেই কথাগুলোই আজ আশ্চর্য ভাবে মনে পড়ল রাশেদের।

ট্রেনের মৃদু ঝাঁকুনির অবসাদে চোখ দুটো বুঝি এক সময় এঁটে এসেছিল। তাই আচমকা ট্রেনের গতি রুদ্ধ হওয়ায় ভীষণ ধাক্কা খেল। এবং এরপর চোখ মেলে চাইতেই হঠাৎ মনে পড়ল তার ওই আশ্চর্য উজ্জ্বল কথাগুলো।

এদিকে ভোর হয়ে এসেছে। অন্ধকার ফিকে হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বাংকের ওপর থেকে গলা বাড়িয়ে সামনের জানালা দিয়ে দেখল রাশেদ, শীত-সকালের কুয়াশা এখন অনেকটা পাতলা। ঠিক মাকড়সার জালের মত। যার ভেতর দিয়ে সহজেই দৃষ্টি চলে। প্ল্যাটফরমের ওপর এখন চলমান মাথার কাফেলা। আর ফেরি-অলা হকারের চীৎকার···এবং মাঝেমধ্যে চা-অলার মিষ্টি আহ্বান: চা চাই, চা, গরম চা-আ-আ। একটা সুদীর্ঘ সুরেলা টান। কেমন যেন নেশা লাগে।

কিন্তু সারা রাত একদম ঘুম হয়নি রাশেদের। এই ট্রেনজার্নিটা ভারি বিচ্ছিরি। বিশেষ এই রাতের জার্নি। এ সময় না যায় চোখ বোজা, না যায় ঘুমোনো। সব সময় একটা উদ্বেগাকুল প্রতীক্ষাঃ এই বুঝি কেউ এসে উঠল কম্পার্টমেণ্টে। একজন, ত্ব'জন অথবা তারো বেশী। আর এই সব অচেনা যাত্রীদের মধ্যে থেকে চেনা মুখকে খুঁজে নেয়ার ব্যাকুলতা, অথবা···আকাঙ্ক্ষিত ষ্টেশনটিই এসে গেল বুঝি অলক্ষ্যে। এ রকম নানাবিধ অনুভূতিতে সব সময় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকলে কি আর মানুষের ঘুম আসে। তত্নপরি ট্রেনের উৎকট ঝাকুনি। অবশ্যি অনেকের মতে ট্রেনের ত্বলুনিতে নাকি ঘুমের আমেজ আসে। ভাঙ্ অথবা চণ্ডুখোরের মউতাতের পর যে দশা হয়, অনেকটা সে রকম। আমি বলি, এ একদম বাজে কথা। ঘুম তো দূরের কথা, এই রক্ত-মাংসের দেহটাকে নিয়েই তখন ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। দেহ তখন আর দেহ থাকে না। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে হাড় থেকে মাংস যেন আলাদা হয়ে পড়তে চায়। সারা শরীরে অমানুষিক যন্ত্রণা, পেটের ভেতরটা যেন পাক দিয়ে ওঠে, বমি বমি লাগে। সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। সত্যি, এর চেয়ে নরক যন্ত্রণাও বুঝি ঢের ভাল। রাশেদ মনে মনে বলল।

কিন্তু রাশেদের এখন নিজেকে কেমন যেন অচ্ছ্যুত বলে মনে হচ্ছে। যেন কল্পনায় নিজের বর্তমান চেহারাকে স্পষ্ট অবলোকন করতে পারছে। কি বিচ্ছিরিই না লাগছে তাকে এখন দেখতে। উষ্ক-খুষ্ক চুল, উদ্‌ভ্রান্তের মত দৃষ্টি, চোখ মুখ ফোলা ফোলা। যেন সাক্ষাৎ একটি বদমাশের প্রতিমূর্তি।

রাশেদের অতঃপর নিজের ওপর নিজেরই ঘৃণা হল। গা-টা কেমন গুলিয়ে গুলিয়ে উঠল। মুখে নিম-বিস্বাদ। সব মিলে একটি নতুন দিনের সূচনাতেই নিজেকে কেমন বাসি বাসি আর পরিত্যক্ত বলে মনে হচ্ছে। এ সব রাত্রি জাগরণের ফল। নিদ্রাহীন মস্তিষ্কের উদ্ভট চিন্তা। রাশেদ অস্বস্তিতে মাথা ঝাঁকাল এবং প্রায় বিড় বিড় করে বলল, প্রথমেই উচিত আমার চোখমুখ ধুয়ে ফেলা, তারপর মুখে কিছু দেয়া। পেটে কিছু না পড়লে আর স্বাভাবিক হতে পারছি না। বিরক্তিতে ও বাংক্ থেকে নেমে পড়ল। জানালার মধ্যে দিয়ে গলা বাড়িয়ে ষ্টেশানের নামটা দেখল—তারপর ট্রেনের দরজা খুলে প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়াল।

ঈশ্বরদি জংশন। ট্রেন এখানে অনেকক্ষণ ডিটেইন হবে। পুনরায় যাত্রা শুরু হতে সেই বেলা ন'টা। সুতরাং তাড়াহুড়োর এখন কোন প্রয়োজন নেই। রাশেদ ভাবল এবং নিঃশঙ্কচিত্তে কলতলায় মুখহাত ধুয়ে টি-ষ্টলে এসে বসল। সে দেখল দু' চারজন লোক আগে থেকেই বেঞ্চির ওপর ছিটিয়ে ছড়িয়ে বসে রয়েছে। তাদের মুখের দিকে এক পলক চেয়েই আবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল।

চারপাশে এখনো পাতলা অন্ধকার। কুয়াশা পড়ছে খুব। এটা মাঘের শেষ। তাই শীত তার শেষ জানান দিয়ে যাচ্ছে। ভোরের ভারি বাতাসে হিমের চাবুক, মাংস পেরিয়ে শরীরের গিটে গিটে পর্যন্ত গিয়ে বিঁধছে। গায়ে গরম শাল জড়ান থাকা সত্ত্বেও ভীষণ কম্পন অনুভব করছে রাশেদ। এখন এক কাপ চা। এখনই এক কাপ চায়ের দরকার। রাশেদ প্রায় স্পষ্ট করে উচ্চারণ করল। আর অমনি ষ্টলের মালিক কথাটা লুফে নিল।

কী বললেন, স্যার?

না, বলছি, এককাপ চা দিন।

শুধু চা স্যার?

আর কি আছে আপনার কাছে?

ব্রেড, বিস্কিট, ডিম সেদ্ধ···।

সলটেড্ বিস্কিট আছে?

তাও আছে স্যার।

বেশ। তাই দিন না হয় গোটা কয়েক। আর একটি ডিম সেদ্ধ।

লোকটি বিনয়ে হেসে প্লেটে করে খান কয়েক বিস্কিট আর ডিম সেদ্ধ নিয়ে রাশেদের সামনে মেলে ধরল। তারপর চায়ের পানির দিকে মনোনিবেশ করল। আর এদিকে রাশেদ ডিমের নরম শরীরে কামড় বসাতে বসাতে এতক্ষণ পর লোকটির দিকে পূর্ণদৃষ্টি মেলে চাইল।

আশ্চর্য, রাশেদের মনে হল, একে যেন এর আগে কোথায় সে দেখেছে। একেবারে কাছে থেকে। এ মুখ যেন তার কত দিনের চেনা। সে বারবার মনে করার চেষ্টা করল, কোথায় দেখেছে ওকে। কোথায়? অবশেষে মনে পড়ল। রহিম চাচা। তাদের গ্রামের রহিম মুদী। ঠিক সেই

চোখ, সেই মুখ। সেই একই অভিব্যক্তি। যেন পরার্থে সব সময় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে। শুধু ত্যাগ, শুধু কৃচ্ছ্র সাধন। অথচ যেটুকু প্রাপ্য মূল্য, সেটুকুর জন্যেও ব্যস্ততা নেই। ভাবখানা এ রকম, পারলে দাও, না পারলে দিও না। পণ্য দ্রব্যের জন্যে দামাদামি নেই, পীড়াপীড়ি নেই। কিন্তু ব্যবসা করতে নেমে এমন দাতাকর্ণ হলে কি চলে? রহিম মুদী দাতাকর্ণই ছিল বটে। কত লোকে যে তার দোকান থেকে ধারে জিনিস নিয়ে গিয়ে শেষে কলা দেখিয়েছে তার হিসেব-নিকেশ নেই। রহিম কিন্তু এ জন্যে কোনদিন কোন অভিযোগই করত না। এমন কি যে লোক তাকে সব চে' বেশী ঠকিয়েছে, সেও যদি পুনরায় তার কাছে গিয়ে কোন কিছু যাচ্ঞা করত, সে ক্ষেত্রেও রহিম তাকে বিমুখ করত না। যেমন রাশেদের কথাই ধরা যাক না কেন। রাশেদ দুঃসাহসীর মত নিজের গোপন অপরাধটাকে এই মুহূর্তে মেলে ধরতে চাইল। তার বুকের সেই শাশ্বত সত্যকে লক্ষ্য করে নীরবে বলতে লাগল: আমি ভুলব কি করে রহিম চাচার সেই নিঃস্বার্থ উপকারের কথা। যে মা-বাবার অজ্ঞাতে আমার হাত-খরচের পয়সা জুগিয়েছে, এমনকি আমার নেশার রসদ জুগিয়েছে, তার হৃদয়ের ঐশ্বর্যকে কি করে অস্বীকার করব আমি। রাশেদের ভেতরটা সেই পরিচিত হাসি-কান্নায় ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল—আর সেই আলোকে একটা দৃশ্য ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

লেখাপড়ার পাট চুকিয়েও প্রায় বছর খানেক বেকার অবস্থায় ঘরে বসে থাকতে হয়েছিল রাশেদকে। তারপর কপালগুণে এখনকার এই চাকরিটা হঠাৎ একদিন পেয়ে গেল রাশেদ। এই হঠাৎ পাওয়া সৌভাগ্যের কথা জেনে সেদিন রহিম চাচার আনন্দ আর যেন আর সকলের আনন্দকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মনে আছে, সেই দিনটির কথাও। রাশেদ শহরে চাকরিতে যোগদান করতে যাচ্ছে। ষ্টেশনে তাকে এগিয়ে দিতে এসেছে বাবা, ছোট ভাই সিপার, সেই সঙ্গে রহিম চাচাও। এক সময় নিরিবিলিতে তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে রাশেদ বলল, রহিম চাচা, আমার কাছে তোমার কত পাওনা বল দিকি?

কেন বল তো? রহিম যেন আকাশ থেকে পড়ল।

রাশেদ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, না মানে-বলছিলাম কি, আমার তো চাকরি হয়েছে, তোমার ঋণটা শোধ করার এবার সময় এসেছে চাচা।

রহিম ব্যথিত হল। অন্ততঃ তার দৃষ্টিতে সেই ভাব ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ মৌন থেকে সে বলল, ও নিয়ে অত ভাবছ কেন। আগে চাকরিতে যোগ দাও, দু'পয়সা হাতে আসুক, তারপর ঋণের কথা ভাববে।

রাশেদ তবু জোর দিয়ে বলল, আহা বুঝছ না কেন রহিম চাচা, হাজার হলেও আমি তোমার কাছে ঋণী। অপরাধ বোধে স্তিমিত হয়ে কতকটা বিজ্ঞের মত হাসল রাশেদ। তারপর ফের বলল, নগদ কত টাকা তোমার কাছ থেকে এ পর্যন্ত নিয়েছি, জানতে পারলে সত্যিই ভারি খুশী হব চাচা।

রহিম তখন একান্ত অসহায়ের মত জানাল, সে আর এমন কি। শতখানেক হবে হয়ত।

আর আমার সিগ্রেট বাবদ?

সে আর কত। ধর, চল্লিশ, পঞ্চাশ মতন হবে।

বেতন পেয়েই তোমার সব টাকা পাঠিয়ে দেব। রাশেদ বলল। রহিম অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ট্রেনে ওঠার সময়ও রহিম একটা কাণ্ড করে বসল। রাশেদের হাত দুটো চেপে ধরে একান্ত আপনজনের মত বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে বলল, তুমি গাঁয়ের ছেলে। আমাদের ছেড়ে দূর দেশে যাচ্ছ জীবিকার ধান্দায়। তোমার অভাবটাই আজ বড় হয়ে বাজছে।

রাশেদ করুণ হয়ে বলল, আমি তা জানি চাচা।

তাহলে আজকের দিনে তুচ্ছ দেনা-পাওনার কথা বলছ কেন?

বেশ, আর বলব না।

হ্যাঁ, এখন এ নিয়ে ভেব না। আগে কাজে যোগ দাও, একটু সামলে ওঠ, তারপর যা ভাবার ভাববে।

তাই হবে চাচা। রাশেদ রহিমের কথায় সায় দিল। আর রহিম তার গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলল, আল্লাহ তোমার ভাল করুন বাবা। তুমি নিরাপদে থাক।

রাশেদ অতঃপর ট্রেনে চেপে বসল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনটা

ছেড়ে দিল। রাশেদ শেষ বারের মত জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে বাবা, ছোট ভাই এবং রহিম চাচার দিকে ফিরে চাইল। কিন্তু সে তখন আর আপনজন কারুর মুখ দেখতে পেল না। চোখ দুটো তার হঠাৎ কেমন জ্বালা করে উঠল। সামনের সব কিছু তখন ভীষণ ঝাপসা লাগছিল রাশেদের।

প্রায় বছর তিনেক আগে হলেও সেই দৃশ্যটা যেন খুব জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠল। আর আশ্চর্য, রাশেদের হঠাৎ মনে হল, কোন পার্থক্য নেই। সামনের ওই আত্মমগ্ন মানুষটি, মানে ওই টি-ষ্টলের মালিকের মুখের আদল যেন রহিমেরই অনুরূপ। সেই একই আলো, একই অভিব্যক্তি।

এবং এজন্যেই রাশেদ প্রায় নিশ্চিত। তার মন বলছে, সমস্ত অনুভূতি তাকে জানিয়ে দিচ্ছে, সে যদি ওই মানুষটিকে চা বিস্কুটের পয়সা না দিয়ে, মানে তাকে বেমালুম ফাঁকি দিয়ে এই মুহূর্তে চলে যায়, তাহলেও বোধহয় সে কোন কথা বলবে না। মানুষটির ওপর এরকমই একটা ধারণা জন্মাল রাশেদের। এবং এই ধারণার সত্যতা বিচার করার জন্যেই সে ষ্টল থেকে নিঃশব্দে উঠে এল। তারপর সামনে একটু এগিয়ে গিয়ে থামল। ভাবল, কই ও তো কিছুই লক্ষ্য করল না। মনে মনে তখন হিসেব মেলাতে লাগল রাশেদ ; ঠিক যেন অবিকল রহিম চাচাই। তেমনিই উদার, মহৎ, নির্লোভ। যেন পরার্থে সব সময় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছে। সংসারে এরকম ক'টা মানুষের সাক্ষাৎ মেলে! রাশেদের বড় সৌভাগ্য, সে এমন নিরহঙ্কার, নির্লোভ মুখের সন্ধান মাঝেমধ্যে পেয়ে যায়। এই ভেবে সে আবার ষ্টলে ফিরে এল। মানুষটিকে বলল, ভুল করে আপনার পয়সা না দিয়েই চলে গিয়েছিলাম। কিছু মনে করবেন না যেন।

না না, কি যে বলেন। মানুষটি অপ্রস্তুত হল।

দুর্জনের তো অভাব নেই। রাশেদ ফের যোগ করল, অনেকে কিন্তু ইচ্ছে করেই এমনি ঠকিয়ে যায়।

আমার কখনো তা মনে হয় না। ওর কণ্ঠে অদ্ভুত প্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হল। সেই বিশ্বাসের আলোয় জ্বলতে জ্বলতে সে আবার বলল, আসলে কী জানেন, মানুষ কখনো ইচ্ছে করে কাউকে ঠকায় না। আপাতঃদৃষ্টিতে সে রকম মনে হলেও, আমরা যদি একটু তলিয়ে দেখি

তাহলে দেখব, তার পেছনে কোন এক অদৃশ্য তাড়না কাজ করছে। কাজেই ভেবে দেখুন, আমরা কি মানুষকে এজন্যে দোষ দিতে পারি? এক্ষেত্রে যে সে নিরুপায়, অবোধ, অবুঝ শিশুর মত অজ্ঞান।—বলে মানুষটি স্মিত মুখে চেয়ে রইল। আর রাশেদ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। রাশেদ সত্যিই ভাগ্যবান। ভাবতে ভাল লাগছে, তার আকাঙ্ক্ষার মানুষগুলো তারই চারপাশে ভীড় করে রয়েছে। সে যে-সুখ, আনন্দের আজীবন স্বপ্ন দেখে এসেছে, তা যেন চলার পথেই ছড়িয়ে রয়েছে। রাশেদ সেই অনুভূতি, সেই আনন্দকে পথ চলতে চলতে কুড়িয়ে নিচ্ছে। সুতরাং এ সংসারে তার মত সুখী কে আর আছে! রাশেদ এ কথা বারবার ভাবল এবং সেই অভূতপূর্ব আনন্দের দোলায় আলোড়িত হতে হতে আবার নিজের কম্‌পার্টমেণ্টে ফিরে এল।

এখন সোনালী সকাল। রোদ বাড়ছে ক্রমশঃ। শীতের সকালটা এমনিই দ্রুত লয়ে পার হয়ে যায়। তারপর দুপুর গড়িয়ে বিকেল এবং তার একটুক্ষণ পরই হুট করে সন্ধ্যা নেমে আসে। কিন্তু রাশেদ এখন অন্ধকারের কথা ভাববেনা। এখন চারপাশে ঝলমলে রোদ্দুর। ষ্টেশানের কলতলায় যে ঝাঁকড়া গাব গাছটা রয়েছে, তার মাথায় একটু আগে কুয়াশার অন্ধকার থমকে ছিল। সেই গাছটাকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার কচি কচি গাঢ় সবুজ পাতায় আলো নাচ্‌ছে। চারপাশে শুধু আলো, আলোর বন্যা। আর আকাশটা কটকটে নীল, বাতাসে কেমন যেন এক মিষ্টি গন্ধ। সব মিলে আজকের সকালটা ভারি ভাল লাগছে। রাশেদ উৎফুল্ল চিত্তে আয়েশ করে সিগারেট জ্বালাল। কিন্তু সিগারেটটা জ্বালাতেই হঠাৎ তার উপস্থিত পরিবেশের দিকে খেয়াল হল। সে দেখল, কামরা ভর্তি লোক। অথচ যখন নিচে চা খেতে নেমে গিয়েছিল, তখন এই কম্পার্টমেণ্টে মাত্র দু' একটি মানুষ ছিল বলেই মনে পড়ে তার। এইটুক্‌ু সময়ের অনুপস্থিতির মধ্যেই হয়ত ওরা এসে উঠেছে। এ রকম একটা সম্ভাবনার কথা মনে হল রাশেদের। কিন্তু কি আশ্চর্য, সব ক'টি মানুষের কৌতূহলাক্রান্ত দৃষ্টি যে তার মুখের ওপরই ন্যস্ত হয়ে রয়েছে। রাশেদ বড় বিব্রত বোধ করল। তাই সে

মুখ ঘুরিয়ে জানালার বাইরে চেয়ে রইল। এমনি সময় সামনের বেঞ্চ থেকে কে যেন বলে উঠল : আপনার ঘড়িতে ক'টা বাজে? রাশেদ চমকে উঠে কামরার মধ্যে দৃষ্টি ফেলল।

হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি। সামনেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখতে পেল। তিনি তখন তারই দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। ঘড়ি দেখে সময় জানাল রাশেদ।

ট্রেন ক'টায় ছাড়বে বলতে পারেন? উনি আবার প্রশ্ন করলেন।

খুব সম্ভব ন'টায়।

তার মানে এখনো চল্লিশ মিনিট বাকি। বৃদ্ধ এরপর হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। রাশেদ এতক্ষণে ওদের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল। ঠিক ওর সামনা সামনি বসেছে ওরা চারজন। পূর্বোক্ত বৃদ্ধ তার মধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয় জন বয়স্কা মহিলা, তৃতীয়জন তরুণী—আর সর্বশেষ ব্যক্তি রাশেদেরই স্বজাতি, কিন্তু সে বয়সে কিশোর। ওরা কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। বয়স্কা মহিলাই আলোচনায় একটু বেশী আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে। আর সবাই সায় দিচ্ছে—ক্রমশঃ সোচ্চার হয়ে উঠছে। সর্বত্রই সেই এক মুখ, এক আলো, একই অভিব্যক্তি। রাশেদের ভেতরটায় সেই আনন্দের নিঃশব্দ স্রোত বইতে লাগল।—আমি আনন্দের জন্যেই গৃহছাড়া হয়েছি। সুতরাং গোটা পৃথিবীটাকে নিজের ভেবে আনন্দ খুঁজতে দোষ কি। একদিন সেই আনন্দের আশ্চর্য সোনার কৌটোটা পেয়ে যাব। আমি জানি। আমি জানি। এমনি এক আবেগের চাপে রাশেদ মথিত হল। উদ্বেলিত হল। কিন্তু সেই সঙ্গে ওদের সকলের কথার দিকেও উৎকর্ণ হয়ে রইল। অতঃপর রাশেদ এক সময় ভীষণ চমকে উঠল। সে শুনতে পেল বয়স্কা বল্‌ছেন : শওকাতকে এত করে চিঠি দিয়ে বল্‌লাম, একটিবার দেখা করে যা বাবা, তা সে এল না। দেখতে দেখতে ক'টা বছর পার হয়ে গেল। আর বোধহয় ওর সঙ্গে কপালে দেখা নেই। উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লেন। রাশেদের মনে হল, মা-ই যেন সামনে বসে রয়েছেন। অথবা দূর থেকে তিনি এমনি করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছেন।—মাগো, তুমিও আমাকে অনেকগুলো চিঠি দিয়েছ। বাড়ি ফেরার জন্যে বারবার আকুতি

জানিয়েছ। তুমি যে আমাকে অনেকদিন দেখনি মা। কতকাল বল দিকি। কত কাল? কিন্তু এরি মধ্যে কি করে বাড়ি ফিরি তুমিই বল মা? তোমার যে অনেক সাধ। তুমি আজীবন কষ্ট পেয়েছ, দুঃখ পেয়েছ। শেষ বয়সে তোমাকে যদি একটু সুখ, একটু স্বাচ্ছন্দ্যের মুখই দেখাতে না পারি, তবে যে ছেলে হয়ে জন্মানই আমার বৃথা হবে মাগো। জান মা, চাকরিটি আমার বেশ। শুধু দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ান। যত ঘুরব, তত পয়সা কুড়োব,—আনন্দ কুড়োব। আমার জন্যে, তোমার জন্যে, সবার জন্যে। তোমার যে বড় সাধ মা, সিপার বড় হয়ে ডাক্তার হবে। আমার যা হবার হয়েছে। তাই বলে ছোটটাও আমার মত আকাট মূর্খ হয়ে থাকবে। আমার যে অনেক দায় মা। এখন কি বাড়ি ফিরলে আমার চলে। রাশেদ যেন সামনের ওই বয়স্কা মহিলাটির সঙ্গে নিঃশব্দে কথা বলতে লাগল। এবং এই নিঃশব্দ কথোপকথনের মধ্যেই সে হঠাৎ শুনতে পেল, বৃদ্ধ মহিলাকে বলছেন: তুমি অত উতলা হচ্ছ কেন? শওকাত ফিরে আসবে। সময় হলে নিশ্চয়ই সে ফিরে আসবে।—হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ বাবা। আমি নিশ্চয়ই একদিন ফিরে যাব। তোমার ভার আমাকে লাঘব করতে হবে। আমার জন্যে তুমি যা করেছ তাই অনেক। যেহেতু তুমি তোমার কর্তব্যের কোনদিন অবহেলা করনি, সেই হেতু আমার ওপর তোমার অগাধ বিশ্বাস। তোমার সে বিশ্বাসে আমি ফাটল ধরাব না। ফিরে গিয়ে তোমাকে অবশ্যই ঋণমুক্ত করব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। রাশেদের মনে হল সে যেন সত্যি সত্যিই বাবার সামনে বসে কথা বলছে। তাকে আশ্বাস দিচ্ছে। কিন্তু ওদের কথার মধ্যে তরুণীটি হঠাৎ আবার মুখরা হয়ে উঠল। সে তখন মুখ নেড়ে নেড়ে মহিলাটিকে বলছে: সত্যি খালা আম্মা, শওকাত ভাই যেন কী! মানুষের দুঃখ বোঝে না। রাশেদ তার কথা শুনে অস্ফুটে বল্ল: তোমার দুঃখ আমি বুঝি মিতা। কিন্তু তোমার সাধের ছোট্ট সংসার গড়তে যে আনন্দ, যে শক্তির প্রয়োজন, তার সন্ধানেই আপাততঃ আমি ব্যস্ত আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক মিতা। তোমাকে আমি ঠকাব না। কথা যখন একবার দিয়েছি, তখন তা রাখবই। আমাকে বিশ্বাস করতে পার। আর যা-ই হোক, আমি

চরিত্রহীন নই মিতা। রাশেদের হঠাৎ মনে হল, ওদের দু'জনের মাঝখানে কিশোরটি নাক গলিয়েছে। সে তখন মহিলাকে লক্ষ্য করে বলছিল : মা, —মাগো, ভাইয়া আর ফিরে আসবে না ?

আসবে বই কি !

কবে আসবে ? ভাইয়া বলেছিল, আমার জন্যে সাইকেল আনবে, ঘড়ি আনবে। সে সব নিয়ে আসবে না ?···আসবরে; আসব। তোর জন্যেই তো আমার সবচে' বেশী ভাবনা সিপার। শুধু এই তুচ্ছ জিনিস কেন, আমার কাছে তোর যে আরো অনেক কিছুই পাওনা। সবুর কর আর ক'টা দিন ভাই। আমি আসছি। আসছি। রাশেদ ভাবল, দোষ কি, যদি সামনের ওই চারটে মানুষকে আমার একান্ত আপনজন বলে ভুল করি। আর ভুলই বা কেন, আমি তো জানি। আমার বিশ্বাস, যে বিশ্বাসের জন্যে প্রবাসের দুঃসহ নিঃসঙ্গতাকে সহজে মেনে নিতে পেরেছি, তারই জোরে বলছি, সামনের উপবিষ্ট ওই বৃদ্ধই আমার পিতা। ওই মহিলা আমার মা, আর ওই কুমারী মেয়েটি, ওই বালকটি, ওরা আমার প্রিয়। পরম প্রিয়। আমি বলছি। চীৎকার করে ঘোষণা করছি। রাশেদ কি-এক দুর্মর আবেগের উচ্ছ্বাসে হঠাৎ চীৎকার করে উঠতে চাইল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ট্রেনের হুইসিল তীব্র শব্দে বেজে উঠল। খেয়াল হলে দেখল রাশেদ, ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে। সামনের মাঠ-ঘাট আকাশ সব তখন দ্রুত পেছনের দিকে সরে সরে যাচ্ছে। আর সেই গতি সেই ঘূর্ণায়মান আবর্তের মধ্যে পাশাপাশি ক'টি মুখ বারবার ভাসছে, ডুবছে। সে মুখ, মায়ের মুখ, বাবার মুখ, সিপারের মুখ, রহিম চাচার মুখ।

জানালার বাইরে দৃষ্টি রেখে, ট্রেনের চাকার ধাতব শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মিলিয়ে রাশেদ তখন প্রাণপণ চীৎকার করে বলছিল : মা বাবা, মিতা, সিপার, তোমরা কেউ আক্ষেপ করো না। আমরা তো সবাই অনুভবে অনুক্ষণ সকলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছি। সুতরাং দুঃখ কিসের। আমার মত তোমরাও চারপাশে দৃষ্টি মেলে চাও। দেখবে তোমাদের সকলের মাঝেই আমি রয়েছি।

# চন্দনে মৃগপদচিহ্ন

**মাযহার কাদির**

কবিরের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিলো। তার নাকি বিশেষ প্রয়োজন। বারবার বলছিলো যেন সময়মতো তাদের লারমিনি স্ট্রীটের বাসাতে যেতে ভুল না হয়। অথচ কবিরকে তখন পাওয়া গ্যালো না, তার আপা জানালেন সকালে বেরিয়ে সে আর ফেরেনি। বাসায় কিছু বলেও যায়নি। সুতরাং ক্ষুন্ন ফিরতে হলো আবুবকরকে। সাথে কেউ ছিলো না, থাকলে এ-দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়ে এক চোট হয়ে যেতে পারতো।

বিকেল এরপর উদ্দেশ্যহীন কাটলো। ষ্টেডিয়ামের বইয়ের দোকানগুলি বৃথাই তছনছ করলো কাঙ্খিত পেপারব্যাক খুঁজে। পুরনো বইয়ের ব্যবসায়ীদেরও রত্নাকর মনে হলো না, বসে থাকতে হয় বলে বসে আছে— এ-কথা যেন ওরাও জানে। রেক্সে পাওয়া যাবে বন্ধুদের? ঠিক নেই। উজিয়ে সোজা চলে গ্যালো টনি কারটিসদের কাছে। নাহ্।

সন্ধ্যা নামলো যখন ঘন হয়ে তখন নূ্যমারকেটের এক চায়ের দোকানে সে একা। চায়ের কাপ, সিগরেট ও কবিতার কাটাকুটি হাতে, কিনতু অস্ত্র নেই সময়-কাটার। অথচ সে কবি, তার পক্ষেই সম্ভব শরীরের সকল রন্ধ্র খুলে পৃথিবীকে পান করা, তার জন্যেই সমীচীন রক্ষিতার মতো ভোগ করা পৃথিবীকে। আবুবকর এখন কোথায় যাবে। নীলখেত ফিরতে-ফিরতে সে একজন মহিলাবাদী অধ্যাপক, তিনজন রমণবিলাসী লেখক ও সাতজন স্ত্রীসাহিত্যিক দেখতে পেলো। তার সাথে জুটলো এক রাজনীতি-ব্যবসায়ী, বঙ্গদেশ খুন হতে থাকলো।

দশটা নাগাদ ঘরে ফিরে সে আবার একা। সহমর্মী এক নতুন বৃটিশ কবির সাথে কিছুক্ষণ কুয়াশায় হাঁটাহাঁটি করা গেলেও, এক জর্মন কুমারীকে নিয়ে রোমহর্ষক আলোচনায় মাতলেও সে দেখলো কি সাংঘাতিক এই একাকিত্ব তার। সহবাসী বন্ধুর নারী ও মদ্যপানের আহ্বান উপেক্ষা করে

বারোটা নাগাদ আবুবকরকে নামতে হলো রাস্তায়। নামতে সে বাধ্য ছিলো, এমন মনে হলো।

পথে—চারপাশে—ফালগুন দেখা দিয়েছে। কাঞ্চন ফুল বিকশিত। ডালে-ডালে আম্রমুকুল পুঞ্জিত। চঞ্চল মউমাছি। কেবল বেণুবন নেই, থাকলে শোনা যেতো দখিনা বাতাসে মর্মর। একটি-দু'টি গাড়ি আসছে মাঝে-মাঝে। যাচ্ছে ঝোড়ো বেগে। এতো রাতে কিসের তাড়া ওদের? নিরাকুল গান গাইতে-গাইতে যাচ্ছে পথচারী। বৃহৎ ও সুগোল চাঁদ একদম মাথার ওপরে। লারমিনি স্ট্রীটে পৌঁছবার আগে সে দেখলো তিনজন মাতাল, দু'জন মৃত ও একজন যুবতী প্রমোদবালা। গড়ে প্রায় পাঁচশো গজ পর-পর দেখেছে এদের, অথচ আবুবকরের মনে হলো এক সাথেই এই ক'জন হাঁটছে।

কবিরের আপা এবারো দরজা খুলে দিলেন। না এখনো ফেরেনি সে। রাতে না-ও ফিরতে পারে। আবুবকরের কিসের দরকার? ও, কবিরেরই জরুরি দরকার ছিলো। অতো দূর থেকে যখন এসেছে তখন একটু বসুক সে, হঠাৎ ফিরতেও পারেতো অনেক রাতে। খাওয়া-দাওয়া হয়েছে? আজ বরং থেকেই যাক সে এখানে। না-না, অসুবিধে হবে না।

কিছুক্ষণ পর কবিরের বাবা এলেন। আগে থেকেই আবুবকরকে চেনেন তিনি। কবিরকে নিয়ে অনেক কথাবার্তা হলো, ছেলেটা এমন বখে গেলো কেন।

কিনতু উদ্বেগ নেই কারো মুখে। কোনো ফোনও হয়নি থানায় বা হাসপাতালে বা স্বজনদের কাছে। অর্থাৎ কবির আজকাল প্রায়ই বাইরে রাত কাটাচ্ছে এবং নিরাপদেই ফিরে আসছে। আবুবকর যদ্দুর জানে তার কোনো নেশা নেই—না মদে, না মেয়েতে, না তাশে, না রাজনীতিতে; তাহলে এমন হয়েছে কেন ও? জরুরি প্রয়োজন ছিলো, কিসের প্রয়োজন। ষোলো আনা সম্ভাবনা অবশ্য পরামর্শের। কিসের পরামর্শ।

কবিরের ঘরে সে যখন একা তখন কাকে যেন তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলো। দেখলো একটি মুখ যাতে দু'টি চোখ ছাড়া আর কিছু

নেই। কিনতু কোথায় যে দেখলো! জানালাগুলি বন্ধ। কেবল অন্দরের দিকে দরজাটা খোলা। গাঢ় লাল রঙের পরদা সবসময়েই কিছু-কিছু দুলছে। ওখানে কি? কে? অসম্ভব। আসলে সে দেখেনি কোনো দৃষ্টি হয়তো, অনুভব করেছে মাত্র। কিন্তু সহসা এই অনুভব কেন?

অতএব ঘুম এলো না। জাগরণে যাবে বিভাবরী? মরি-মরি।

ডেস্কের ওপর রাখা বইপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলো আবুবকর। সব কিছুতেই কবিরের চিহ্ন লেগে আছে। লেন ডেইটন-এর ক'টি বই। হজরত মোহাম্মদের (স) উক্তি মনে পড়লো—'নারীকে তোমরা আঘাত করো না, ফুল দিয়েও না'। আজেবাজে কাগজপত্তরে 'পাম্পশূ পায়ে শামসু মিয়া সুট হামগুন পড়ে' ইত্যাদিব ছড়াছড়ি। ডায়রীর মতো একটা পেয়ে সে পড়তে থাকলো। কিছুক্ষণ পর বিরক্ত হয়ে রেখে দিলো। কিছুই নেই কৌতূহলের, উপভোগের। 'আমরা সবাই এই জরাজীর্ণ সমাজব্যবস্থার শিকার, একে পদাঘাতে-পদাঘাতে ভাঙা ছাড়া নতুন সুন্দর জীবন গড়া অসম্ভব'—এইসব। আবুবকরের মনে পড়লো মাতাল ও মৃত ও প্রমোদবালা ক'জনকে। মাথার ওপরে পূর্ণ চাঁদ। সেই চাঁদ।

বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লো সে। জানালার একাংশ রাখলো খুলে। না, ঘুম নেই। কবির এখন কি করছে? নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে না। এ-বিশ্বাস কেন জানি হলো তার।

অন্ধকারেই আবার ফিরতে হলো আবুবকরকে ডেস্কের কাছে। শীতলতায় মাথা ঠেকিয়ে, শরীর এলিয়ে বসে থাকলো। দু' হাতে টানতে লাগলো চুল। অনেক বড়ো হয়ে গ্যাছে চুল। বোদলেয়ারকে মনে পড়লো। বীঠোফেনকে মনে পড়লো। মনে পড়লো ব্লেক—উইলিঅম ব্লেককে। স্বর্গ-নরকের বিয়ে। শক্তি হচ্ছে শাশ্বত আনন্দ। কারণ শরীর আত্মার অংশবিশেষ মাত্র। জলপ্রেমিকদের জলেই ডোবাও। আইনের পাথরে কারাগার যেমন তৈরী, তেমন ধর্মের ইঁটে বানানো হয়েছে বেশ্যালয়। রমণীর নগ্নতা ঈশ্বরের কারুকর্ম। **For every thing that lives is Holy.**

বিদায়, ব্লেক। ঘুম।

ঘুম আসছে আবুবকরের।

কিন্তু আবার সেই দু'টি চোখ। কি চায় ওরা? অবসন্ন দেখে সে ওদের। দু'টি তীব্র কালো পাখি সোজা উড়ে আসছে। দিগন্ত অন্ধকার। চারপাশে আবার রাত্রি নেমে এলো। ও কি চাঁদ না উজ্জ্বল কোনো ফুল?

ঘুমে চোখ জড়িয়ে গ্যালো, সেই সঙ্গে আত্মার অংশবিশেষ, রক্তও বুঝি নিশ্চুপ। কিন্তু কে যেন আবুবকরের সমস্ত মুক্ত করে নিচ্ছে। গর্বিত জনের আভবণ হচ্ছে লজ্জা, তার দু'টোই অদৃশ্য হলো, কেবল থাকলো সৌন্দর্য। আবদ্ধ চোখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো দৃষ্টির কালো বর্তুল, দেখলো নগ্ন আবুবকরকে, যাকে লেহন করছে শয্যার পাশে দাঁড়ানো একটি পিপাসা; কখনো উবু হচ্ছে, আর ঘন শ্বাস ফেলছে। কখনো ফিরে যাচ্ছে, আর উত্তাল হচ্ছে বাহুতে।

চার চোখ একত্র হলো।

কে তুমি?

কে তুমি?

আমাকে ছ্যাখো।

আমাকেও ছ্যাখো।

ওরা পরস্পর একতা পায়। সেই ঐক্য থেকে জন্ম নেয় শিল্প, জীবনের বৃক্ষ, আর মৃত্যুর বৃক্ষ বিজ্ঞান কেবল হারাতে থাকে অতীত, তার ছায়া। বস্তুত একদা কল্পনা কোনদিন প্রত্যক্ষ হয়।

প্রখর আনন্দ নিয়ে জেগে ওঠে আবুবকর। অপসৃত হয় বৃক্ষ, বৃক্ষের মহান নৈশব্দ্য। ক্লান্তিতে জন্ম হয় তার। আবুবকর সুখী, ক্লান্তিতৃপ্ত।

চারপাশে সকালের আলো ফুটতে থাকে। কিন্তু ঘরের ভেতর এখনো গহন ছায়া। ওরা দু'জন একতা ভেঙে মুখোমুখি হয়। ওরা কেউ কারো মুখ দেখে না, দেখতে পায় না।

আবুবকর জানতে চায়—কে তুমি?

সে বলে—আমাকে চিনতে চেষ্টা করো না। পরিচয়ে মৃত্যু হবে তোমার।

নেই। কিনতু কোথায় যে দেখলো! জানালাগুলি বন্ধ। কেবল অন্দরের দিকে দরজাটা খোলা। গাঢ় লাল রঙের পরদা সবসময়েই কিছু -কিছু দুলছে। ওখানে কি? কে? অসম্ভব। আসলে সে দেখেনি কোনো দৃষ্টি হয়তো, অনুভব করেছে মাত্র। কিন্তু সহসা এই অনুভব কেন?

অতএব ঘুম এলো না। জাগরণে যাবে বিভাবরী? মরি-মরি।

ডেস্কের ওপর রাখা বইপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলো আবুবকর। সব কিছুতেই কবিরের চিহ্ন লেগে আছে। লেন ডেইটন-এর ক'টি বই। হজরত মোহাম্মদের (স) উক্তি মনে পড়লো—'নারীকে তোমরা আঘাত করো না, ফুল দিয়েও না'। আজেবাজে কাগজপত্তরে 'পাম্পশু পায়ে শামসু মিয়া স্যুট হামগুন পড়ে' ইত্যাদির ছড়াছড়ি। ডায়রীর মতো একটা পেয়ে সে পড়তে থাকলো। কিছুক্ষণ পর বিরক্ত হয়ে রেখে দিলো। কিছুই নেই কৌতূহলের, উপভোগের। 'আমরা সবাই এই জরাজীর্ণ সমাজব্যবস্থার শিকার, একে পদাঘাতে-পদাঘাতে ভাঙা ছাড়া নতুন সুন্দর জীবন গড়া অসম্ভব'—এইসব। আবুবকরের মনে পড়লো মাতাল ও মৃত ও প্রমোদবালা ক'জনকে। মাথার ওপরে পূর্ণ চাঁদ। সেই চাঁদ।

বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লো সে। জানালার একাংশ রাখলো খুলে। না, ঘুম নেই। কবির এখন কি করছে? নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে না। এ-বিশ্বাস কেন জানি হলো তার।

অন্ধকারেই আবার ফিরতে হলো আবুবকরকে ডেস্কের কাছে। শীতলতায় মাথা ঠেকিয়ে, শরীর এলিয়ে বসে থাকলো। দু' হাতে টানতে লাগলো চুল। অনেক বড়ো হয়ে গ্যাছে চুল। বোদলেয়ারকে মনে পড়লো। বীঠোফেনকে মনে পড়লো। মনে পড়লো ব্লেক—উইলিঅম ব্লেককে। স্বর্গ-নরকের বিয়ে। শক্তি হচ্ছে শাশ্বত আনন্দ। কারণ শরীর আত্মার অংশবিশেষ মাত্র। জলপ্রেমিকদের জলেই ডোবাও। আইনের পাথরে কারাগার যেমন তৈরী, তেমন ধর্মের ইঁটে বানানো হয়েছে বেশ্যালয়। রমণীর নগ্নতা ঈশ্বরের কারুকর্ম। **For every thing that lives is Holy.**

বিদায়, ব্লেক। ঘুম।

ঘুম আসছে আবুবকরের।

কিন্তু আবার সেই দু'টি চোখ। কি চায় ওরা? অবসন্ন দেখে সে ওদের। দু'টি তীব্র কালো পাখি সোজা উড়ে আসছে। দিগন্ত অন্ধকার। চারপাশে আবার রাত্রি নেমে এলো। ও কি চাঁদ না উজ্জ্বল কোনো ফুল?

ঘুমে চোখ জড়িয়ে গ্যালো, সেই সঙ্গে আত্মার অংশবিশেষ, রক্তও বুঝি নিশ্চুপ। কিন্তু কে যেন আবুবকরের সমস্ত মুক্ত করে নিচ্ছে। গর্বিত জনের আভরণ হচ্ছে লজ্জা, তার দু'টোই অদৃশ্য হলো, কেবল থাকলো সৌন্দর্য। আবদ্ধ চোখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো দৃষ্টির কালো বর্তুল, দেখলো নগ্ন আবুবকরকে, যাকে লেহন করছে শয্যার পাশে দাঁড়ানো একটি পিপাসা; কখনো উবু হচ্ছে, আর ঘন শ্বাস ফেলছে। কখনো ফিরে যাচ্ছে, আর উত্তাল হচ্ছে বাহুতে।

চার চোখ একত্র হলো।

কে তুমি?

কে তুমি?

আমাকে ছাখো।

আমাকেও ছাখো।

ওরা পরস্পর একতা পায়। সেই ঐক্য থেকে জন্ম নেয় শিল্প, জীবনের বৃক্ষ, আর মৃত্যুর বৃক্ষ বিজ্ঞান কেবল হারাতে থাকে অতীত, তার ছায়া। বস্তুত একদা কল্পনা কোনদিন প্রত্যক্ষ হয়।

প্রখর আনন্দ নিয়ে জেগে ওঠে আবুবকর। অপসৃত হয় বৃক্ষ, বৃক্ষের মহান নৈশব্দ্য। ক্লান্তিতে জন্ম হয় তার। আবুবকর সুখী, ক্লান্তিতৃপ্ত।

চারপাশে সকালের আলো ফুটতে থাকে। কিন্তু ঘরের ভেতর এখনো গহন ছায়া। ওরা দু'জন একতা ভেঙে মুখোমুখি হয়। ওরা কেউ কারো মুখ দেখে না, দেখতে পায় না।

আবুবকর জানতে চায়—কে তুমি?

সে বলে—আমাকে চিনতে চেষ্টা করো না। পরিচয়ে মৃত্যু হবে আমার।

—কিন্তু অপরিচয়ে তো আমার মৃত্যু। কবিরের মৃত্যু।

—না।

—কেন?

—এ তোমাদের ভুল। তোমরা জানো না মৃত্যুর যুক্তি আছে। কিন্তু এ-যুক্তি নয়, শক্তি।

—কবির ফিরছে না কেন?

—ভ্রান্তিতে।

—আমিও ফিরবো না। অর্থাৎ আর কোনাদিন আসবো না। আমারো মৃত্যু হোক।

—না। প্রেমে তুমি জন্ম নাও আবুবকর, বাঁচতে থাকো।

সে চলে-চলে যায়। পরদা একবার কাঁপিয়ে দাঁড়ায়—আমাকে খুঁজো না।

আবুবকর তার অন্তর্ধান দেখে। রাত্রির ছায়াটি কে? সে কেন আনন্দের কথা বলে, আনন্দে কি পেয়েছে জীবন, তার জীবন, আমাদের জীবন?

সকাল আরো উজ্জ্বল ও শব্দিত হয়। জানালা খুলে, দরজা খুলে সে বারান্দায় যেয়ে কি খোঁজে। কবিরের পিতা বাগানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ইতিমধ্যে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে অপরিচিত এক পুরুষ। হাতে ছড়ি। মাথায় টুপি। মনে হয় বেড়াতে বেরিয়ে এখানে থেমেছেন। তাঁকে কেমন খেয়াল করছেন কবিরের আপা। তা নিয়ে বুঝি রগড় করছে ছোটো বোনটি।

এ-বাড়ির সবাই এতো ভোরে জেগে যায়? কেন যায়?

আবুবকরের কেমন শুষ্কতা পায়। ঘরে ফিরে আসে। বসে। বাথরুমে যাবে কি যাবে না করে। শেষে সিগরেট জ্বালে। তখন শুষ্কতার সঙ্গে-সঙ্গে দহন শুরু হয়। এদিকে চারপাশে দীপ্তি। তার কিছু নিয়ে ঘরে ঢোকে কবিরের ছোটো বোনটি—ভাইয়া!

—কি?

—নাশতা করবেন না? চটপট হাতমুখ ধুয়ে ফেলুন।

—হ্যাঁ। কিন্তু নাম কি তোমার?

—আমার নাম? আমার নাম মউ। আর আপার নাম লোপা। লোপা'পা। আমি বলি পাপা।

—কোন ক্লাশে পড়ো তুমি?

—তা বলবো না। আপনি আমাকে কবির ভাইয়ার মতো খুকী ভাববেন তো!

—না মোটেই ভাববো না।

—উ, বললেই বিশ্বাস করছি বুঝি। আপা কাউকে বিশ্বাস করতে মানা করেছেন। আব্বুকেও না। আম্মুকেও না।

চঞ্চল বাচাল হাসিখুশি মেয়েটা আবুবকরকে চমকে দিয়ে চলে যায়। এই অনুকরণের নাম সমালোচনা। কেন সে ভাইয়া ডাকলো? কবিরের সমান সম্মানী পাওয়া সম্ভব নয়।

খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু আবুবকর এ-নিয়ে করতে লাগলো নাড়াচাড়া, কেন এমন হয় এবং কেন এমন হওয়া উচিত নয়। বাথরুম থেকে ফিরে আসার পর, একাকী নাশতা সারার পর তুচ্ছাতিতুচ্ছকে নিয়ে তার আবার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বাড়াবাড়ি যেমন পৌঁছে বিষয়ান্তরে, তেমনি তাকে এক সময় ভাবতে হয় সামান্য সেই চমকে যাওয়ার কথা। অ্যালবিয়নের কোনো কন্যাকে দেখেছে। দেখেছিলো কি? বন্দিনী সে কাঁদছে। কিন্তু শক্তি, শাশ্বত আনন্দ, তুমি কে? তুমি কোথায়? অচরিতার্থ বাসনাকে লালন না-করে বরং দোলনার শিশুটিকে হত্যা করো। জন্ম! জন্মের শিল্প। প্রচুর জন্মানোর নাম সৌন্দর্য!

মউ-র পাপা আবার ঢুকলেন ঘরে। নাশতার টেবিলে তাঁর সাথে কোনো কথা হয়নি। সারাক্ষণ তিনি কথা বলছিলেন সেই প্রশান্ত পুরুষের সঙ্গে। এখন কি বলতে চান বা বলবেন?

আবুবকর আগেই কথা কয়ে উঠলো—আপা, আমি এখন চলে যেতে চাইছি।

লোপা অদ্ভুত চোখে তাকে দেখলেন। যেন তার কথা কিছু শোনেননি, কিংবা অন্য কিছু ভাবছেন। বললেন—কবির!

—আমি আবুবকর।

—কবির!

—উ। দেখুন···

লোপা তখন চলতে শুরু করেছেন। আনমনা। বারান্দায় যেয়ে দাঁড়ালেন। সেই রোমশ পুরুষ এখনি বোধহয় বেরিয়ে যাবেন।

—ভাইয়া!

—মউ! ও। আমি এখন চলে যাচ্ছি।

—কেন ভাইয়ার সাথে দেখা করবেন না?

—ও তো এখনো এলো না। আর কতো অপেক্ষা করা যায়। আমার খুব কাজ আছে।

—কবির ভাইয়া তো আছে। কি বদলে গ্যাছে যে একদম চেনা যায় না। এতো সুন্দর হয়েছে তবু ওকে আগের মতো ভাল্লাগে না।

—কি বলছো তুমি!

—সত্যি বলছি। ওকে···

মউ হঠাৎ থেমে গ্যালো। লোপাকে দেখেই খুব সম্ভব। লোপার চোখেমুখে রোষ। এ-বাচালতার জন্যে শাসাতে গ্যালো, কিন্তু হলুদ ফ্রকের কিশোরীটি তখন পলাতক। লোপা দাঁড়ালো আবুবকরের সামনে —তোমার যাওয়া হবে না কবির।

—কেন?

আবুবকরের স্বরে এই প্রথম তীব্রতা ধ্বনিত হলো। শিলাতটে আছড়ে পড়া তরঙ্গের আক্রোশ তার বুকে।

—তুমি বাইরে গেলে ফিরতে চাও না। অন্যায় সুবিধে ভোগ করো। শান্ত হলো আবুবকর—আপনি ভুল করছেন, আমি কবির নই।

—তুমি কবির।

—না।

—প্রমাণ চাও?

—চাই।

—দিতে পারি, কিন্তু তার আগে তোমাকে বলতে হবে কেন তুমি

লুকোতে চাচ্ছো। ভয়ংকর আজগুবির আশ্রয় নিয়ে পালানো তোমার উচিত হবে না।

—প্রমাণ পেলে আমি এসব কথার জবাব দেবো।

—দেবে? দিতে পারবে? তবে যাও অই আয়নার সামনে, ছাখো নিজেকে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আবুবকর দেখে সে কবির। সে নত হয়ে যায়, আঁকড়ে ধরে লোপার জানু—আমি কবির।

তখন সেই চোখগুলি দেখা যায়। চারটি চোখ, দু'টির বদলে। রাত্রির ছায়া দিনের কারনিশে স্পষ্ট হয়ে উঠে। তার মুখ একটি চোখ, বুক দু'টি চোখ আর নিতম্বের সংকীর্ণতায় একটি চোখ। দৃষ্টি ভেদ করছে আবুবকরকে, গেঁথে রাখছে দেয়ালে। পাখি বানায় নীড়, মাকড়শা বোনে জাল, মানুষ গড়ে বন্ধুত্ব, কিন্তু তুমি কে—কি করো তুমি? তোমার চুল—রাশি—রাশি উত্তাল চুল—তোমার জন্যে ছায়া, অই ছায়ার ভেতর কি? আরো—আরো চোখ?

কি হয়েছে কবিরের?

জানতে চান কবিরের বাবা।

—ও অমন করছে কেন লোপা?

জানতে চান সম্ভ্রান্ত অতিথি। তিনি উঁকি মেরে কি দেখেন। লোপার জানু? আবুবকরের রক্তাক্ত হাত? কাচবিদ্ধ চোখ? Eternals! I hear your call gladly. তিনি কি জানেন the head sublime, the heart Pathos, the genitals beauty, the hands & feet Proportion?

—ওকে ঘুমিয়ে রাখো বাবা। ওর এখন ঘুমের দরকার। ঘুমোবে ও। লোপা বলে। করুণ হয়ে গ্যাছে সে, অথচ বুকের ভেতর তার বনে-বনে ফোটা ফুল, দুল্যমান নবীন পাতা। হায়! জ্ঞানী ও মুর্খ একই গাছ কখনো ছাখে না!

আবার গভীর রাত্রি ও তার ছায়া। কি আজব স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙেছে আবুবকরের। কেন এমন স্বপ্ন দেখলো? বুকের ভেতর যেখানে খুউব নরম একটি বুক সেখানে ঠুকে দে'য়া হয়েছে যীশুর জন্যে আনা

পেরেক। হে জেরুজালেমের বিদগ্ধ যুবক-যুবতী ও অ্যালবিয়নের বন্দিনী কন্যাগণ, ছাখো কি আক্রোশ বাহুতে, কেমন জাজ্বল্যমান কেশরাশি, ছাখো পশ্চিম সাগরের অস্তায়মান আগুন! শয়তানের গভীর স্তনদ্বয়ে মুখ রেখে ছাখো রাহাব কেমন গ্যালো শাশ্বতীর দেশে। শারলেমেনের সন্ন্যাসী, হে ধূসর বৈরাগী, এ-অশ্রু ছাখো, for a tear is an Intellectual thing. পুরুষ তুমি পান্না-মোতির কারনেস; নারী, তুমি সোনালী তাঁত; কবির, তুমি এখন খরদীপ্তিময় এক সিংহ, ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। শাশ্বতী, তুমি মহাকাল-সন্তানের জন্যে, তোমার প্রেম সে-ই পায়। ···আবুবকর এ-সমস্ত স্বপ্নের ভেতর দেখে কবিরকে, ক্যারিবিআন সাগরের তীরে উলঙ্গ শুয়ে আছে, তাকে লালাসিক্ত করছে বেলাভূমির রৌদ্র, হাওয়া, পুরুষ, শীতল পিছল ঢেউ। আবার অন্ধকারে কবির, কায়রোর এক নৃত্যশালায়, মদমত্ত উদরনৃত্যে উত্তরঙ্গ, নগ্ন জেরিন আফোকিকে চুষে-চুষে খাচ্ছে।···কবির এখানেও।.

না, ঘুম ভেঙেছে আবুবকরের। পাশে গত রাত্রির সেই ছায়া সম্পূর্ণ বদলে গ্যাছে মূর্তিটি। অবিকৃত আছে মাত্র চারটি চোখ: ওপরের মৃদু ও ভীতু একটি চোখ, মাঝের বিশাল ও কাতর দু'টি চোখ, নিচের স্ফীত ও উৎসাহী চোখ। এমন কেন ও? কিন্তু দৃষ্টি! অহো, কি ভয়ংকর। নগ্ন হয়ে আছে আবুবকর, জ্বলে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে।

—বিশ্বাসঘাতক!

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে আবুবকর। কিন্তু সে খুব নরম ও সুরেলা স্বরে বলে—তুমি আজো খুব ভুল করছো কবির।

—না, করছি না। বিশ্বাসঘাতক তুমি, একশ'বার বলবো এ-কথা. চেঁচিয়ে জানাবো সবাইকে। এভাবে আমাকে পুড়িয়ে মারবার জন্যেই কি থাকতে বলেছিলে কাল?

—আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারি? গোলাপ, আমার গোলাপ তুমি। বাঘ, বাঘ, জ্বলন্ত অঙ্গার তুমি। নিজেকেই দহন করে দীপ্তি পাচ্ছো তুমি।

—আমি?

—হ্যাঁ, তোমার মন ভালো ছিলো না সারাদিন। লোপাকে, মউকে, কবিরকে তুমি আজ নষ্ট করতে চেয়েছিলে!

—না, চাইনি। তোমাকেই চেয়েছি।

—আমি কখনো নষ্ট হবো না। আমার অগ্নিশুদ্ধি হয়েছে, এ্যাদ্দিন তোমার তা বাকি ছিলো। এসো, এখন এসো আমার কাছে। নাও এই চোখটি, রাখো প্রেম। নাও এই চোখ দু'টি, দাও আক্রমণ। নাও এই চোখটি, করো প্রবেশ। তুমি আত্মা, আমি তার অংশ।

* * * *

সকালে লোপা ডাকলো। মউ ডাকলো। বাবা ডাকলো। উপস্থিত হলো কবির। আবুবকর শুনলো প্রয়োজন। একসাথে নাশতা খেতে-খেতে তখন সবাই এরা পরস্পরকে ভালবাসলো, আক্রমণ করলো এবং শেষ পর্যন্ত হত্যা করলো। ছায়াটি কেবল এ-সমস্ত দৃশ্য দেখলো অশ্রুতে, তার মুখ ভেসে গ্যালো।

# গোরনিদ্রা

**শওকত ওসমান**

দমকা নির্বাপিত কোলাহলের রেশ বাতাসকে হটিয়ে দিয়ে যে গুমোট সৃষ্টি করে তা কান পেতে শোনা যায় না। কিন্তু রক্তের প্রবাহ তার যেই দুই হাতে তেড়ে ধরে, শত্রুর কাছ থেকে আলিঙ্গন দাবীর ভঙ্গীতে: ছলাচ্ছল বুক তড়পে তড়পে চোখকে সজাগ করে, পায়ে বেড়ি লাগায়। তোমাকে হাঁটতে দিতে চায় না। তবু তুমি হাঁটো। হৃদয়-সড়কে অন্ধ রাত-ভিখিরীর হাতড়ানি তখন আরম্ভ হয়।

আমি হাঁটছিলাম। জন শূন্যতায় প্রেতায়িত পথ হঠাৎ সুমসাম শরতের নদীর মত আকাশে চোখ রেখে বিশ্রামপ্রার্থী। দু পাশের ইমারৎ শুধু মাথা তুলে তার নক্ষত্র অভিসারে বাধা দিচ্ছে। সন্ধ্যা ত কখন পার হোয়ে গেছে। আজ টেরও পাইনি। কিন্তু জানি, সায়ং প্রহর ক্রমশঃ অনেক অনেক অন্ধকারকে ডাক দিয়ে গেছে ঢ্যাঁড়াদার বাদুড় মারফৎ। এই জানা কোন অনুভূতির মারফৎ পাওয়া, তা বলতে পারব না।

নিজের শূকর-অভ্যাস ভুলে আকাশের দিকেও চেয়েছিলাম একবার। হাজার হাজার নক্ষত্র ফুটে আছে। কিন্তু চোখ কোথাও ত স্থির থাকতে চায় না। সড়ক-পার্শ্বস্থ গাছের শাখা-প্রশাখারা বেয়নটের মতো খোঁচা খোঁচা কদর্যতায় দৃষ্টিকে ঠেলে ফিরিয়ে দিলে। দুঃসহ নির্জনতা এক দানবীয় রূপে আমার পেছনে পা ফেলছে নিছক বিদ্রূপের জন্য। ক্ষীণকায় নাগরিকের অনুকরণ মহড়ায় বিপুল-কদ্ মল্লবীরের হাস্যাবতারনার মত। আশে-পাশে দাঁড়ায়, এমন দর্শকেরাই হাসে। কিন্তু বিন্দুতম যেমন শব্দ আমার কানে আঘাত করে না। খুব জোর চাপা ফিস ফিসানির আওয়াজ আন্দাজে ধরা যায় মাত্র। গ্রাম-জনপদে বাঘের সংবাদে যেমন সূর্যের আলো-নেভার সঙ্গে সব নিশুত হোয়ে যায়, এও তেমনি। পথ ফাঁকা। সড়ক নির্জন। অথচ সবাই জেগে আছে ঘরের মধ্যে খিল এঁটে। আসন্ন

দিন ও বিপদের কথা ভাবছে। বাতাসে শুনছে হুঙ্কার বা থাবা-বন্দী মানুষ কি জন্তুর দূরাগত আর্তনাদ।

হাঁ, সড়কের সারি সারি ঘরে মানুষ এখনও ঘুমোয় নি। কয়েকটা ঈষৎ খোলা খড়খড়ি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল নিঃশব্দে। ওর পেছনে কি মানুষ নেই? ঝাপসা চাঁদের আলোয় আমায় তীক্ষ্ম দৃষ্টিজালে তা ধরা পড়েছে।

কিন্তু এই গুমোট থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে কোন দরজায় টোকা দিলে, কেউ সাড়া দেবে না। এই সড়কের বাসিন্দাদের খসলৎ আমার জানা আছে। ভান করবে, তারা ঘুমোচ্ছে আসহাব কাহাফের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। বাতি নিভিয়ে ঘরের কামরায় কি বারান্দায় যদি ওরা হাঁটে, তোমার উপস্থিতি টের পেলে তারা স্টুট্ করে থেমে যাবে—যেমন গৃহস্বামীর পদধ্বনি—ভীত চাউল গোলার নেংটি ইঁদুর।

তাই একা একাই হাঁটছিলাম। থামিনি কোথাও। কথা হৃদয়ের উত্তাপ বিকীরণের ষ্টেশন। মনের গুমোট থেকে রেহাই পেতে তাই মানুষ খোঁজে মানুষ। একান্ত মনের দোসর না হলেও চলে। কিন্তু এই পল্লীর হদিস আমার জানা আছে বলেই পায়ের কামাই ছিল না। সব খিড়কী বন্ধ, সব দুয়ার রুদ্ধ। বিচিত্র কিছু নয়। জীবনযাপন পাঁয়তারা মাত্র! বাঁচতে চাও, শুধু পাঁয়তারা কষো। সকাল থেকে চৌপর দিন, সারা রাত্রি। সহজ বাঁচা এ পাড়ার লোকেরা কবেই বিস্মৃত। পাঁয়তারা পাঁয়তারা। এই কষাকষির হদিস না জানলে তুমি মড়া। দরজা জানালার ওপারে কৌশলবিদরা সব জেগে জেগে ঘুমোচ্ছে। রাস্তা জনহীন।

আমি কিন্তু এগোচ্ছি। গ্যাসের স্তিমিত আলো আজো জ্বলছে কোথাও কোথাও। জানালার দুই পাল্লা দুই কোন ঘরে একদম সাঁট সাঁটা। পিপীলিকার প্রবেশ ফাঁক করে ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য কেউ কেউ দুই পাল্লা হয়ত পেছনে ধরে বসে আছে। গ্যাসের আলোয় দেখলাম, হঠাৎ একটা পাল্লা চট করে খুলে গেল, বেরিয়ে এলো একটা নগ্নহাত। সে হাত নাড়ছে। কার জন্য? হাতের ভাষা আমার জন্যে নিশ্চয়। ইসারার অর্থ ফিরে যাও। একা একা কোথায় যাচ্ছো ওদিকে। নিমেষে হাত উধাও। দোতালা

জানালার দুই পাল্লা আবার সেঁটে মিশে গেল। গ্যাসের আলো রং ছুট কাঠের দাঁত খিচুনি স্পষ্ট করে তুললে। ঘরের বাসিন্দাগুলো কাঠের তৈরী, বাইরে তাদেরই মুখ দেখতে পেলাম যেন।

বেদনার ক্রুশবাহী আমি যীশুখৃষ্ট। হয়ত ক্যালভেরীর সড়কে এগিয়ে যাচ্ছি। কণ্টক মুকুট আমার মাথায়, নয় বুকে। ধর্ষিতা বাতাসও আজ গোঙানি ভুলে গেছে। অসহ্য গুমোট ভেতরে, বাইরে। চোখের জ্বালায় অশ্রুর উঁকি পর্যন্ত অসম্ভব। দগ্ধ ঘায়ের উপর পানির সিঞ্চন কোনকালেই তাপহর ছিল ?

আর এক সড়কে এসে পড়েছি, খেয়াল ছিল না। এখানে দুপাশে মাঝে মাঝে গাছ আছে, আগাছার বন আছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, শুনতে পেলাম। মাথার উপর গাছ-আশ্রিত পাখীর ডাকও কানে গেল। হয়ত পাখী! তখন অত লক্ষ্য করিনি। বনজশীতলতা আছে, এখানে না থাক বাতাস। সড়কের উপর কয়েকটা ছুঁচো ছুঁ ছুঁ শব্দে দৌড়াদৌড়ি করছে। এরাও বুঝেছে, সড়ক জনশূন্য। তাই স্বাধীনতা উপভোগ-মত্ত। ছুঁচোরাও টের পায়, স্বাধীনতার মর্ম বোঝে। গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে পাথুরে সড়কের উপর। আমার উপস্থিতি তাদের ভয়ের কারণ হোল না। কারণ, একটা মানুষ তো আর মানুষ নয়। দল বেঁধে গেলে না হয় ভয় পাওয়ার কথা। তা-ও ছুছুন্দর যেমন বোঝে। হুপ্পোড় তুহে জীবগুলো আগাছার রাজ্যে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল।

সটান সড়ক। চোখ তুলে সামনে দেখে নিই। এবার আমার বিস্ময় সহজে কাটে না। আমার কাছ থেকে দু'শ গজ—হাঁ, কি তার কিছু বেশী দূরে—দেখলাম, চারজন লোক হাঁটছে। এই সড়কে আরো মানুষ চলাফেরা করছে। বিস্ময় বৈকি। চোখ কচ্‌লে নিই। ওরা কী যেন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কাঠের উপর তার লক্ষণ স্পষ্ট। সবকিছু নিজের কাছে আরো স্পষ্ট করে তুলতে আমি দ্রুত পা চালাতে লাগলাম।

অতি ঢিমালয়ে হঠাৎ আলোড়ন দেখা গেল গাছপালায়। মড়ার খুলির মধ্যে বাতাসের শীৎকার যে ফিসফিসানী তোলে. তারই মৃদু রব কানের

কাছে এসে পৌঁছায়। আমি কিন্তু চলা বিস্মৃত হইনি। দূরত্বের ফারাক অনেক কমে এসেছে। হয়ত আর একশ গজও নয়।

এবার দেখতে পেলাম, সেই জন চতুষ্টয় একটা লাশ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। সকলের কাঁধে শবাধারের ডাঁট। আধেয়টা পরিষ্কার না হলেও চোখে দেখা যায়। লাশ চাদরে ঢাকা। শবাধার একেবারেই নিরাভরণ। কাঠে পালিস পর্যন্ত নেই। আর ফুলের কোন নাম-গন্ধ কাছাকাছি আছে বলে মনে হোলো না। তা থেকে অনুমান করা যায়, এ মৃত্যু অতি সাধারণ মৃত্যু। তার কোন আলোড়ন জীবনের ক্ষেত্রে বুদ্বুদ তোলে না। আর শব যে অতি সাধারণ কোন জীব, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। মাত্র চারজন শব-বাহক। শোক-যাত্রী একজন থাকলেও বোঝা যেত, এই মৃত্যু কিছু রেশ রেখে গেছে পেছনে।

আমার আর কৌতূহল থাকার কথা নয়। রোজই ত কত মৃত্যু ঘটে, আর গোরস্তানে কত মড়া পোঁতা হয়—এর আবার খোঁজ নেব কি? যে মৃত্যু জানা দিতে পারে, তার খবর শহরে বনাগ্নির মত দাহন তোলে নিমেষেই।

কিন্তু পথে মানুষ আছে—এই ত আজ বিস্ময়। তা জীবিত কী মৃত দেখার প্রয়োজন কী? আর জীবিত মানুষ ত চারজন রয়েছে। ওদের সঙ্গ আজ না লাভ করলে, অনেক আপশোস থেকে যাবে। পথে যে বেরুলাম তার দাম চাইব না? নিছক কৌতূহল যদি মেটে তাই মন্দ কী। সাথ ধরতেই হবে ওদের। গ্যাসের স্তিমিত আলো হেথাহোথা ছড়িয়ে আছে, চাঁদ উঠেছে ইতিমধ্যেই। তাই পথের ছমছম অস্পষ্টতা দূর হোয়ে গেছে। পথ চলতে তেমন অসুবিধা ঠেকে না। আর সব শ্রান্তি চুরি করে নিয়ে গেছে কৌতূহল। মানুষের গন্ধ পাওয়া রাক্ষসের মত আমার দুই চরণ তখন দ্রুততার প্রতীক।

কিন্তু সাথ ধরা যত সহজ মনে করেছিলাম, তা আর হয় না। আমার অগ্রবর্তীরা বেশ জোরে হাঁটছে। এক শ' গজের ব্যবধান আর ক্ষয় করতে পারছি নে। মনে হয়, কত যুগ না হাঁটলাম। অথচ গন্তব্য পারদ-তরলতায় পিছলে পিছলে যাচ্ছে। হয়ত দিগন্তের মতই এর অবস্থান মরীচিকাময়।

আমি রীতিমত ঘেমে উঠলাম পথ হাঁটতে। হাঁটতে শ্রান্তি-জাত বৈকল্যে আমার কানের ভেতর তখন নানা শব্দ উঠেছে। হিসহাস চিচাক্রুমদাম ঠংঠাং। গোটা পাওয়ার হাউজ যেন মাথার মধ্যে ঢুকেছে। আমার পা পরাজিত শববাহীদের কাছে। একবার ভাবলাম দৌড় দিয়ে দেখলে কেমন হয়। কিন্তু প্রেতায়িত মৌতাতে বুঁদ শরীর, কোন শক্তি নিয়ে বা দৌড় দেবে?

পিছু নিলাম ঝানু গোয়েন্দার মত। জানি স্থানের ফারাক দূর করতে পারছিনে, তবু। দূর থেকে শুনতে পাচ্ছি, ওরা এগোচ্ছে আর আরবী দরুদ পড়ছে মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে। ওদের সহযাত্রী হতে পারলে ত শব-বাহনের কিছু শ্রম হ্রাস করতে পারি। লোকগুলো একবারও পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে না। চীৎকার দিতে গিয়ে নিজের অক্ষমতায় লজ্জা পেলাম। বহুদিন আহার ব্যতীত আমার গলা ত আর বিশেষ কোন কাজে লাগে নি। ছোট বিলের মাছের ফুলকার মত আমার কণ্ঠ কমজোর। চীৎকারে ওদের চলা থামাতে পারব না।

জোরেই হাঁটতে লাগলাম। এবার আমার কোনদিকে আর কোন দৃষ্টি নেই। নিজের সমস্ত অক্ষমতা-জাত লজ্জা আমি ভুলে গেছি। এক ওদের সাথ-ধরা ছাড়া আর সব চিন্তাই ঝেঁটিয়ে ফেললাম বুকের দম নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বেঁধে। পায়ের পেশী তখন হুকুম শুনলে। দ্রুত হাঁটতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ চলার পর টের পাই, আমি ওদের কাছাকাছি এসে পড়েছি। হাঁ, লাশ শবাধার, শববাহক—আমার চোখ বিন্দুমাত্র ভুল কিছু দেখেনি। আমি আরো নিকটবর্তী। ওরা জোরে জোরে আরবী কলমা পড়ছে মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে। আমার কানে তার স্বরে সব ফুটে উঠে। ঘন ঘন কানে ঢেউ আছড়ে পড়ে প্রার্থনার। আমার চোখ শুধু শবাধারের উপর। অন্ধকারে সেদিকে লক্ষ্য রাখাই পথশ্রম থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়।

চাঁদের আলো হঠাৎ উছলে পড়ল আরো উজ্জ্বল প্রভায়। গাছপালা শন্‌শনিয়ে উঠল বুকের চাপা নিঃশ্বাস ছুঁড়ে ফেলে। ফিকে অন্ধকার স্বপ্নের

আবরণের মত দুলে উঠল ঘুম ভাঙ্গার পূর্বে। পাখীর পাখনায় চিড় খায় সড়কের গুহা-নির্জনতা। আমি হাঁটছি। লক্ষ্যবস্তুর উপর নিবদ্ধ দৃষ্টি।

হঠাৎ খেয়াল হয়, আমার আর মাত্র এক ধাপ দূরে ওরা হাঁটছে। না, হাঁটছে না। চারজনে থ দাঁড়িয়ে গেছে। এই অভাবনীয় ব্যাপারে আমিও থমকে যাই, দাঁড়িয়ে পড়ি। চোখ কচলে তাকাই ওরা আর নড়ছে না। একদম অনড় দাঁড়িয়ে গেছে। বিশ্রাম নিচ্ছে, তাও নয়।

তারপর আমার চোখ বিস্ময়ে হাবুডুবু খায়। প্রথমে আমি ত ভয় পেয়ে যাই। কোন ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটছে না ত?

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখলাম চাদর ঢাকা শব উঠে খাটের উপর বসল না শুধু, এক কিনারা ধরে লাফ মেরে নীচে নেমে আমার দিকে এগোতে এগোতে হেঁকে উঠল, "স্লামালেকুম! স্লামালেকুম।"

আমি ভূতের সঙ্গে কথা বলব? আমার ভয় কাটে না! তবু প্রেতেরও মন রক্ষা করে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। কোনরকমে উচ্চারণ করে ফেললাম, 'আলায়কুম আস্‌সালাম।'

সদ্য-জীবিত লাশ দ্রুত আমার করমর্দন করতে করতে বললে, 'ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ভূত নই। ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম মাত্র। আমি জ্যান্ত। আসলে ওগুলো মড়া, দাঁও-মত আমাকে বয়ে আনছিল। আসুন, দেখুন—।'

সে আমাকে আঙ্গুল বাড়িয়ে এক একটার কাছে নিয়ে গেল।

আশ্চর্য, চারজনই মড়া। মাথার মগজ মাংস বহুদিন উধাও। স্যাঁতলা দাগ পড়ে গেছে। খুলীর মধ্যে দাঁতগুলো বিকট।

বিপদোত্তর শঙ্কায় চোখ বন্ধ করে নিলাম।

# হাত

## রাবেয়া খাতুন

দূর থেকে মনে হচ্ছিলো টকটকে লাল রঙ্গের একটা চওড়া রেখা। স্থির স্থবির। জাহাজ যত কাছিয়ে এলো রেখাটা প্রমাণ হলো খণ্ডিত এবং চলায়মান চিহ্নের।

রক্তরাঙ্গা কুর্তা পরা কুলিরা ঘাটে ভেড়ার আগেই যে যেদিক থেকে পারলো লাফিয়ে প'ড়লো, ছড়াতে সুরু করলো সারা জাহাজ ভরে।

রেলিং-এর ধারে, ভরা দুপুরের সূর্যের জ্বালা দুচোখে নিয়ে, যমুনার ঘোলাটে পানির দিক থেকে মুখ ফেরাতে হলো ওদেরই একজনের ডাকে। হ্যাঁ মালগুলো দিতে হবে বৈকি। মাল বলতে অবিশ্যি যা বোঝায়, তার সঙ্গের জিনিষগুলি আদৌ সে পর্যায়ে প'ড়ে কিনা সন্দেহের বিষয় তবু প্রত্যাশা জ্বলজ্বল নয় কুলির দুটি চোখ। সেখানে অটল স্থিরতা। সেদিকে লক্ষ্য করে এতক্ষণ প্রায় তলিয়ে থাকা মনের সেই ঘূর্ণিটা প্রচণ্ড বেগে পাক খেয়ে উঠলো যেন। যে হাতটা অজান্তে রেলিং আঁকড়াবার ব্যর্থতায় উপহাস কিংবা করুণার খোরাক হয়েছিলো কারু কারু চোখে, সেটা প্যাণ্টের পকেটে ভ'রে নিয়ে, ছোট্ট সুটকেশটা কুলিকে তুলে নেবার নির্দেশ দিয়ে রকিব এগুলো ধীরে ধীরে।

আপার আর লোয়ারের দুটি প্রবেশ পথই ব্যস্ততাহীন এখন। তবু ভেজা বালির বুকের অসংখ্য অসমাপ্ত পায়ের ছাপ, শুকনো বালির হাওয়া ওড়া অবস্থা থেকে স্পষ্ট ধরা যায় একটু আগে কি অস্থিরতার প্রতিযোগিতা ঘটে গেছে অপরিসর এই পথ দুটিতে। দু পাশের হোটেলগুলির কর্ণভেদী প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরও স্তিমিত এখন। আজ দুপুরের ভাগ্য-লিপি তাদের কি ছিলো ঐ দ্রুত ব্যস্ত যাত্রীদের চলায়মান সময়টির মধেই নির্ণীত হয়ে গেছে প্রায়।

গাড়ীর মধ্যম মানের কোটরগুলি অসহিষ্ণু স্বরে আরণ্যক স্বার্থপরতায়

পরিপূর্ণ যখন, সৌজন্যতার চিন্তা যখন অলীক স্বপ্নেরই বাস্তব রূপ, তখন রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকার যে সত্যটা আর একজনের জন্য শুধু কষ্ট কিংবা অসুবিধার, তার জন্য সেটি অসম্ভব ভাবনার মধ্যেও সে দ্রুত এগুবার চেষ্টা করলে না।

কি এমন আর ক্ষতি হয় যদি গাড়ীটা তাকে ফেলেই চলে যায়? সামগ্রিক এক জীবনের জন্য সামান্য এই অসুবিধাগুলি আর কত গুরুত্বে অধীরতা দান করতে পারবে তাকে?

বরং সেইসব নিরুপায় অবস্থাগুলি থেকে এই আক্ষেপ, এই ভোগান্তির চেহারা অনেক সুস্থ এবং স্বাভাবিক।

একটু আগে, হ্যাঁ যমুনার ঘোলাটে স্রোতের দিকে চেয়ে সে যখন অনেকের মধ্যেও একাকী থাকার নিরাপত্তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলো, শেষ পর্যন্ত তা সে পারেনি। তার অদৃশ্য স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডিরেখা পার হয়ে তার একক চিন্তার রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন এক প্রৌঢ় প্রশান্ত মুখ। সে কথা বলতে চায়নি, ঘনিষ্ঠ হ'তে চায়নি, কিন্তু আশ্চর্য চিন্তার সেই অবাঞ্ছিত মুহূর্তগুলি যখন বর্তমান হলো তাকে তখন আর অবাঞ্ছিত মনে হয়নি। সে কথা বলছিলো, আনন্দ পাচ্ছিলো, অথচ সেই কথাগুলি ছিলো তার বর্তমান জীবনের চরমতম বেদনার। অথচ এক-সময় সেইগুলিই তার গর্বের ছিলো। সময়ের অনেক নিগৃহ যাকে নতুন রূপ দিয়েছে। সে বিশ্বাস করতে চাইছে গর্বিত সেই ঘটনাকে বেদনার বলে, চরমতম দুঃখের বলে।

কিন্তু শ্রোতা ভদ্রলোক সব কথা শোনার পর যখন কণ্ঠে আবেগ আর সমবেদনায় সুর নিয়ে উচ্চারণ করলেন 'আহা' শব্দটুকু, তখন তার ইচ্ছে হয়েছিল প্রচণ্ড এক চাপড় কষে ভেঙ্গে দেয় তার প্রৌঢ় মুখের সবটুকু প্রশান্তিকে। কিন্তু ইচ্ছে শুধু ইচ্ছেই। সে অক্ষম এই যন্ত্রণা তাকে মৌন করে তুলেছিল পর মুহূর্তে।

যন্ত্রণা নীল ঘোলাটে চোখের দৃষ্টির ওপর সে তখন তুলে ধরেছিলো তার পাঞ্জাবিহীন হাত দুটি। দশটি আঙুল আর দুটি হাতের পাতার জন্য জীবনের যে ফুলগুলি তার হাতছাড়া হ'তে বসেছে তারই আক্ষেপে পূর্ণ

হয়ে উঠতে উঠতে সে যেন জ্বলে উঠেছিলো পরমুহূর্তে—না, কারু করুণার পাত্র সে নয়, হতে পারে না।

তার মনে পড়েছিলো বিভাগ পূর্ব বাংলার তদানীন্তন রাজধানীর এক প্রায়ান্ধকার গলির ছোট্ট একটি ঘরের স্মৃতি। সূর্যের আলো যেখানে ঢোকে না, প্রকৃতির একটু মুক্ত হাওয়া, না তাও নয়। তবু সেই আলো বাতাসহীন ঘরেই দিনরাত চলে স্বাধীন সূর্যের তপস্যা। বিপ্লবীদের সেই ঘরে, রক্তগরম উত্তেজনায়, ধৈর্যে আর তিতিক্ষায় হাতে হাতে তৈরী হয় ছোট ছোট মারণাস্ত্র। বিরুদ্ধ শক্তির জন্য তা হয়তো যথেষ্ট নয়, তবু সীমিত ক্ষমতাকে করায়ত্ত করার সেকি কঠিন প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা সমষ্টিগতভাবে স্বার্থকতা পাবার শুভদিনে সেই ছোট্ট ঘরের এক অসতর্ক দুর্ঘটনার শিকার হ'তে হয়েছিলো সেদিনের এক সংগ্রামী কিশোরকে।

হাসপাতালের শুভ্রতায় জ্ঞান যখন ফিরে পেয়েছিলো, শুনেছিলো দেশ আর পরাধীন নেই, স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক তারা এখন। খুশীতে হাত তালি বাজাবার সাধ হয়েছিলো তার। কিন্তু দুটি হাতে যেন রাজ্যের যন্ত্রণা। হাত তুলতে পারেনি। পরে শুনেছিলো বারুদের আগুনে দুটি হাতই পুড়ে গেছে তার।

আম্মা সেদিন কেঁদেছিলেন অঝোর ধারায়, আব্বাকে তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত হাসতে দেখিনি আর, কিন্তু কিশোর মনের সবটুকু আনন্দে আপ্লুত হ'তে পেরেছিলো সে নিজে। দেশের জন্য শুধু হাত কেন, প্রাণ দিতেও যে কুণ্ঠিত নয়। তার কাছে ঐ ক্ষতি বেদনার ছিলো না সেদিন।

কিন্তু আব্বার বিমর্ষ মুখ, আম্মার অশ্রুর স্বাদ সে পেলো অনেক অনেক পরে। যৌবনের রাজ্যে প্রবেশ করে। সাহানার ভালোবাসা তার আর এক কারণ। একদার দেশপ্রেমিককে ভালোবাসলো অভিজাত ঘরের কুমারী কন্যা সাহানা কায়সার। কিন্তু সে যে অভ্রান্ত ছিলো না প্রমাণ হ'লো বিয়ের রাতটিতেই।

বর-কনেকে বাসরে তুলে দিয়ে পরিজনেরা তখন ফিরে গেছে। ঘরের একটি কোণ টেবিল ল্যাম্পের নীলাভ আলোয় স্বপ্নময় যখন, সাহানা যেন আর্তনাদ করে উঠলো সেই আলোয় হাতহীন রকিবকে তার দিকে এগুতে

দেখে। চোখে আঙ্গুল চাপা দিয়ে সে অস্ফুট আর্তনাদে বল্লো, গড্‌স সেক্ ওখানেই থাকো। আলোটা জ্বালো। সব যেন ভুতুড়ে লাগছে আমার।

রকিব আলো জ্বেলে দিয়েছিলো, তাকিয়েছিলো সাহানার মুখের দিকে।

সাহানা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিলো; রকিবের পৌরুষ দীপ্ত আকর্ষণীয় মুখ, বলিষ্ঠ দেহের দিকে তাকিয়ে ভেঙ্গে পড়েছিলো কান্নায়—তোমাকে সব দিয়েও এমন করে সর্বহারা করলো কে?

জবাব দিতে পারেনি। বুকের মধ্যে কি হচ্ছিলো তারও যেন স্পষ্ট উপলব্ধি ছিলো না তখন। রকিব চুপ করেছিলো। কান্নায় ক্রমশঃ উদ্বেলিতা সাহানার দিকে তাকিয়ে এক সময় সে শুধু উচ্চারণ করতে পেরেছিলো, একটা কথা বলবো সাহানা!

বলো।

আমি বোধ হয় ঠিক করিনি। বন্ধনহীন ভালোবাসা নিয়েই হয়তো আমার সুখী হওয়া উচিত ছিলো।

একটু চুপ করে থেকে রকিব বিষণ্ণ সুরে আবার বল্লো, কিন্তু তা যখন হয়নি তখন যেটুকু ঘটে গেছে সেইটুকু শুধ্‌রে নেবার সুযোগ থেকে তুমি নিজেকে বঞ্চিত করো না।

কিন্তু তুমি?

আমার কথা ভাব্‌লে তোমার চলবে না এ কথা কেন বুঝতে পারছো না সাহানা। অস্ফুট স্বরে, অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে কেটে কেটে উচ্চারণ করতে পেরেছিলো রকিব।

সাহানা ফিরে যাবার পর অনেক দিন আবার নিজের মধ্যে কেন্দ্রিত এবং আবর্তিত ছিলো রকিব। মরহুম আব্বার মধ্যম মানের বিত্তগুলিও হয়তো তার অন্যতম কারণ। এগুলি না থাকলে অফুরন্ত সময় নিয়ে সে কি করতো বলা মুস্কিল। তবু সে এক সময় ক্লান্তি অনুভব করলো। আর যেন সে পারবে না সঙ্গিহীন মনের বাহন হ'তে, এমনও মনে হলো তার। আম্মারা হয়তো অন্তর্যামীর কোনও ক্ষমতা নিয়েই পৃথিবীতে আসেন। নয়তো এই সময়টাতে তিনি আবার বিয়ের কথা বলবেন কেন? মেয়েও তিনি নিজেই পছন্দ করলেন। রাজধানী থেকে অনেক দূরে, করোতোয়া-

পারের এক পল্লী কুমারী পেলো তার মনোনয়নের সৌভাগ্য। এই নির্বাচন রকিবকে খুশী কিংবা নিশ্চিন্ত করলো তা নয়। বরং শিক্ষিতা এবং স্বাধীনচেতা সাহানার কাছে যে প্রত্যাশা ছিল, মঞ্জুরার কাছে সেটুকুও আশা করতে পারেনি। শুধু ভয় নয় অপর পক্ষের বুদ্ধি এবং উপলব্ধির প্রশ্নও ছিলো। তবু মনের সঙ্গে আপোষ না করে সে পারেনি নিজেকে চূড়ান্ত রকমে নিরুপায় ভাবার পর জীবনের কাছে যে আশাটুকু থাকে সে মৃত্যুর। কিন্তু মৃত্যু জীব জগতের সবচেয়ে পরাজিত অধ্যায় বলেই বারবার মনে হয়েছে তার। বেঁচে থাকার এই আশ্বাসের মধ্যে সে আনন্দ পায়নি। লাঞ্ছিত হয়েছে তার দীপ্ত সত্তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তবু ফিরে আসার মনোবল হারিয়েছে। মঞ্জুরা তার সেই অখণ্ড দ্বন্দ্বের দিনের একমাত্র সাক্ষী। সে যে কিছু বুঝতে পারে কিংবা বোঝার মতো গভীরতা রয়েছে তার অষ্টাদশী বয়েস অথবা মফঃস্বলী চেতনায়, রকিব ধরতে পারেনি প্রথমে। ঠিক ঐ বয়েস এবং কলেজের প্রাথমিক শিক্ষা জীবনে যাকে স্বাভাবিক চিন্তার মধ্যে ধরা যায় মঞ্জুরা যেন তার ব্যতিক্রম। মঞ্জুরা নব বধূর নিয়ম ভেঙ্গে শব্দ করে হাসে, যখন তখন অকুণ্ঠিত মুখে উচ্চারণ করে ক্ষিধের কথা, আবার যখন গম্ভীর হয়ে যায় তখনও সে তার বয়সকে অতিক্রম করে। সেই মানুষই আবার ফিরণীতে বাপের বাড়ী এসে সন্ধ্যে রাতেই রকিবের ডানা স্পর্শ করে সহজে বলতে পারে, চলুন আমাদের নদী আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।

রকিব মৃদু হেসে বলেছিলো, নদী আবার কি দেখবো!

থাক্ আর উন্নাসিকতা দেখাতে হবে না। থাকেন তো এক বুড়ী নদীর পারের সহরে। তার না আছে রূপ না আছে যৌবন। আমাদের এই করোতোয়া আর যাই হোক সত্যিকারের বাংলা দেশের নদী। বর্ষায় কুল ছাপিয়ে ওঠে, শীতে শুকিয়ে কাঠ্।

সেই চাঁদনীর সন্ধ্যায় নদী দেখতে এসে রকিবের মনে হয়েছিলো নদী কোথায়, ও যে নদীর কেরিকেচার। এবং তারই কিছুদিন পর নিজের সম্পর্কেও তার ঐ একই কথা মনে হয়েছিলো, মানুষ নয়, সে শুধু মানুষেরই কেরিকেচার একটি। সেদিন—যেদিন মঞ্জুরা তার উপস্থিতি টের

পেয়ে দুটি হাতের মধ্যে দ্রুত লুকিয়ে ফেলেছিলো একটি ছোট্ট ফটোগ্রাফ। মঞ্জুরার মনকে স্বচ্ছ মনে হয়েছিলো, চেতনাকে আণবিক যুগের জটিলতা মুক্ত। সেই চিন্তা তখন তার নিজের কাছে উপহাসের মতো।

মঞ্জুরা বাপের বাড়ী গিয়েছিলো এরপর একটি মাসের জন্য। কিন্তু সে আর অনুপ্রেরণা পায়নি তাকে ফিরিয়ে আনার। একটা নিস্পৃহ মন, নৈর্ব্যক্তিক চেতনা নিয়ে প্রতি মুহূর্তে যেন খণ্ডিত সে। মঞ্জুরা চিঠি লিখেছে, সে জবাব দেয়নি। মঞ্জুরা জানতে চেয়েছে, সে জানায়নি। চরম সেই অশান্তির দিনগুলিতে এক সময় সে উপলব্ধি করেছিলো যে পরিণতি অবশ্যম্ভাবী তাকে পাশ কাটাবার মধ্যে আর যাই থাক সুস্থতা নেই। তার জীবনের যে চরমতম ক্ষতির মধ্যে সে সম্মান চায়নি, করুণারও প্রত্যাশী নয় কারু কাছে। মৃত্যু সম্পর্কে তার ধারণা বদলে গেছে এ সময়। তার মনে হয়েছে একমাত্র মৃত্যুই পারে মানুষের সব সম্মানকে অক্ষুন্ন রাখতে, অবিকৃত রাখতে। তবু যতক্ষণ বন্ধুর মতো হাত না বাড়াচ্ছে ততক্ষণ অসুন্দরের সঙ্গে কোনও আপোষেই আর আসবে না সে। কথাটা তার জানানোর প্রয়োজন মনে হয়েছে। মঞ্জুরাকে কোন খবর না দিয়ে তক্ষুণি রওনা হয়ে পড়েছে তাই।

ঘাটের এপারে এসে ধীরে সুস্থে গাড়িতে উঠেও জায়গা পেয়েছে বসার। গাড়ীটা অর্ধ চন্দ্রাকৃতি গতির মধ্যে এগুচ্ছে এখন। যাত্রীরা গুছিয়ে বসেছে। ঠিক মতো জায়গা পাওয়ার মধ্যে সবাই খুশী। সার ধরা সব সুখী মুখ যেন। সুখী মুখের ডেফিনেশন কি? এই লোকগুলি কিংবা বিয়ের আগের সাহানার মুখ অথবা বিগত দিনের তার কিশোর চেতনা, যে তার দুটি হাত বিসর্জন দেবার মধ্যেও ভেবেছিলো আল্লাহ্ কত করুণাময়। কিন্তু তাই যদি তবে সাময়িক সত্য সামগ্রিক নয় কেন?

সেই ভুল, আবার সে করেছে মঞ্জুরার বেলাতেও। মঞ্জুরা সুখী নয়, মঞ্জুরা শুধু মেনে নিয়েছে সময়কে। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে সে যখন অনেক রাতে মঞ্জুরাদের বাড়ী পৌঁছলো তখন আর একবার সে ধাক্কা খেলো নিজের মধ্যে। মঞ্জুরার বালিশের নীচে সেই ছবিটা। সরাবার সময় পায়নি। কিন্তু উল্টো হ'য়ে থাকা ছবিটা সোজা করবে এই সময়টুকুও

যেন অকল্পিত তখন। আড়ষ্ট হয়ে সে দাঁড়িয়েই রইলো। এবং মঞ্জুরা একটু পর শুতে এসেই চট করে ছবিটা লুকিয়ে ফেল্‌লো ছুটি হাতের মধ্যে—অবিকল সেদিনের মতো।

রকিব গম্ভীর হলো আরও। বল্লো, ওটা আমি দেখবো।

না।

দেখতেই হবে আমায়।

আমি তাহলে পালিয়ে যাবো ঘর থেকে।

তবু আমি দেখবো।

রকিব এগিয়ে এলো। একটা হাত বাড়াতে গিয়ে পরমুহূর্তে দাঁড়িয়ে গেল স্থির হ'য়ে। মঞ্জুরা ওর বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে দ্রুত স'রে এলো। রকিবের চোখের ওপর ছবিটা মেলে ধ'রে আস্তে আস্তে বল্লো, আপনি যেন কি, শুধু শুধু আমায় লজ্জায় ফেলতে চান।

ততক্ষণে ছুটি চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে নিঃশ্বাস দ্রুত বইছে রকিবের। প্রায় বিবর্ণ তবু চেনা যায় ছবির সেদিনের কিশোরকে, যে একদিন পূর্ণাঙ্গ ছিলো। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লো। মঞ্জুরা এগিয়ে এলো আরও কাছে—রাগ করলেন?

ক্লান্ত স্বর রকিবের—কেন?

আমার এই বেহায়াপনা দেখে?

তুমি আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছ, ফিরিয়ে দিয়েছ আমাকে আমার বিশ্বাসের কাছে।

কি করে?

কোনদিন তুমি তা জানতে চেয়ো না মঞ্জুরা।

আমি বুঝতে পারি কিছু কিছু।

মঞ্জুরা রকিবের চোখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট স্বরে বল্লো, একটা দুর্ঘটনার জন্য একটি মহৎ চেতনা আর মানুষকে অস্বীকার করবো আমাকে এত ছোট কি করে ভাবলেন বলুন তো!

রকিব আবেগ রুদ্ধস্বরে শুধু উচ্চারণ করতে পারলো স্ত্রীর নামটি।

ভারী এই পরিস্থিতিকে হাল্কা করে নেবার জন্যই যেন মঞ্জুরার গম্ভীর মুখ এ সময় ভরে এলো আবার ছেলেমানুষী হাসিতে। দুষ্টু ছুটি চোখের পাতা—আবার বুঝি রাগ করবেন?

সত্যি এবার রাগ করবো, যদি আবার তুমি এই আপনি আপনি করো।

রকিব হাসলো। তার মনে হলো বহু যুগ যুগান্তের পর।

# বাসনার সৈকতে

আনিসুর রহমান

বাড়ীটা খুঁজে বের করতে খুব বেশী বেগ পেতে হল না আনসারকে। সামনে মাকড়সার জালঅলা লোহার গেট; গেটের দুই পাল্লাতে সরু লোহার শিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওয়েল্ডিং করে এমনভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে যেন মনে হয়, মাঝখানে একটি করে মাকড়সা তার চারপাশে জাল বুনে নিশ্চুপ বসে আছে।

গেট ঠেলে ভিতরের দিকে এগিয়ে চলল আনসার। দেখল, জানালার ফ্রেমগুলিতেও ওই একই ধরণের জাল সমেত মাকড়সা আটকান আছে। ছোটখাট একতলা ছিমছাম বাড়ীটি। সামনে ফুলের বাগান। হরেক রকমের ফুল ফুটে আছে সেখানে। মনে মনে লতিকার প্রশংসা না করে পারল না সে।

বারান্দায় উঠে দরজা সংলগ্ন কলিং বেল টিপল আনসার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লতিকা বেরিয়ে এসে ওর মুখের দিকে হা করে চেয়ে রইল!

চিনতে পারেনি তাকে লতিকা। না চিনবারই কথা। এতদিন পর আজ হঠাৎ দেখা হলে চিনতে পারবে কেন? প্রায় চার বছর আগে শেষবার দেখেছিল সে আনসারকে। তখন ওরা দুজনে এক সঙ্গে…

আপনি? কে আনসার নাকি? প্রায় চিনে উঠেও লতিকার মনের সংশয় কাটে না, তাই প্রশ্ন করে।

চিনতে পেরেছ তাহলে। হাসি হাসি মুখ করে আনসার তাকে বলল।

এস এস, ঘরের ভেতরে এস। কি সৌভাগ্য আমার। বলে একহাতে দরজার পর্দাটা সরিয়ে ধরে লতিকা। আনসারকে চিনতে পেরে, এতদিন পর আবার তাকে দেখতে পেয়ে লতিকা যেন খুশীতে ফেটে পড়ে। ওর মনের আবেগ, উচ্ছল চঞ্চলতা আনসারকে ঘিরে এই মুহূর্তে যেন শতগুণ বেড়ে যায়।

আনসার বসবার ঘরে ঢুকতেই এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে লতিকাকে উদ্দেশ্য করে বলল—আজ আমি তাহলে চলি মিস লতিকা। আর একদিন আবার সময় করে আসব।

লতিকা ভদ্রলোককে জানিয়ে দিল···না, না, আপনাকে আর আসতে হবে না। যদি ভাল মনে করি, আমি নিজেই আপনার সঙ্গে দেখা করব।

ভদ্রলোক আর কিছু না বলে আনসারের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে গটগট করে চলে যেতেই আনসার জিজ্ঞেস করল—কে ও ভদ্রলোক লতিকা ?

লতিকা বলল—আর বোল না। ক'দিন থেকে পেছনে লেগেছে সিনেমায় নায়িকার রোল অফার করার জন্য। আজ একেবারে বিদেয় করে দিলাম।

আনসার ভাবল লতিকার যে সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি রোমান্টিক চেহারা, সুগঠিত শরীর, তাতে ওকে সিনেমার নায়িকার বেশেই মানায় ভাল।

চার বছর আগের কথা মনে পড়ল, যখন লতিকার সঙ্গে সে বেশ কয়েকটি নাটকে অভিনয় করেছিল। অভিনয়ের কলা-কৌশলে লতিকাকে বারবার নিষ্প্রভ করে দিত সে। লতিকা অবশ্য তার আগেই অভিনেত্রী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিল। তবু দর্শকদের সকলে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা করত আনসারের অভিনয়-নৈপুণ্যের। আর তার স্বীকৃতি স্বরূপ অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি শেষ রজনীতে জুটত আনসারের ভাগ্যে। লতিকার তখন খুব ঈর্ষা হোত। অক্ষমতার লজ্জায় অবরুদ্ধ কান্না বুঝি তখন তার বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইত। কিন্তু কাঁদতে পারত না লতিকা।

তারপর একটু একটু করে মনের অনেক কাছাকাছি এগিয়ে এসেছিল তারা দুজনে। তখন আর আনসারের সু-অভিনয়ের জন্য লতিকার মনে কোন ঈর্ষা জাগত না। বরং ভাল লাগত তার প্রশংসা করতে, এবং প্রশংসা করতে গেলে উল্টে আনসারই তখন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠত।

তারপর বছর চারেক আগে আনসারকে ইংলণ্ডে চলে যেতে হয়েছিল

উচ্চশিক্ষার জন্য। ভেবেছিল ওখানেই থেকে যাবে। দেশে আর ফিরে আসবে না। কিন্তু আসতেই হল তাকে। মনের সিদ্ধান্ত যে জীবনের কতক্ষেত্রে অবস্থার চাপে পড়ে পালটাতে হয়, আনসার যেন তা বুঝেছে।

পুরোন ভাবনা ছেড়ে আবার লতিকাকে চেয়ে দেখল আনসার। দেখল, আগের থেকে দেখতে আরো সুন্দর হয়েছে লতিকা। আগে একটু লম্বা-পাতলা গড়নের ছিল। এখন আর লম্বা বলে মনে হয় না। পঁচিশটি বসন্ত লতিকাকে যেন কী এক স্নিগ্ধ সুষমায় বিকশিত করে রেখেছে।

লতিকাও তার দিকে চেয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসি ছড়াচ্ছে। ওর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সামনের কয়েকটি দাঁতের অংশ। উজ্জ্বল সুগঠিত দাঁত থেকেই যেন আলো ঝকমক করছে, আর সেই আলোর রেশ এসে লাগছে তার হাসিতে।

আনসার বলল—ফিরে এসে শুনলাম, তুমি নাকি মঞ্চে অভিনয় করে খুব নাম কিনেছ। তোমার অভিনয়ের কথা শুনলেই দর্শকদের ভিড় আর হর্ষধ্বনি যেন বেড়ে যায়। সে ক্ষেত্রে সিনেমার এমন একটা সুযোগ কি হাতছাড়া করা ভাল হল?

লতিকা একটা দীর্ঘশ্বাসকে টুকরো টুকরো করতে করতে বলল—এতদিন তো শুধু অভিনয়ই করে এলাম। আর বেশী ঝামেলা ভাল লাগে না।

আনসার বলল—হঠাৎ এ বিরাগের কারণ?

লতিকা বলল—হঠাৎ না। তবে ওসব তোমার শুনে কাজ নেই। তার চেয়ে তোমার কথা বল। কবে এলে ইংল্যাণ্ড থেকে?

—এই তো গত মঙ্গলবারে।

—শুনেছিলাম তুমি নাকি আর ফিরে আসবে না?

—প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু কত সময় কত কারণে আমাদের মত পাল্টাতে হয়। শেষের দিকে আর মোটেই ভাল লাগছিল না।

ইংল্যাণ্ড যাওয়ার পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আনসার সকলকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, সে আর দেশে ফিরবে না। একমাত্র পথ-চেয়ে-থাকা বুড়ী মাকেও সে মনের কথাটা লিখে দিয়েছিল। সেই থেকে মা

প্রতি চিঠিতে তাকে ফিরে আসার তাগিদ দিয়ে ব্যস্ত করে তুলেছিলেন। কিন্তু সে তা মোটেই গ্রাহ্য করেনি। উচ্চশিক্ষা শেষ করার পর একটা ভাল চাকরী নিয়ে সেখানেই থেকে গিয়েছিল।

তখন মনে করেছিল আনসার, জীবনকে উপভোগ করতে হলে, জীবনে বড় হতে হলে তাকে এখানেই থাকতে হবে। সম্ভাবনার সব দ্বার এখানে খোলা। আর এখানকার আশ্চর্যসুন্দর উচ্ছল যৌবনা মেয়েগুলি কি সহজ-স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে মেশে। যেন জীবনের এক একটি অফুরন্ত ভাণ্ডার যৌবনের সিংহদ্বারে এসে দুনিয়াটাকে একটি আনন্দের মুঠোর মধ্যে ফেলেছে।

সংশয়ান্বিত স্বরে লতিকা জানতে চাইল—কিন্তু ভাল না লাগার পেছনে কোন কারণ তো নিশ্চয় আছে?

আনসার এবার নির্দ্বিধায় বলল—অভিনয়, সব অভিনয়। নিছক অভিনয় ছাড়া শেষের দিকে আর কিছু চোখেই পড়ত না আমার।

লতিকা অবাক হয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করল—মানে? অভিনয় বলতে কী বলতে চাইছ তুমি?

লতিকা হয়ত সন্দেহ করছে, তার অভিনয় সম্বন্ধে বুঝি সে কোন কটাক্ষ করতে চাইছে। কিন্তু অভিনয় করে যে শেষ পর্যন্ত তাকেই বাধ্য হয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে, সে কথা সে কেমন করে বলবে লতিকাকে? লিজার কাছ থেকে মার্গারেট, মার্গারেটের কাছ থেকে ডোরা, সকলের কাছেই তাকে অভিনয় করে করে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। বার বার বাসার ঠিকানা বদল করতে হয়েছে তাকে সবার অলক্ষ্যে। সময় বুঝে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছে। কিন্তু বড় বিপদে পড়েছিল সে ডোরাকে নিয়ে। কথা প্রসঙ্গে একদিন আনসার যখন তার মায়ের চিঠির উল্লেখ করে বলেছিল, মা দেশে ফিরে যাবার জন্য বারবার ভীষণ তাগাদা দিচ্ছেন, তখন থেকেই যেন ডোরা তার সঙ্গে এখানে আসার জন্য পায়ে পায়ে লেগে ছিল। ডোরার মনে সেই থেকে ধারণা হয়েছিল, হয়ত তাকে ফেলেই আনসার দেশে ফিরে যাবে। তাই তাকে ফেলে একরকম তাড়াহুড়া করেই পালিয়ে আসতে হয়েছে। আর বাসা বদল করে লুকিয়ে থাকার সাহস হয়নি।

কিন্তু এখানে লতিকার সঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে আর ধরা পড়ার ভয় নেই। তাই সে বেশ স্বচ্ছন্দে বলল—ঘরে বাইরে সবখানেই যেন অভিনয় চলছে সেখানে। নিজের ব্যক্তিগত জীবনও অভিনয়ের ভারে তাই ভারাক্রান্ত। হাসি-কান্না, আনন্দ-উপভোগ সব যেন কৃত্রিম, মেকী জৌলুসের অভিনয়ে ভরা। সবাই জেনে-শুনে তার মাঝে হুটোপুটি খাচ্ছে, আর ঈর্ষা-বিদ্বেষের পারাবারে সাঁতার কেটে কেটে ডুবছে।

—তাহলে তোমার চোখ ফুটেছিল শেষ পর্যন্ত।

—হ্যাঁ। অনেকদিন না থাকলে প্রথমদিকে ধরা পড়ে না ও-সব। শেষে আস্তে আস্তে সব বোঝা যায়।

—ইচ্ছে করলে তুমিও তো মহা আনন্দে সাঁতার কাটতে পারতে সেখানে।

—তা পারলাম না বলেই তো ফিরে আসতে হল। আমার মত কাক কয়েকটা ময়ূরপুচ্ছ গুঁজে কি আর ওদের দলে ঠাঁই পায়?

লতিকা বলল—কিন্তু অভিনয়ই যে আজকাল আমাদের জীবনের প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে কথা তা অস্বীকার করা যায় না। কত সহজে আমরা মনের কথা ঢেকে রেখে প্রসাধিত মুখের জৌলুস নিয়ে চলাফেরা করি।

আনসার হেসে ওর সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল—তা ঠিক। কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অভিনয়ের কবলে ছেড়ে দিলেই আমরা হারিয়ে যাই।

—তবু সেই অভিনয়কে ঘিরেই তো আমাদের জীবন এগিয়ে চলেছে।

—আসল কথা কি জানো, আমাদের মনে সত্যিকারের যে নীতির পথের ইশারা থাকে, সেই দুরূহ পথে চলতে অনেক কষ্ট, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তাই সে বন্ধুর পথ ছেড়ে আমরা এমনি অভিনয়ের আরাম-আয়েসে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে শিখি।

কোন কাজ না থাকলেও অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে, এই অজুহাত দেখিয়ে সেদিনের মত উঠে পড়ল আনসার।

লতিকা জিজ্ঞেস করল—আবার কবে আসছ?

আনসার হেসে বলল—রোজ একবার করে।

ওর কথা শুনে লতিকাও হেসে উঠল। আনসার দেখল হাসির সঙ্গে সঙ্গে ওর সুগঠিত দাঁতের ঝকমকে নরম আলোও যেন ছড়িয়ে পড়ছে।

পর পর ক'দিন আসার পরে আজ চার-পাঁচদিন থেকে আনসারের আর কোন পাত্তা নেই। কেন আসেনা কিছুই বুঝতে পারে না লতিকা।

লতিকা মনে করে দেখল, এমন কোন কথা বা মনান্তর তার সঙ্গে এ পর্যন্ত হয়নি যেজন্য আনসার এখানে আসা বন্ধ করতে পারে।

শেষ যে দিন আনসার এসেছিল সেদিন কথা প্রসঙ্গে সে লতিকাকে বলেছিল—আমি তো এই ভেবে অবাক হই যে, আজ পর্যন্ত তোমার জীবনে তেমন কোন পুরুষের আবির্ভাব ঘটেনি।

এ কথার আর কি জবাব দেবে লতিকা? কত পুরুষ যে তার জীবনে এরই মধ্যে এসে ফিরে গেল তার কি বলবে সে? কিন্তু পুরুষ কোথায়? সকলেই আসে তার অভিনয় জীবনের প্রশংসার গুঞ্জরণ তুলতে। লতিকার সুনাম যেন তাদের মুখে ধরে না। কারও মধ্যে কোন স্বকীয়তা নেই, নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নেই, পুরুষত্বের কোন গৌরব নেই। কিন্তু সবার মুখেই প্রশংসার ললিত বাণী, চোখে কামনার বহ্নিজ্বালা, মনের থর থর আবেগে তার রূপযৌবনের করুণা প্রার্থনা। চোখের দৃষ্টি যেন উচ্ছ্বাসবিগলিত ধারার অন্তরালে শ্বাপদের লোলুপতায় তার রূপ-লাবণ্যগ্রাসের মুখাপেক্ষী।

কবে ছাত্রী-জীবনে প্রশংসা আর আত্ম-প্রচারের গৌরবে শৌখিন মঞ্চশিল্পী হয়ে নেমেছিল সে। তারপর থেকে তো সে একটানা অভিনয়ই করে আসছে। সম্মান প্রশংসা গৌরব সবই পেয়েছে সে, সেই সঙ্গে অর্থও। সবাই আজ তার অভিনয় দেখার জন্য ভিড় করে নাট্যমঞ্চে। কিন্তু এখন যেন সত্যিই আর ভাল লাগে না লতিকার। সব একঘেয়েমিতে ভরা। স্তাবকগুলো পর্যায়ক্রমে একই কথার ঢেউ তুলে পেছনে পেছনে হ্যাংলার মত লেগে থাকে। তারপর লতিকার কাছ থেকে একদিন নির্মম ব্যঙ্গের কষাঘাত খেয়ে সরে পড়ে। হাসি পায় লতিকার, তার করুণা প্রার্থী এই সব পুরুষ-পুঙ্গবদের দুর্দশা দেখে।

লতিকা তাই আনসারের সে কথার জবাবে বলেছিল—আজকালকার

পুরুষদের পৌরুষ দেখে হাসি পায়। তাদের যত শৌর্য-বীর্য সব শুধু মেয়েদের পেছন পেছন ঘুরে বেড়ান পর্যন্ত।

আনসার এ কথায় আহত হয়েছিল বলে মনে হয়নি। কেন না পরক্ষণেই হেসে আনসার তাকে জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার অভিনয়ের চোখ দিয়ে তাদের যাচাই করনি তো আবার ?

জবাবে লতিকা বলেছিল—তারাই তো এসেছিল আমার সঙ্গে অভিনয় করতে। অফুরন্ত ভালবাসার অভিনয়। আমার খাঁটি অভিনয় দৃষ্টি ছিল বলেই তো তাদের চিনতে কষ্ট হয়নি।

আনসার ঠাট্টা করে বলেছিল—আহা বেচারারা ! তারা কেউ তাহলে তোমার জালবিছান চোখের দৃষ্টি থেকে রেহাই পায়নি।

এ কথার উত্তরে আনসারকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে লতিকা বলেছিল—কেউ যদি স্বেচ্ছায় জালে এসে জড়ায় তো কি করব বল ? তাদের ভাগ্যে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

আনসার রহস্য করে বলেছিল—প্রেমের ফাঁদ পাতা যে ভুবনে ভুবনে। আনসারের সঙ্গে লতিকাও খিল খিল করে হেসে উঠেছিল তখন।

কিন্তু আনসার এই ক'দিন এল না কেন কিছুই বুঝতে পারেনা লতিকা। এমনি করে কেউ তো কোনদিন তাকে উপেক্ষা করে চলে যায়নি ? সবাই এতদিন তার সঙ্গে দেখা করার জন্য, তার মুখের কথা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। আর আনসার কিনা -

না, এসব কি ভাবছে সে ? আনসার তাকে অবহেলা করতেই পারে না। হয় কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে আছে সে, না হয় কোন অসুখ বিসুখ হয়েছে হয়ত।

ধানমণ্ডীর এক বন্ধুর বাড়ীতে এসে উঠেছে আনসার। বন্ধু মানে জাফর। যে বেশ কিছুদিন লতিকার পেছনে পেছনে ঘুর ঘুর করে বেড়িয়েছিল এক সময়। ঠিকানাটা আনসারই তাকে কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছিল।

আনসারের জন্য নির্দিষ্ট ঘরের দিকে গিয়ে তাকে ডাকতেই একটু পরে দরজা খুলে বেরিয়ে এল আনসার। হাতে কি যেন একটি ক্যামেরা।

লতিকাকে দেখে একটুও আশ্চর্য হল না সে। হেসে বলল—এস। এই ক'দিন যেতে পারিনি বলে কিছু মনে করনি তো ?

লতিকা আন্তরিকতার সুরে বলল—না, মানে চার—পাঁচদিন তোমাকে না দেখে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম আর কি। তাই থাকতে না পেরে আজ চলে এলাম।

লতিকার কথা শুনে আনসারের গোঁফের নীচে একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা দেখা দিয়েই যেন মিলিয়ে গেল।

খুশী খুশী গলায় সে লতিকাকে বলল—এস, ভেতরে এস। তোমাদের ওখানে মন খুলে যে দুটো কথা বলব, তারও তো উপায় নেই। কেউ না কেউ এসেই পড়ে।

লতিকা ঘরে ঢুকে একবার চারিদিকে দেখে নিয়ে আনসারের দিকে কটাক্ষ হেনে বলল—কে আর আসে। মাঝে মাঝে খেয়ালীটা এসে হয়ত জ্বালাতন করে। আর না হয় কোন সময় চা নিয়ে আসে চাকরটা।

খেয়ালীর কথা বলতে গিয়ে লতিকার মনটা ঠিক এই সময় কেমন জানি এক অবোধ ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। ওর ছোট বোন আইভীর মেয়ে খেয়ালী। তিন বছরের খেয়ালীকে রোজ আইভীর বাসা থেকে আনিয়ে নিয়ে সে মনের মত করে সাজায়, তার সঙ্গে খেলা করে, কোলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে,—আর ওর মনটা মাঝে মাঝে কোথায় যেন কোন বেখেয়ালী বলাকার মত চিন্তার পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে কোন দিগন্তের নিঃসীম শূন্যে হারিয়ে যায়।

আনসার বলল—তবু আজ এই ঘরের একান্ত নিভৃতে তোমাকে যেন আমার অনেক কাছে পেয়েছি বলে মনে হয়।

আনসারের পাশে কাছ ঘেঁসে বসেছে লতিকা। হয়ত ইচ্ছে করেই। সেন্ট মাখান শাড়ী ও চুলের গন্ধ ওর নাকে গিয়ে লাগছে। সমস্ত ঘরখানাই যেন আজ লতিকার গন্ধে সুরভিত হয়ে উঠেছে।

সহসা লতিকার বাঁ হাতখানা টেনে নিয়ে আনসার জিজ্ঞেস করল—তোমার কোন রাশি ?

—বৃশ্চিক। কেন তুমি হাত দেখতে জান নাকি ?

—না এমনই। আমারটা ধনু রাশি কিনা। তাই জিজ্ঞেস করলাম।

পাশে রাখা ক্যামেরাটার দিকে এতক্ষণে যেন নজর পড়ল লতিকার। শুধোল—ক্যামেরা নিয়ে কি করছিলে একা ঘরের মধ্যে ?

আনসার ক্যামেরাটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে সামনের আলমারীটার মাথায় রেখে দিতে দিতে বলল—কয়েকটা নিগেটিভ্ রোল ডেভেলপ্ করছিলাম।

ফিরে এসে আবার লতিকার পাশেই বসে পড়ল আনসার। আগের মত লতিকার হাতে হাত বুলোতে লাগল।

লতিকা ওর চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল—ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসার পর তোমার কাছে কি আমার দাম কমে গিয়েছে ?

আনসার একটু হেসে লতিকার মুখখানিকে নিজের মুখের কাছে টেনে এনে বলল—না, কমবে কেন।

লতিকা অনুযোগ করে বলল—তাহলে রোজ দেখা হবে কথা দাও।

আনসার মাথা নেড়ে বলল—তাই হবে। তারপর লতিকাকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ফেলতে চাইল সে।

লতিকা সচকিত হয়ে আনসারের বাহুদ্বয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বলল—আজ চলি। কাল যেও কিন্তু।

আনসার মৃদু হাসির রেখা টেনে জবাব দিল—আচ্ছা।

কিন্তু আনসার শুধু লতিকার কাছে এসেই তৃপ্ত নয়। আরো কাছে পেতে চায় সে লতিকাকে। বুকের রক্ত যেখানে বারবার উপচে উঠে ঝলসে যায়, সেই অতৃপ্ত দহনের মর্ম-জ্বালায় পেতে চায় সে আরো নিবিড় করে তাকে।

লতিকাও বুঝতে পারছিল আনসারের মন জুড়ে এখন তোলপাড় চলছে কিন্তু এতখানি যে হতে পারে তা বুঝতে পারেনি লতিকা।

সেদিন আনসারের একটি ইচ্ছাকে তারই ঘরে বসে প্রশ্রয় দিয়েছিল লতিকা। ফিরিয়ে দেয়নি সে আনসারকে। মনের ভালবাসায় প্রেমের একটি নতুন কুঁড়ির জন্ম নিয়েছিল সেদিন তার থরথর ঠোঁট দুটির মাঝে এক স্বপ্নময় মধুর স্পর্শে। আনসারকে সে ভালবাসে। তাই লতিকা

সেদিন দেখতে পেয়েছিল, আনসারের চোখে ভালবাসার এক স্বচ্ছ সরোবরকে টলমল করতে।

আর আজ? আজকের আনসার যেন ভিন্ন মানুষ। কামনার আগুন যেন আজ ওর চোখে দাউ দাউ করে জ্বলছে। যেমন জ্বলতে দেখেছে সে আর সব কামনার্ত পুরুষদের চোখে; তাদের চেয়েও অনেকগুণ বেশী হয়ে জ্বলছে আনসারের চোখ। আজ এতদিন পর তা ধরা পড়ল।

একটু আগেই আনসারের নির্লজ্জ ব্যবহারে ঘৃণায় ভরে উঠেছিল লতিকার মন। বসবার ঘরে তাকে জাপটে ধরে একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়েছিল আনসার। হঠাৎ যে এমন হবে তা ভাবতেই পারেনি লতিকা। বুঝে উঠে, সেই অবস্থা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল যখন সে, তখন ঘৃণায় আনসারের দিকে তাকাতে ইচ্ছা করছিল না লতিকার।

তবু নিজেকে সামলে চাপা ক্রোধের স্বরে সে আনসারকে বলল—তুমি যে আর দশজনের চেয়েও নীচ, তা ভাবতে পারিনি। ভাল মনেই তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম। তোমাদের সবাইকে আমি ঘৃণা করি।

আনসার সহজভাবেই বলল—কী বলছ তুমি লতা? তোমার মাথা খারাপ হয়নি তো?

ওর কথায় আরো রেগে উঠে লতিকা বলল—ভেবেছিলে তোমার ভণ্ডামী বুঝি ধরতে পারব না। ইংল্যাণ্ড থেকে ডিগ্রী নিয়ে এলে কী হবে, এদিক দিয়ে তোমাদের সবার চেহারাই এক।

—কিন্তু আমার কি মনে হয় জান? আসলে তোমার চোখ আর মনেই যত কুৎসিত সন্দেহের ছায়া। অভিনয় করে করে নিজেকেই তুমি বিশ্বাস করতে পার না।

আনসারের মুখ থেকে এ ধরণের কথা শুনে রাগে দিশেহারা হয়ে পড়ল লতিকা। বলল—লজ্জা করে না তোমার নিজের দোষ আর একজনের উপর চাপাতে? ন্যাকামী করে আর সাধু সাজার জায়গা পাওনা? চলে যাও তুমি এখান থেকে।

এমন কঠিন অপমানের পরও আনসারের সোফা ছেড়ে ওঠার কোন

লক্ষণই দেখা গেল না। শান্ত গলাতে সে শুধু লতিকাকে জিজ্ঞেস করল—আজ পর্যন্ত কতজনকে তুমি এভাবে বিদেয় করেছ বল তো?

লতিকা এই কথার পর আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বলল—সে কৈফিয়ত আমি তোমাকে দিতে বাধ্য নই। তবে শুনে রাখ, তোমার মত সব লোলুপদের আমি প্রতিবারই নোংরার মত ঝেঁটিয়ে বের করে দিয়েছি।

আনসার আবার সহজ ভাবেই বলল—কিন্তু আমি তো বের হতে আসিনি।

আনসারের কথার পুনরাবৃত্তি করে টেনে টেনে বিলম্বিত সুরে লতিকা বলল—বের হতে আসিনি। ভাল চাইলে এখনি চিরদিনের মত দূর হয়ে যাও। নইলে আমাকেই সে ব্যবস্থা করতে হবে।

বাসায় মনে হয় আজ কেউ নেই। কিম্বা এখনো হয়ত শুনতে পায়নি কেউ লতিকার গলা।

আনসার হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল—আমার কাছে একটা ইনটারেষ্টিং ফটো আছে। দেখবে নাকি?

লতিকা ঝাঁঝাল গলায় বলল—তোমার কোন কথাই শুনতে চাই না আমি। তুমি যাবে কিনা বল?

আনসার নিরুত্তাপ কণ্ঠে জবাব দিল—কিন্তু সে ফটো দেখলে তুমি নিজের আর এক রূপ দেখতে পাবে।

লতিকা একটু চমকে উঠে বলল—কক্ষনো না। আমার কোন ছবি তোমার কাছে থাকতে পারে না। মিথ্যে আমাকে ভয় দেখাতে এস না।

একটু বাঁকা হেসে আনসার বলল—এবং তোমার সে ফটোর পাশে আছি আমি।

শুনেই পলকের মধ্যে চমকে উঠল লতিকা। সহসা তার মনে পড়ে গেল আনসারের ঘরে গিয়ে সেদিন সে ক্যামেরা দেখেছিল। আনসার তার কাছে বসে কথা বলতে বলতে এক সময় উঠে গিয়ে ক্যামেরাটা সামনের আলমারীর উপর রেখে এসেছিল।

আনসার আবার বলল—সেদিন সেই বিশেষ ভঙ্গীতে দুহাত দিয়ে যখন জড়িয়ে ধরেছিলে আমাকে, মুখের কাছে মুখ এনে, তখন আমার অটোমেটিক

ক্যামরাতে ঠিক সেই মুহূর্তটিই ধরা পড়েছিল। তোমার অভিনয় দক্ষতার এক বিরল স্বাক্ষর।

নাকের কাছে কার্বলিক এসিডের গন্ধ পেলে সাপ যেমন তার উদ্ধত ফণা নিমেষে নামিয়ে নেয়, লতিকার গর্বোদ্ধত মুখখানি তেমনি নীচের দিকে নেমে গেল। তার সারা মুখে কে যেন মুঠো মুঠো ছাই মাখিয়ে দিয়েছে, এমনি বিবর্ণ ফ্যাকাশে সে মুখ।

লতিকা বুঝতে পারল, সেদিনের সেই নতুন একটি কুঁড়ির মৃত্যুই হয়নি শুধু, তা পচে এখন বিকৃত বীভৎসও হয়ে উঠেছে।

তবু সঙ্গে সঙ্গে লতিকার গলার স্বর পাল্টে গেল। বলল—আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ হারাতে পারেনি। এই প্রথম তোমার কাছে আমি হারলাম।

আনসার তার কণ্ঠ-স্বরের আর্দ্রতা লক্ষ্য করে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল—না না, তুমি হারবে কেন।

লতিকা আকুতি মাখান কণ্ঠে বলল—আমাকে তুমি ক্ষমা কর আনসার। নিজের বৈশিষ্ট্যে, ব্যক্তিত্বে তুমি উজ্জ্বল। আর মিছে লজ্জা দিও না আমাকে। আজ হতে আমি তোমার।

আনসার বলল—এ সব কী বলছ তুমি? আমার তো আগামী কালই দেশে যাবার কথা। মা পাত্রী ঠিক করে রেখেছেন, তাই তো ইংল্যাণ্ড থেকে আমার ফিরে আসা। এই কথা বলব বলেই তো তোমার কাছে এসেছিলাম এখন। কিন্তু বলার আর সুযোগ দিলে কোথায়?

লতিকা যেন মুহূর্তের মধ্যে বোবা হয়ে গেছে। আনসারের মুখ থেকে আজ এই কথা শুনে নিশ্চল পাথরের মত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

আনসার বলে চলল—লণ্ডনের শ্বাসরুদ্ধকর আবহাওয়ার মধ্যে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। দম বন্ধ হয়ে আসছিল কৃত্রিম জীবনযাত্রার প্রবাহে। সব জায়গায় অভিনয় করে বেঁচে থাকতে থাকতে জীবনটাও যেন অভিনয়ের সামগ্রী হয়ে উঠছিল।

লতিকা এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়েই রইল। আর আনসার তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে থাকল—তাই মা দেশে পাত্রী ঠিক করে যখন চিঠি

দিলেন তখন আর সেখানে থাকতে ভাল লাগল না। মনস্থির করে ফিরে এলাম এখানে।

লতিকা এতগুলো কথার কোন উত্তরই দিতে পারল না। এমন কি আনসার সোফা ছেড়ে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল তখনো সে হতভম্বের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

কতক্ষণ এমনিভাবে দাঁড়িয়েছিল বলতে পারে না সে। যখন সম্বিত ফিরে পেল তখনি বুঝতে পারল লতিকা এর আগে শুধু মঞ্চের অভিনয়েই আনসার তাকে হারিয়ে দেয়নি, এবার জীবনের অভিনয়েও তাকে হারিয়ে দিয়ে গেল।

দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে ফিরে এল লতিকা। অবশ দেহটা কোন রকমে সোফায় এলিয়ে দিল। এই মুহূর্তে কী এক যন্ত্রণা যেম তার মনের দিগন্তকে ধূসরতায় একটু একটু করে ঢেকে দিচ্ছে, আর সেখান থেকে উঠে আসছে বিষাক্ত শূন্যতার ধোঁয়া। ক্লান্তিকর জীবন যেন এক সীমাহীন বিষন্নতায় বিধ্বস্ত।

আনসার চলে গেছে। আর কোনদিন সে ফিরে আসবে না। তবু লতিকার মন যেন বলে উঠল--হোক সে ভণ্ড, প্রতারক, তবু সে ফিরে আসুক। সে ফিরে এলেই যেন ভাল হয়।

# বুড়িগঙ্গা

মীর আবুল হোসেন

বুড়িগঙ্গারও তখন যৌবন ছিল। প্রথম আষাঢ়েই ফুলে ফেঁপে উঠত। নবাবের আস্তাবলে অশান্ত ঘোড়াগুলো সারারাত পা ছুড়ত। ফজর আলী এসেছিল সেই সময়।

আঠারো বছরের যুবক। কালো চিক্কন চেহারা। মাথার চুল কদম-ছাট।

দু'চোখে বিস্ময়, যা দেখে অবাক হয়। সে বিস্ময়ের কাছে পলাতকের আতংকও হার মেনেছিল। বাড়ী থেকে পালিয়েছিল ফজর আলী। সমবয়সী জুল্‌মত তাকে শহরের গল্প শুনিয়ে খেপিয়ে তুলেছে। সেই প্রলোভনে ফজর আলী পালিয়ে এল, আর কোনদিন ফিরে গেল না।

জুল্‌মতই তাকে কাজে লাগিয়ে দেয়। মাল তোলা-নামানোর কাজ।

কর্মঠ যুবক ফজর আলী দু'মণী আড়াইমণী বস্তা অবহেলায় পিঠে তুলে নেয়, দড়াম করে ফেলে পাটাতনের ওপর, হাজারমণী নৌকাও কেঁপে কেঁপে ওঠে।

চাষীর ছেলে ফজর আলী মাঠের কাজে অভ্যস্ত ছিল। প্রথম প্রথম খারাপ লেগেছিল খুব।

—শ্যাষে কি কুলি অইলাম।

তারপর দিনে দিনে রূপসী নগরী ফজর আলীর চোখের সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করল। ফজর আলীর মনের গ্লানিও মুছে গেল।

সে পথও জুল্‌মতই দেখিয়েছিল।

—দোস্ত চল্, তোকে এক জায়গায় লইয়া যামুনে।

—কোনে।

ফজর আলী জানতে চেয়েছিল।

—এখন কমু না। গেলেই দেখতে পাবি। হুর-পরীরে—একদম হুর-পরী। নাচে গানে সমান।

আঠারো বছরের যুবাপুরুষ ফজর আলীর রক্তে কিসের বাজ্‌না বেজে উঠল।

রাতের প্রথম প্রহরেই জুলমতের সাথী হল সে। একটা ভয়, আতংক—অজানাকে জানবার দুর্বার আকাঙ্খা ফজর আলীর সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

অপ্রশস্ত গলি, এই আলো এই অন্ধকার। একটি বাড়ীর দরজায় জুল্‌মত থামল।

—আয়।

বুড়িগঙ্গার এত কাছে এমন একটি বিচিত্র জগৎ আছে ফজর আলী জানত না। দিনের বেলায় এই স্বপ্নপুরীকে বুঝি খুঁজেই পাওয়া যাবে না। বিস্মিত ফজর আলী দোরগোড়াতে দাঁড়িয়ে পড়ল, জুল্‌মত আবার তাড়া দিল—আয় না।

ভেতরে পা দিয়ে ফজর আলী একদম বোবা।

-আহেন না মিয়া এত ডর কিসের?

হুর-পরীদেরই একজন ফজর আলীকে টেনে ঘরে তুলল। তারই জিম্মায় জুল্‌মত ওকে ছেড়ে দিয়ে কখন কোন দরজা দিয়ে অন্তর্হিত হল ফজর আলী ঠাহর করতে পারল না। পরিপাটি বিছানা, নানা আসবাব ফজর আলীর অনভ্যস্ত চোখকে ধাঁধিয়ে দিয়েছিল বুঝি। আড়ষ্ঠ ফজর আলী তেমনই দাঁড়িয়ে রইল।

তারপরে অন্যের ইচ্ছার দাস হয়ে দেখতে পেল কি কৌশলে কত সহজে নগরী আপন পণ্যসম্ভার ক্রেতার কাছে তুলে ধরে। সময়ের হিসাব ফজর আলীর কাছে ছিল না। অতি কাছে থেকে খিল্ খিল্ হাসির তরঙ্গ উঠলে ফজর আলীও উঠবার চেষ্টা করল।

—খুব না ডর পাইছিলা, মাইয়ালোককে তুমি পাগল করতে পাইরবাগো মিঞা।

সেই হাসির রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই ফজর আলী চোখ মেলে সুন্দরী রমণীকে ভাল করে দেখল। ও নিজে এবার মুখ খুলল।

—হাচা কইচনি ?

জবাব আর শোনা হল না। কোথা থেকে যেন তখনই জুল্‌মত বেরিয়ে পড়ল, ফিরে যাবার তাগিদ দিল—চল্‌।

জুলমতের পিছু পিছু বেরিয়ে আসছিল ফজর আলী।

—আবার আইসো গো মিঞা। কথা ছুড়ে মারল হুরপরী।

পেছনে মিলিয়ে গেল আবার সেই হাসি।

সেই আমন্ত্রণ অবহেলা করতে পারেনি ফজর আলী। পরের রাতে গেছে আবার। তার পরের রাতেও......।

দিনভর মাল তোলে, মাল নামায়। সন্ধ্যা হলেই নিয়মিত হাজিরা দেয়।

ফজর আলীর জন্য কেউ সত্যিই পাগল হয়েছিল কিনা পরখ করতে পারেনি।

তবে তার নিজের অবস্থা ভেবে একদিন আঁতকে উঠল।

—হায় খোদা আমিই না পাগল অইলাম।

কমলাই তাকে পাগল করেছিল।

ছোটবেলায় শোনা কামরূপ-কামাখ্যাপুরীর গল্প। সমর্থ পুরুষ মানুষ সে দেশে পা দিলে আর আসতে পারে না। ডাকিনী রমণীরা যাদু করে ধরে রাখে। ফজর আলীকেও বুঝি যাদু করেছিল রূপসী বুড়িগঙ্গা, বাকল্যাণ্ড বাঁধের বিচিত্র জীবন।

চাষীর ছেলে ফজর আলী আর কোনদিন দেশে ফিরে গেল না।

সারাদিন জন খাটে। রাত হলেই মহাজন। এমন মহাজন যে কোন হিসাবের বালাই নেই। দিনভর আয় কর, রাত হলে ফতুর হয়ে যাও— এমনি কারবারী ফজর আলী।

অভিজ্ঞতার সাথে সাথে ফজর আলী বুঝল এক জায়গাতে বদ্ধ থাকার কোন মানে নেই। নানা ঘরে পা পড়ল তার। বাজারে খ্যাতিও বাড়ল, পৌরুষের খ্যাতি।

বন্ধু জুল্‌মতই একদিন পাকড়াও করল—শালা কইরতছিস কি ? সবই ফুঁকিয়ে দিচ্ছিস, আখেরে কি করবি। ঘর বাধ্‌বি না ?

ঘর বাধে কোন বোকা। যৌবন থাকলে আর পয়সা কামাই করতে পারলে ঘরের অভাব ?

ফজর আলী জুল্‌মতকে পাত্তাই দিল না।

—আমার ঘর দেখ্‌গা, কমলা, বাসন্তী, হীরার কাছে—

সেই বেহিসাবের কারবারী ফজর আলীও একদিন হিসাবী হল।

তবে সে অনেক পরে। তখন শরীরে শক্তি কমে এসেছে। তখন ইসলামপুর, বাদামতলীর রূপসীদের ঘরে ঘরে ফজর আলী আর আলোচনার উপলক্ষ নয়।

থেকে থেকে বুকের ভিতরটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। কেউ নেই, থাকা উচিত ছিল। এক ধরণের নিঃসঙ্গতা, অসহায়তা ফজর আলীকে পীড়িত করে অহরহ।

ফজর আলী কিছু কিছু পয়সা জমানো শুরু করল।

রাতে ঘোরাফেরাটাও কমিয়ে আনল। তারপরে একদিন ফজর আলী দেশে গেল।

দিন সাতেক পরে কম বয়সী একটি মেয়েকে বিয়ে করে আবার ফিরে এল। নিজের ঘর ফজর আলী কোনদিনই বাঁধতে পারবে না! নদীর ওপারে কম ভাড়াতে ঘর নিয়ে সংসার পেতে বসল।

এই সময় পেশাও বদল হল।

মাল টানাটানির ধকল শরীরে সয় না। বৌও পছন্দ করে না। চাষীর মেয়ে, তার কাছে কুলি কথাটাই অসহ্য। পেশা বদলের সেও অজুহাত।

কি পেশা ?

ফজর আলীর নিজের ভাষায়—হডেল করি।

হোটেল খুলেছে ফজর আলী।

সেই বুড়িগঙ্গার পাড়ের ওপর। পেশা বদল করেও ফজর আলী বুড়িগঙ্গাকে ছাড়তে পারল না। উঠতি বয়সের নতুন বৌ-এর টানেও নয়।

বাকল্যাণ্ড বাঁধের ধারে হোটেলের অন্ত নেই। বুড়িগঙ্গার বুকেও আছে ভাসমান হোটেল। তাদের শ্রেণীভুক্ত হবার মত কৌলিন্য ফজর আলীর হোটেল কোন দিনই অর্জন করতে পারবে না। সতর্ক দৃষ্টিপাত ভিন্ন সে হোটেল নজরেই পড়ে না। অন্ধ-খঞ্জ ভিখিরী, নানা জাতের ফেরিওয়ালা নদীর দিকে পিঠ দিয়ে সারে সারে বসে আছে। তাদের মধ্যেই আছে ফজর আলী।

মাটির হাড়িতে ভাত আর ডাল, পাশে বালটিতে পানি, রংচটা টিনের গ্লাস ভেসে বেড়াচ্ছে। মাটির সানকিতে ভাত বেড়ে দেয় ফজর আলী খদ্দেররা পায়ের ওপর বসেই গ্রাস মুখে তোলে। কচিৎ-কখনও ভাগ্যান্বেষী, প্রায়-নিঃসম্বল যাত্রী দেশে ফিরে যাবার সময় ফজর আলীর খদ্দের হয়।

হোটেলের চেহারা বৌ কোনদিন দেখেনি। স্বামী কুলিগীরি ছেড়ে কারবারী হয়েছে তাতেই সে খুসি। সেই খুসিতে পাতিল ভর্তি করে ভাত রাধে, ডাল সম্বারা দেয়। ফজর আলী ঝাকা ভর্তি হাড়ি পাতিল মাথায় নিয়ে নদী পার হয়। ফজর আলী তখন ভাগ্যে বিশ্বাসী হয়েছে। যখন যেমন বরাত। বরাত জোরে কোন দিন হাড়ি ভর্তি ভাত ডাল শিগ্‌গিরই শেষ হয়ে যায়।

লাভের কড়ি হিসাব করতে করতে প্রসন্ন ফজর আলী ঘরে ফেরে।

কোনদিন বা সারা দুপুর বসে থাকতে হয়। ভাত পচে যায়, ডালে গন্ধ ওঠে। সেদিন কম পয়সাতে ছাড়তে হয়।

লাভের প্রশ্নই ওঠে না। ঘরের কড়ি ঘরে আনতেই টানাটানি।

অবেলায় ফিরে দেখে বৌ-এর মুখ অন্ধকার। ফজর আলী বোঝে সঙ্গী-সাথী নেই তাই মন মরা। গাঁয়ের মেয়ে এখানে ঠিক মিশ খাচ্ছে না। এপারে ঘর বেধে ফজর আলীর মনেও যেন স্ফুর্তি নেই। সঙ্গী-সাথীও তেমন কেউ নেই। দিনের শেষে এখন আর তেমন করে সন্ধ্যা নামে না। রাত আসে না মাতাল হয়ে।

ঘরের কাছে ঘর, একটি ছোকরা মত লোক থাকে সেখানে।

নদীর ঘাটের ইজারাদারের সহকারী। নৌকা ভিড়লে খাজনা আদায় করা তার কাজ। গায়ে-গতরে পালিশ। ছোকরা গল্পেও ওস্তাদ।

প্রায়ই আসে ফজর আলীর কাছে।

ভাই-ডেকে ফজর আলীকে খুসি করতে চায়। তার ঐ গায়ে পড়া ভাবটা ফজর আলী পসন্দ করে না। তবু সঙ্গিহীন অবস্থায় সঙ্গ দেয়। মন্দের ভাল। তার আত্মীয়তার সূত্র যে অন্দরমহল পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছে ফজর আলী তা টের পেয়েছে প্রথম পরিচয়ের অনেক পরে।

সদরঘাট থেকে এসে চুপ করে বসেছিল।

—ভাবী—ভাবী শব্দ তুলে ছোকরা ভেতরেই ঢুকে পড়ল।

সহসা ফজর আলীকে দেখে এক গাল হাসল।

—আইয়া পড়চেন ?

ফজর আলী কোন জবাব দিল না। ওর তাতে কিছু যায়-আসে না। জাকিয়ে বসে বিনা ভূমিকায় গল্প ফেঁদে বসল।

ওর ডাকে-ত বৌ-সাড়া দেয়নি। উঁকি দিয়েও দেখেনি। ফজর আলী বিরক্ত হলেও আর কিছু বলল না। নিজেও গল্পে মশগুল হল।

বৌ-এর মন যুগিয়ে চলতে চায় ফজর আলী। তাকে খুসি করতে তৎপর !

এত করেও ফজর আলী বুঝতে পারে ওর মনটা যেন কোথায় পড়ে আছে। একটি কি দু'টি ছেলেপুলে থাকলে ভাল হত। কিন্তু তার তো কোন লক্ষণ দেখা যায় না। তবে কি সে নিঃশেষিত। সে বয়স কি পার হয়ে গেছে ?

ফজর আলীর বুকের কাছ থেকে কিসের একটি হিমস্রোত উঠতে উঠতে থেমে গেল। ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল ফজর আলী। অনেক ভেবেও কোন কুল কিনারা দেখতে পেল না। এমন কেউ নেই যার কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাওয়া যায়। একদা বাজারে যার এত নামডাক ছিল, খ্যাতি ছিল পৌরুষের, সে এখন কোন মুখে এই নিয়ে আলাপ করতে যাবে ?

জুল্‌মতের কথা একবার মনে পড়ল। অনেক আগেই সংসারী হয়েছে সে। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। মাথার ওপর ভারী বোঝা। খুব

ব্যস্ত, সদরঘাটে একদিন দেখা হয়েছিল। ফজর আলী বিয়ে করেছে শুনে খুব খুসি।

—যাবরে একদিন তোর বৌকে দেখতে।

ঐ বলা পর্যন্তই। আসেনি কোনদিন।

বৌ একদিন বলল, দ্যাশে চল না।

ফজর আলী অবাক।

- -দ্যাশে গিয়া কি করমু?

—ক্যান আবাদ কইরবা, আবাদের মত কি আছে?

কথা ঠিক। ফজর আলীর রক্তের মধ্যে কোন এক চাষা যেন নেচে উঠল।

—ঠিক কইছাস্।

কিন্তু একটু পরেই ঝিমিয়ে পড়ল। কোথায় আবাদ করবে? দেশে কি কিছু আছে? বাপ বেচেকিনে সব শেষ করে গেছে না?

বৌ-এর কাছেও জবাব ছিল না। নীচু গলায় বৌ বলল, সামসুও চাকরী ছাইড়া দ্যাশে যাইব। আবাদ কইরব।

—কে? প্রথমে বুঝতে পারেনি ফজর আলী সামসুকে।

পরে বুঝতে পেরে বলল, অর কথা ছাইড়া দে, ও শালা ত কথার রাজা, সব কইরতে পারে।

বেশীদিনও যায়নি তারপর। ফজর আলী এক বিকেলে সদরঘাট থেকে ফিরে দেখল ঘর শূন্য। বুঝতে পারল কার কাজ। কাউকে কিছু বলল না। আবার নদী পার হল। বুড়িগঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে শূন্যদৃষ্টিতে লঞ্চের যাত্রীদের উঠানামা দেখতে লাগল।

ঐখানেই একদিন জুল্‌মতের সাথে দেখা হল।

—কিরে তোর বৌ কেমন আছে? একদিন দেখতে যামু, শালার সময়ই পাই না।

ফজর আলী বোবার মত চেয়ে রইল। আর গিয়ে কি দেখবি। বন্ধুর কাছে খুলে বলল সব।

কাহিনী শুনে জুল্‌মতের সে কি রাগ?

—এতবড় কথা। শালা কোথাকার লোক জানিস?

—-তা জানি।

—তবে আর কি, থানায় খবর দিয়া দে। শালা তোর বৌ ভাগাইয়া নিছে আর তুই চুপ কইরা বইসা আছস? বিয়া করা বৌ না তোর?

কিন্তু জুল্‌মত যতই উত্তেজিত হোক ফজর আলী মরা সাপের মত ঠাণ্ডা হয়েই রইল। জুল্‌মতকে নিজের অক্ষমতার কথা বলতে পারল না।

কোন উৎসাহ নেই, উদ্যম নেই।

সে তাকিয়ে দেখছে বুড়িগঙ্গা, সদরঘাট আর বাকল্যাণ্ড বাঁধের বিচিত্র জীবনস্রোত। সেই জীবন প্রবাহ থেকে কিছুতেই নিজেকে আলাদা করে ভাবতে পারছে না। বুড়িগঙ্গার মতই যেখানে যেমন ছিল তেমনি অবস্থায় যেন সে আছে।

কেউ তাকে ছেড়ে যায় নি। কিছুই তার খোয়া যায় নি।

# অপূর্ণ তুমি ব্যর্থ বিশ্ব

**কায়েস আহমেদ**

১.

বিকেলের মরে যাওয়া হলদে আলোটা এতোক্ষণ খেলা করছিলো নোটন পায়রার মতো, একসময় জানলা গলে উড়ে গেছে। অন্ধকার এখন বেড়ালের মতো ঘরের ভেতরে হেটে বেড়াচ্ছে নিঃশব্দ পায়ে। শুয়ে শুয়ে অপূর্ণবাবু অনুভব করলেন তিনি বড়ো একা, বড্ডো বেশী নিঃসঙ্গ। সবাই কেমন যেন দূরে চলে যাচ্ছে ; অথবা, অপূর্ণবাবু নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন, কোনটা ?

বাইরের জগৎটা তাঁকে ডাকে মাঝে মাঝে। তাঁর ভেতরে তখন একটা আক্রোশ মাথা কোটে। অক্ষম পা দু'টো বিছানার ওপর ঠোঁকেন। কান্না পায়। ভেতরে ভেতরে তিনি ছেলেমানুষের মতো ফুলতে থাকেন অভিমানে। তারপর একসময় তা নিস্তেজ হ'য়ে আসে ক্লান্ত বিকেলের মতো। তখন ইচ্ছা না থাকলেও তিনি জানলার বাইরে রোদের ঝিলিমিলি দেখেন, পেয়ারা গাছে কচি পাতার কাঁপন দেখেন, হাওয়ায় ভেসে আসা মানুষের কথা শোনেন, অথবা এক গ্লাস জল খান মীরাকে ডেকে। তারপর ক্লান্ত ডাইনোসরের মতো নির্জীব পড়ে থাকেন। কখনো কখনো দীর্ঘশ্বাসের মতো শেলি আওড়ান : I fall upon the thorns of life ! I bleed !

অন্ধকার জমাট বাঁধছে। এখন পর্যন্ত এ ঘরে কেউ আলো দিয়ে যায়নি। হেঁসেলে রান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ও ঘরে ইরা-মীরা কি নিয়ে যেন তর্ক করছে। মায়া এখনো ফেরেনি। মেয়েটা নিঃশেষ হ'য়ে যাচ্ছে।...অপূর্ণ, তোমার মরে যাওয়া উচিত।...তুমি একটা অপদার্থ, ব্যর্থ, পঙ্গু, বৃদ্ধ জানোয়ার। তোমার মরে যাওয়া উচিত। মায়া এখনো ফেরেনি। ইরা-মীরার গলা শোনা যাচ্ছে। রান্নাঘরে কাজের ব্যস্ততা।

বিশুটা কোথা কোথা থাকে। ছায়ার নাটকের মহড়া। অরুণ নেই, বিকাশ ফেরার। অপূর্ণ, তোমার মরে যাওয়া উচিত।

···আমি কিছু করতে পারলাম না। সারাটা জীবন শুধু ব্যর্থতার পূজো ক'রে গেলাম।···আমি একটা অপদার্থ। আমার মরে যাওয়াই উচিত।···অপূর্ণবাবু বিড়বিড় করে বললেনঃ আমার মরে যাওয়াই উচিত। বিমলাকে কোনদিন সুখ দিতে পারলাম না। ছেলেমেয়েরা জীবনের হাতে মার খাচ্ছে। শিবুটার পড়া বন্ধ হয়ে গেলো। মায়ার রক্ত জল করা পরিশ্রমের ক'টা টাকার ভরসা। ছায়া নাটকে নেবেছে, যা পায় তাতে ওর ঠাট বজায় রাখতে গিয়েই ফতুর।···লোকের কথা শুনতে হয়ঃ শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক মেয়েকে নটী বানালো!···বড় ছেলে রাজনীতি ক'রতে গিয়ে ফেরার।

বিমলার দিকে তাকানো যায় না।···বিমলা, আমায় তুমি ক্ষমা কর।··· আমি একটা অপদার্থ।···তোমায় কোনদিন সুখ দিতে পারিনি।··আমায় তুমি ক্ষমা কর বিমলা। মায়া কি এলো? ছায়া কি আজ নাটকের রিহার্সাল দিতে গেছে? আগে শিবু সঙ্গে যেতো, আজকাল যেতে চায় না। বল্‌লে কেমন গম্ভীর হ'য়ে যায়। কেন?

বিমলা কেমন দুর্বোধ্য হ'য়ে গেছে। চেনা যায় না। ভয় লাগে। ....আমার স্ত্রীকে আজ যেন আমি চিনতে পারছিনা। আমার তিরিশ বছরের সুখ দুঃখের একান্ত সঙ্গী আজ আমার কাছে দুর্বোধ্য, তাকে ভয় লাগে।···বিমলা তুমি আমায় ক্ষমা কর।

·· সারা জীবন আমি সোনার হরিণের পেছনে ঘুরে মরলাম। তিরিশ বছর ধরে তোমায় একটু একটু ক'রে হত্যা ক'রেছি আমি। · আমায় ক্ষমা করো বিমলা।· আমি একজন ব্যর্থ, অক্ষম পুরুষ।....আমায় ক্ষমা করো। ·তুমি কেমন গম্ভীর হ'য়ে গেছো। কথা কম বলো, অন্যমনস্ক থাকো। ···তোমাকে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো মনে হয় আজকাল।

অরুণ যেদিন সুপুরি পাচার করতে গিয়ে বর্ডার পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলো, সেদিন তুমি কাঁদোনি। তোমার মুখের দিকে সেদিন আমি তাকাতে পারিনি। নিজেকে আমার অপরাধী মনে হ'য়েছিলো।···মনে

হ'য়েছিলো আমিই অরুণকে খুন করেছি।...সেদিন তোমাকে আমি ভয় পেয়েছিলাম। সেদিন থেকে তুমি গম্ভীর হ'য়ে গেছো।

অপূর্ণবাবু দেখতে পেলেন—বেপরোয়া, বিপর্যস্ত অরুণ উপড় হ'য়ে পড়ে আছে।···তিনি চোখ বুঁজলেন; কিন্তু অরুণের রক্তাক্ত শরীরটা অন্ধকারের ভেতর জ্বল জ্বল করতে লাগলো। অপূর্ণবাবু ভাঙা গলায় ডাকলেন—মীরা আলোটা দিয়ে যা।

২

কার্তিক সেনের মণ্ডপ থেকে ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে। ঘরের দেয়ালে অন্ধকার কাঁপছে। বাতাসে কি শিউলী ফুলের গন্ধ?··· অরুণের রক্তাক্ত শরীর। নির্জনতা ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে।...শিউলী ফুলের গন্ধ....মাইকের উন্মত্ততা · ঢাকের আওয়াজ ··অপূর্ণ, তোমার মরে যাওয়া উচিত।·· অন্ধকার ফুঁসছে। অপূর্ণ তুমি ভয় পেয়েছো, তোমার সন্তানকে তুমি ভয় পেয়েছো।· আততায়ী পিতা, তুমি ভয় পেয়েছো।·· আশ্চর্য, অপূর্ণ তুমি ভয় পাও, আজকাল তুমি ভয় পাও? · অথচ বুলেট বিদ্ধ তাপস মুখার্জীর রক্তাক্ত শরীরকে লুটিয়ে পড়তে দেখেছ তুমি।·· কোন্নগরের ছবি বৌদির কথা মনে পড়ে? · বারুদের গন্ধে ভরা দিনগুলো কি ভুলে গেলে? ··বিনয় বসু ··সুধীর গুপ্ত······Veranda Fighting.... সব ভুলে গেছো অপূর্ণ, তুমি সব হারিয়ে ফেলেছো, তোমার মরে যাওয়াই উচিত।

মীরা আলো দিয়ে গেছে। লম্বা লম্বা ছায়া কাঁপছে চুন খসে পড়া দেয়ালে। সেদিকে চেয়ে অপূর্ণবাবু দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, মনে হ'লো তাঁর ভেতরটাও অমনি চুন খসে পড়া পলেস্তারা বিহীন এবড়ো খেবড়ো, স্যাঁতসেঁতে। অনেক আগাছা, অনেক চিড় খাওয়া ফাটল।···অপূর্ণ তোমার মরে যাওয়া উচিত।

খোকা, তোকে বড়ো হ'তে হবে, অনেক বড়ো, অনেক···বাবার বুক ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে। সাদা চোখ দুটো অপূর্ণর মুখের দিকে নিবদ্ধ। · তুমি আমার বড় ছেলে, তোমার ওপর আমার বাবা হাঁপাচ্ছে। ঠোঁট চেটে

নিল জিভ দিয়ে, তোমার ওপর অনেক ভরসা।···বাবার চোখের দৃষ্টি অপূর্ণর দিকে, নির্ভরতা খুঁজছে, আশ্বাস পেতে চাইছে।···অন্ধকার কাঁপছে, ···পার্টি ছাড়া তুমি কি আর কিছুই বোঝ না অপূর্ণদা—দীপার ঠোঁটে থর-থর অভিমান, চোখে চিক্‌চিকে কান্নার আভাস।·········দাদা, আপনি পত্রপাঠ মাত্র চলিয়া আসিবেন, মার অবস্থা খুব খারাপ। আপনাকে তিনি দেখিতে চাহিতেছেন। মোটেই দেরী করিবেন না।···অপূর্ণ তুমি একবার দেশে যাও, লক্ষ্মী ভাই আমার একবারটি তোমার মাকে দেখে এসো, ভগবান না করুন, কিছু যদি একটা অঘটন ঘটে যায় তো সে দুঃখ সারা জীবনেও ঘুঁচবে না।····না, না, তা হয় না বৌদি, তুমি বুঝতে পারছো না, এই মুহূর্তে কোন মতেই যাওয়া সম্ভব নয়, এখন আমার অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব।······মা, মাগো, আমায় তুমি ক্ষমা কর মা···বাতাসে অন্ধকার ফুঁপিয়ে উঠছে।

বাইরে এখন অনেক আলো, উল্লাস, উন্মত্ততা। অন্ধকারের নির্জনতা কেঁপে উঠছে ঢাকের শব্দে। মাইকে কেটে যাওয়া রেকর্ডের বেসুরো খসখসে আওয়াজ। শিবুটা কোথা? প্রতিমার সুমুখে নাচছে হয়তো। ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। প্রতিমার মুখ দেখা যাচ্ছে না। মায়া কি এখনো ফেরেনি? ছায়াটা যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। সিনেমায় চান্স পাবার জন্যে চেষ্টা করছে নাকি আজকাল। অপূর্ণবাবু কিছু বলতে গিয়েও ভয় পান। কর্তৃত্বের অধিকারটা তিনি কবে যেন হারিয়ে ফেলেছেন। কে যেন কেড়ে নিয়ে গেছে। নিজের স্বেদ ও রক্তে গড়া সৃষ্টিকে শাসন করতে তিনি আজ ভয় পান।

···এক কড়ার মুরোদ নেই তার আবার মান-সম্মান! লজ্জা করে না? ভবিষ্যতের কথা তো তুমি কোনদিন ভাবোনি, সারাটা জীবন আমাকে জ্বালিয়েছ, এখন বিছানায় পড়ে পড়ে.... ··বিমলার গলায় কান্না।

বাড়ীতে নানা ধরণের লোকজনের আনাগোনা শুরু হ'য়েছে তারপর। কথা আর হাসির টুকরো টুকরো আওয়াজ অপূর্ণ বাবুর স্যাঁতসেঁতে ঘরটায় আছড়ে পড়েছে। অন্ধকারের ভেতর কালো একটা ভালুকের লোমশ থাবা

দুলতে দেখেছেন তখন তিনি। কিন্তু বিমলার কথাগুলো জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো তাকে কুঁকরে দিয়েছে।

ছায়ার দিকে আজকাল তাকানো যায় না। বাপ হ'য়ে তাকানো যায় না। কি যেন এক সর্বনাশা ক্ষুধা ওর চোখ মুখে নিয়ত জ্বল্ জ্বল্ করে। তখন ওকে অপরিচিত মনে হয়। চেনা যায় না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত উগ্র অপরিচিত। অপূর্ণ বাবুর ভয় লাগে। ক্ষোভে, দুঃখে, যন্ত্রণায় তিনি রক্তাক্ত হন মনে মনে। অপমানের জ্বালায়, অক্ষমতার দীনতায় বুক ঠেলে কান্না উথলে ওঠে।····· অপূর্ণ, তোমার মরে যাওয়া উচিত।

৩

সকাল বেলা যখন বিভূতি বাবু এসেছিলেন আকাশে তখন আলো ছিলো। বাইরে কাক ডাকছিলো। অপূর্ণ, তোমার সামনে বিভূতি উকিলের মুখ বড়ো বেশী উজ্জ্বল আর মসৃন মনে হচ্ছিল। বিভূতি বাবু সোপান মাড়িয়ে মাড়িয়ে তাঁর কৃতিত্বের এক একটি মণিময় মহলে তোমায় নিয়ে যেতে থাকলে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলে, আর হাঁটতে পারছিলে না, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো, হাওয়া বড়ো অপ্রতুল, এবং আলোর প্রখরতা চোখ ঝলসে দিচ্ছিলো। এখন বিভূতি বাবু নেই, তবু সকালটাকে মনে মনে এই সন্ধ্যার অন্ধকারে অনায়াসে আনতে পারে। কিন্তু বিভূতিবাবুর সকালকে তোমার সন্ধ্যায় এনে কি লাভ, অপূর্ণ! নিজেকে নিজের কাছে বড়ো উলঙ্গ করে দেয়, লজ্জায় তখন অন্ধকারে লুকোতে অস্থির হয়ে উঠতে হয় ··

বিভূতিবাবু যখন তোমার হাত ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাঁর রাজ্যপাট দেখাচ্ছিলেন তুমি তখন সভয়ে বিমলাকে খুঁজছিলে, বিমলা লক্ষ্য করছে কিনা, অথবা শুনছে। বিমলার নাগাল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবার আপ্রাণ প্রয়াস পাচ্ছিলে, অথচ দেখো অপূর্ণ, এখন তুমি সেই বিমলাকে যে তোমার বোধগুলিকে প্রতি নিয়ত জাগ্রত করেছে, তাকে নিভৃত অন্ধকারে শিশুর মতো আকুল হয়ে পেতে চাইছো! লজ্জা অপূর্ণ, লজ্জা। বরং তোমার মরে যাওয়াই ভালো।

হারিকেনের লাল আলো কাঁপলে দেয়ালে অপূর্ণবাবুকে এখন সত্যিই

ডাইনোসরের মতো মনে হয়। হাজার বছরের ক্লান্ত, অথর্ব, নিজেকেই নিজের কাছে অপরিচিত ঠেকে।

তখন তিনি ইরা, মীরা, মায়া, ছায়া, তাঁর স্ত্রী বিমলা, শিবু, সবাইকে ডাকলেন একে একে। কোন সাড়া পেলেন না। প্রতিধ্বনি হ'য়ে ফিরে এলে তিনি সভয়ে আবার দেয়ালের দিকে তাকালেন, হ্যাঁ ঠিক তেমনি ·· সমস্ত শরীর জ্বালা করে উঠছে এখন, হাত দিয়ে দেখলেন গায়ের চামড়া খসখসে আর শক্ত হয়ে উঠছে। সমস্ত মুখগুলোকে কল্পনা করলেন তিনি ঝাপসা, অবয়বহীন কতগুলো রেখার জটিল সমষ্টি ; নড়েনা, কথা বলে না, স্থির! তখন চিৎকার করে উঠতে চাইলেন, আমি অপূর্ণ বলছি ·আওয়াজ বেরুলনা, একটা গোঙানীর মতো কিছু ধ্বনি গলার ভেতর কেঁপে উঠলে তিনি মুখের ওপর হাত এনে অনুভব করলেন মুখটা লম্বা আর শক্ত হয়ে উঠেছে, ঠোঁট দুটো সামনের দিকে ঝুলে এসেছে এবং ভীষণ অমসৃণ। হাত পা, সমস্ত শরীর ভারী আর বিপুল হ'য়ে উঠছে।

তিনি আবার চিৎকার করে বলতে চাইলেন ঃ আমি শ্রী অপূর্ণ চন্দ্র রায় এই বাড়ীর কর্তা, বিমলার স্বামী, ছেলেমেয়ের বাবা···আমি···

হঠাৎ সেই বিপুল নৈঃশব্দের ভেতর থেকে কান্না আর বিলাপ নবজাত শিশুর মতো কঁকিয়ে উঠলে তিনি সচকিত হয়ে শুনছেন ঃ হায় হায় রে, সাঁতার জানে না, কেন নৌকায় চড়তে গেলো··· ·বিমলা কাঁদছে, ভীষণ ক্লান্ত ; কিন্তু কাঁদছে, অরুণ মরার সময় কাঁদে নি, এখন কাঁদছে।···অপূর্ণবাবু বলে উঠতে চাইলেন ঃ আমি এখানে ; কিন্তু পরক্ষণেই থেমে গেলেন, মনে পড়লো তিনি এখন একটা কুৎসিত জন্তু, এবং মনে হতেই নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে ব্যস্ত হলেন।···শিবু, তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নদীতে ডুবে মরেছে। তিনি তার পিতা ; কিন্তু ওরা সবাই এখনই তাঁকে এ খবর দিতে এসে যখন দেখবে তিনি ডাইনোসর হয়ে গেছেন, তখন ওদের চোখের কান্না শুকিয়ে গিয়ে জিঘাংসা জ্বলে উঠবে।

দ্রুত হাতে হারিকেন নিভিয়ে দিলেন। ঘরের ভেতর অন্ধকার ডানা মেললে অপূর্ণবাবু সেই প্রাগৈতিহাসিক আঁধারের ভেতর অথর্ব দেহটা নিয়ে আত্মগোপন করার জন্যে আকুল হ'য়ে উঠলেন।

---

# অন্ধকার আছে

**শেখ আতাউর রহমান**

এই শহরের নিচে একটা বিরাট ক্ষত আছে। তাছাড়া এ শহরের মাটি যন্ত্রণায় এমন কেঁপে উঠবে কেন? শহর কি লাভা-স্রোত? সারি সারি পোড়া মানুষগুলো ফুটপাথ দিয়ে ভেসে চলে কোথায়? এবং আকাশের রং এমন ভয়ঙ্করভাবে আমার চোখের সামনে ধূসর হয়ে যাচ্ছে কেন? অবক্ষয়ের পাতালে ডুবে যাচ্ছে কি শহর? মহাকাল কি রক্ত চোষা বাদুড়ের মতো উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে অসীমের অন্ধকারে? এবং এই অন্ধকার গলিই কি এই বিভীষিকার বাদুড়ের প্রথম শিকার?

আমি এসেছি অরু। গলির সাত নম্বর দরোজায় আমার কম্পিত কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো সন্ধ্যার অন্ধকারে। যেহেতু আমি আসন্ন সংবর্তের সংবাদ পেয়েছি। কিন্তু আমি কোনো সাড়া পেলাম না। শুধু বন্ধ দরজার ওপার থেকে রুগ্ন শিশুর ক্রন্দনের মতো ভেসে এলো হারমনিয়ামের একটানা বিরক্তিকর আওয়াজ। তখন বন্ধ দরোজায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো ঘড়ির দোকানের আলো। আমি কাঁচা কাঠের ভ্যাপসা গন্ধ পেলাম।

কিন্তু আমাকে রুগ্ন শিশুর এই বিরক্তিকর কান্না স্তব্ধ করে দিতে হবে। যেহেতু তা অসহ্য, কাঁচা কাঠের গলিত ঘ্রাণ থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে, যেহেতু সেটিও অসহ্য, এবং দরোজা উন্মুক্ত করতে হবে। তাই আমার প্রতীক্ষার হাতটা আরেকবার অসহিষ্ণুর মতো জোরে জোরে নাড়া দিয়ে উঠল কড়াটাকে, এবং জানিয়ে দিতে চাইলাম, আমি এসেছি, আমার যন্ত্রণার শরীরটা তখন এই দরোজার সামনে এসে হাজির হয়েছে। তখন অকস্মাৎ থেমে গেল রুগ্ন শিশুর কান্না এবং আমি শুনতে পেলাম, কে?

আমি। দরজা খোল। আমার কণ্ঠস্বর ভয়ঙ্কর বিক্ষুব্ধ শোনালো।

কে, মাস্টার সাহেব?

হ্যাঁ।

এরপর এ বাড়ীর কনিষ্ঠা মেয়ে, যা আমি কণ্ঠস্বরেই সনাক্ত করতে পেরেছি, মেঝেতে লাফিয়ে পড়লো। বন্ধ দরজার ওপার থেকে আমি তার শব্দ পেলাম। তারপর ছেঁড়া শ্লিপার একটা করুণ পরিচিত আওয়াজে বাতাস সচকিত করে দিয়ে দরোজার দিকে অগ্রসর হলো। এবং আমি কপাটের ছিদ্রে আলো দেখলাম। অকস্মাৎ ছিটকানি খুলে গেল। উন্মুক্ত কপাট। এবং এক ঝলক তীর্যক রশ্মি।

প্রথমে অরু লণ্ঠনটা মাথার ওপর তুললো এবং আলোতে আমাকে সনাক্ত করলো। তারপর দু ঠোঁটে একটা বিশেষণ হীন হাসি তৈরী করে বলে উঠলো, আসুন মাস্টার সাহেব। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিলেন? আমি একটুও টের পাইনি। আসলে হারমোনিয়াম বাজাতে থাকলে আশেপাশের কিছুই শোনা যায় না।

এবার অরুর হাসিটার একটা বিশেষণ দিতে পারলাম। অরু অপরাধীর হাসি হাসছে। এবং এ বাড়ীর এ মুখটিই শুধু ব্যতিক্রম। অর্থাৎ এই চঞ্চল মুখটা ছাড়া এ বাড়ীর আর সবার মুখ কোনো দিন হাসে না। হাসতে জানে না। হাসতে ভুলে গেছে। আর এই গলির এই আদিম অন্ধকারের সঙ্গে বরাবর শত্রুতা করে এসেছে, এই উজ্জ্বল বিদ্রোহী মুখ। যেন এই মুখ ধূসর মহাকালের সব জাল জুয়োচুরি ধরে ফেলেছে। আর ধরে ফেলার উল্লাসে অনাবিল হাসতে পারছে এই বিশাল অন্ধকারের রাজ্যে।

ওভাবে তাকিয়ে দেখছেন কি? অরু আমার চোখে চোখ রাখলো, চলে আসুন ভেতরে। আজ অমাবস্যা। দেখছেন না গলিটা কি অন্ধকার?

এরপর আমি চৌকাঠ পেরিয়ে এলাম। আর এখন দরোজা বন্ধ করতে করতে আবার হেসে উঠলো এ বাড়ীর ছোট মেয়ে। এ বাড়ীতে থাকতে আমার যা ভয় করে মাস্টার সাহেব? বাড়ী তো না যেন পাতালপুরী। অরু পেছন ফিরলো, এবং আমাকে কেন্দ্র করলো। কন্ট্রাকটারের সাদা বিল্ডিংটা যদি আমাদের হতো, তাহলে আজকের সারা রাত আমি ঘরে একটা একশো পাওয়ার বালব জ্বালিয়ে রাখতাম।

কিন্তু কন্ট্রাকটারের সাদা বিল্ডিংটা যে অরুদের কোনো দিন হবে না, সেটা শুধু অরু নয়, আমি নয়, আমাদের ছায়া দুটোও জানতে পেরেছিল।

তাই তারা দেয়ালের পাংশু প্রচ্ছদপটে কৌতুকে নৃত্য করছিল এবং যখন আমরা এগুচ্ছিলাম, তারাও আমাদের সঙ্গ নিয়ে নাচতে নাচতে এগুচ্ছিল।

কোনো কোনো দিন রাত্রিতে আমার ঘুমই ভেঙে যায়। যা ভয় করে তখন। এবার অরু গম্ভীর হলো, বাতি তো শোবার সময়েই নিভিয়ে শুতে হয়। ভয়ে পাথর হয়ে মুখ বুজে থাকি তখন। এত করে বলি, আমার ঘরে বাতি জ্বলুক একটা। তা কাউকে রাজী করাতে পারলাম না। বলুন তো মাস্টার সাহেব, একটি লণ্ঠনের জন্য কতটুকুই বা তেলের প্রয়োজন?

আমি কোনো উত্তর করলাম না। আমি ছায়াদের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

বুঝলেন মাস্টার সাহেব, এখন এ শহরে একটা ধ্বংসের প্রয়োজন। একটা ভূমিকম্পের।

এবার আমার চোখ সরে এলো দেয়াল থেকে এবং অরুর চোখে তা নিবদ্ধ হলো, কেন?

এ গলিটা তাহলে সবার আগে ধ্বংস হতে পারতো। একেবারে মিশে যেতে পারতো মাটির সঙ্গে। অরুর মুখটা ধীরে ধীরে একটা ভোজবাজির মতো আমার চোখের সামনে হলুদ হয়ে যাচ্ছে, ব্যস তাহলে এ বাড়ীর আনাচে কানাচে সারাক্ষণ অন্ধকার দেখে আমাকে ভয় পেতে হত না, এবং মরেই সব জ্বালার অবসান হতো।

এ শহরের নিচে নিশ্চয়ই কোথাও একটা ক্ষত আছে। এবং সেই ক্ষত এই গলিটার নিচেই বাসা বেঁধেছে। আর সে ক্ষতেও পচন ধরেছে। ক্ষত বাড়ছে, যন্ত্রণা বাড়ছে। কিন্তু আমি এই ক্ষতের কথা, যন্ত্রণার কথা সব কিছুই ভুলতে চাইলাম। তাই আমার কণ্ঠস্বর প্রবল প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় প্রসঙ্গকে টেনে আনতে চাইলো, গানটার কতদূর আয়ত্তে এসেছে?

সবটাই।

বেশ।

অরু দ্বিতীয় দরোজায় চৌকাঠ পেরিয়ে এলো। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। এবং মৃতের মতো শীতল মেঝে অতিক্রম করে রুগ্ন চৌকির

উপর এসে বসলাম। তখন আমার চোখের সামনে এ-ঘরের কাঁসার বাসনগুলো নকল সোনার মতো হলুদ হয়ে উঠল লণ্ঠনের দুর্বল আলোয়। এইবার এই চতুর্ভূজ ঘরটা, হারমোনিয়াম, অরু, আমি, রুগ্ন চৌকী, লণ্ঠন, লণ্ঠনের আলো, কাঁসার বাসন এবং বদ্ধ বাতাস—সমস্ত কিছুর উপাদানে চমৎকার একটা নিঃশব্দ নরক তৈরী করল। এবং এই ভয়াবহ নৈঃশব্দে আমরা সবাই চমকে গেলাম।

কিন্তু এতসব প্রতিকুলতা থাকা সত্ত্বেও অরু হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে চৌকির উপরে বসতে পারলো এবং এমন অপরূপ ভঙ্গিমায় শাড়ি টেনে পায়ের পাতা ঢাকলো যে মুহূর্তের জন্য আমার ইচ্ছাকে ভয়ঙ্কর কামুক মনে হলো। তাই এই লজ্জাকর মানসিকতায় ভারসাম্য আনবার জন্য আমি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলাম, লণ্ঠনটা হারমোনিয়ামের ওপর রাখো।

আচ্ছা। অরু আদেশ পালন করলো। এবং ঝুঁকে পড়ে লণ্ঠনের ফিতে আরেকটু বাড়িয়ে দিল।

আমি এবার অরুর চোখে চোখ রেখে, গাও—এই আদেশ করে পর মুহূর্তেই চোখ বুজে ফেললাম। এবং এভাবে আমার মানসিকতায় ধীরে ধীরে ভারসাম্য ফিরে আসতে শুরু করলো।

বেজে উঠলো হারমোনিয়াম।

চমকে উঠলো নৈঃশব্দ।

দেয়ালে প্রেতাত্মারা কাঁপছে।

এরপর অরুর দরদের কণ্ঠটা আরেকবার চমকে দিল নৈঃশব্দকে। করুণ হয়ে উঠলো সুর। বিলাপ করতে শুরু করলো সমস্ত বাতাস: হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব—ঘোর কুটিল পথে তারও লোভ জটিল বন্ধ ··।

এ গলির আদিম বন্দীরা তমসার পাতাল থেকে সার বেঁধে আলোর কোরাস গাইছে। অরুর কণ্ঠে আমি তাদের আর্তনাদ শুনতে পেলাম। এ গলির শতাব্দীর অভিশপ্ত অশ্রুর স্রোত সর্বহারার বন্দীশালার ভিতে নোনা ধরিয়ে দিয়েছে। তমসার পাইথন ছুটে আসছে। আমার চোখে প্রভু বুদ্ধের ছবিটা ভাঙছে, গড়ছে। কিন্তু কোনো নবজন্ম হচ্ছে না।

মুমূর্ষু কানের কাছে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম কণ্ঠস্বর প্রবল হল্লা করে উঠলো. আজ কনট্রাকটারের বাসায় একটা জিনিস চুরি গেছে।

কি ?

একটা নতুন স্নো-র কৌটো। কণ্ঠস্বর দাঁত বের করে হাসলো, খুব হৈ-চৈ হল তা নিয়ে।

তাতে কি হয়েছে ?

কে চুরি করেছে ওটা আমি জানি। তার টেবিলে ওটা আমি দেখেছি।

কে করেছে ?

অরু। নিকৃষ্ট কণ্ঠে অশ্লীল হাসিটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ করলো। হাসির তালে-তালে স্যানাটোরিয়ামে জমানো চাক-চাক চর্বির দলা, যে-চর্বি দিনকে দিন ভয়ঙ্করভাবে গলে যাচ্ছে। অশ্লীল নাচতে শুরু করলো, এবং আমি এই হাসি, এই চর্বির নৃত্যে ভয়ঙ্কর আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারাত্মকভাবে বিক্ষত হলাম। যেন আমার মাথা লক্ষ্য করে কেউ একটা ভীষণ আঘাত করেছে এবং আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে মূর্তিমান যন্ত্রণার মতো আমি দ্রুত চলতে শুরু করলাম।

আরে এখনই যাবেন কি ? আমার দুঃখের কথাটা শুনবেন না ? ছুটে এসে আমার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরলো এ বাড়ীর বড় ছেলে। এবং তখন, কি বলবেন বলুন—এই বলে আমি এক ঝটকায় আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম।

জানেন, আজ স্নান করে গায়ের কাপড়টা গায়েই শুকিয়েছি। এবার আমাকে চমকে দিয়ে অস্বাভাবিকভাবে করুণ হয়ে উঠলো সে, এই অসুখ শরীরেই। অরুর একটা শাড়ি চাইলাম কিছুক্ষণের জন্য। শাড়িটা পরে আমার কাপড়টা শুকিয়ে নেব শুধু। একটিই কাপড় কিনা। তা কিছুতেই দিল না। চর্বির শরীর এবার হাঁফাতে শুরু করলো। মাঝখান থেকে আগুনের মতো অনেকগুলো কথা শুনিয়ে দিল আমাকে ! অথচ ওরা আমার কত ছোট। ওদের আমি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। বলে কি জানেন, কাপুরুষটা অসহিষ্ণুর মতো আবার আমার একটা হাত চেপে ধরলো, আমি নাকি কুঁড়ের বাদশা, কাপুরুষ, বাপের ওপর বসে বসে

দুবেলা গিলছি। ফুসফুসের সমস্ত বাতাস নিঃশেষিত হয়েছিল। তাই সে এক মুহূর্ত বিশ্রাম নিল, এবং তারপর, দুবেলা গিলছি। কি তাহা মিথ্যে কথা।—এই বলে কলিক পেনের রুগীর মতো ছট-ফট করে উঠলো চর্বির শরীর অন্ধকার তোলপাড় করে। আর তাতে একটা পাশবিক শব্দ উঠলো তার নাসারন্ধ্রে।

তখন আমার মাথার উপর সেই পরিচিত পেঁচাটা আবার আর্ত চিৎকার করে উঠলো।

বলুন তো, ওদের আমি কেমন করে বোঝাবো? নিকৃষ্টতম নয়, এবারে করুণতম কণ্ঠস্বর, কিছু করতে গেলেই যে আমার বড্ড ভয় করে। মনে হয়, এই বুঝি অসুখটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

এবার হলে কি আর বাঁচবো মশাই? জানেন তো ডাক্তারের হুকুম, কমপ্লিট রেস্ট। যেন এবার সে কেঁদেই ফেলবে, দেখুন তো বিধাতার কি বিচার, ভিখারীর শরীরে রাজরোগ।

গলির অন্ধকারটা গুমোট বাতাসের সঙ্গে পাইথনের মতো হেলে-দুলে অগ্রসর হচ্ছে। এ বাড়ীর প্রাচীন প্রাচীরগুলো গ্রাস করে সে উঠোনের কাঁঠাল গাছটার দিকে তেড়ে গেছে। আর তাতে করে ভীষণ ভয় পেয়েছে বাদুড়টা। আর্ত চিৎকারে পাখা ঝটপট করে সে নিথর হয়ে গেছে কাঁঠাল পাতার অন্ধকারে।

চলি এবার। আমি তখন আলোর জন্য মুমূর্ষু হয়ে উঠেছি। কিন্তু চমকে উঠলো স্যানাটোরিয়াম। খপ করে চেপে ধরল আবার আমার একটা হাত, যাচ্ছেন? কিন্তু আমার যে একটা জিনিস চাইবার ছিল মাস্টার?

আমি জানি, বিরক্তিকর ভাবেই জানি এখন সে কি চাইবে। তবুও আমি বললাম, কি?

আট আনা পয়সা।

নেই।

তা হলে! আর্তনাদ করে উঠলো সে, পর-পর পাঁচ দিন যে আমার মোটেই দুধ ছোঁওয়া হয় নি। এক চামচও না। অথচ ডাক্তারের হুকুম রোজ দুসের করে—

যাক, আর কথা বাড়াবেন না। আমি এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলাম, এই নিন।

আমার একটা ক্লান্তির হাত একটা অস্বস্তির সিঁড়িকে আরেকটা ব্যাকুল হাতের ওপর ছেড়ে দিল। এবং দিয়ে ক্ষোভে ও গ্লানিতে ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পেণ্ডুলামের মতো ঝুলতে থাকলো কাঁধের সঙ্গে।

আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব মিস্টার! হাতের মুঠোয় শিকার পেয়ে হায়েনার মতো হেসে উঠলো, এতেই আজ চলে যাবে আমার। অন্তত এক পোয়া তো হবে। জানেন, গতকাল কণ্ট্রাক্টারের বিড়ালটাকে জিভ দিয়ে গোঁফের দুধ চেটে খেতে দেখে আমার যা কান্না পেয়েছিল।

আমার শরীর আর পারলো না নিজেকে স্থির রাখতে। তাই সে একটা মূর্তিমান আর্তনাদের মতো সরে এলো অন্ধকার প্রাচীর ভেদ করে। এবং তখন আমি নরকের উত্তাপ পেলাম। এবং বুঝতে পারলাম আজ একটুও বৃষ্টি হবে না। চাঁদ তো উঠবে না আকাশে, কিন্তু বাতাস? না আজ বাতাসও বইবে না। সেহেতু এখানে যদি নরকের যন্ত্রণা থাকে তবে এটা নরক ; আর নরকে চাঁদের আলো, বৃষ্টির স্নিগ্ধতা ও বাতাসের ঝিরঝির কোনোদিন থাকে না।

করিডোর ছিল, করিডোরের রেলিং ছিল, এর পর তিন ধাপের সিঁড়ি ছিল, সিঁড়ির নিচেই মৃতের মতো ঠাণ্ডা মাটিও ছিল। এবং আমি ঠাণ্ডা মাটিতে পা রাখতেই সন্দেহের স্বর কেঁপে উঠলো খিড়কি দরোজায়।

কে?

আমি।

মাস্টার?

হ্যাঁ।

আরে শোন-শোন। ভালুকের মতো বিশাল পা ফেলে আমার দিকে অগ্রসর হলেন এ বাড়ীর কর্তা। তাতে করে আমার সত্তার সামনে আবার একটা প্রাচীর তৈরী হলো। কাউকে বলিনি ব্যাপারটা। তোমাকে বলবার জন্য সেই সকাল থেকে উদগ্রীব হয়ে রয়েছি। আমার কানের

কাছে সংলাপগুলো মোটরের হর্ণের মতো বেজে উঠলো। আমি তার বুকের মধ্যে প্রাচীন কফের আর্তনাদ শুনতে পেলাম।

বলুন ?

বলবো কি হে ? বলবার কি আর মুখ রেখেছে ? তার কণ্ঠস্বরে এবার দুঃখকে শোনা গেল, রোজকার মতো আজ ভোরেও দোকানের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছিলাম। তা যেই কিনা দরজার কাছে এসেছি, আর অমনি—

কি ?

আর অমনি আমার মাথার উপর, মানে আমার টাকের উপর টক করে করে ইঁটের মতো কি যেন কি এসে পড়লো। যন্ত্রণায় চোখে জল এসে যায় আর কি। বৃদ্ধের দু হাত আমার যন্ত্রণাকে স্পর্শ করলো, মাথাটা এখনো সুপুরির মতো ফুলে রয়েছে।

পাড়ার কোনো দুষ্টু ছেলের কাজ।

আরো রাখো তোমার দুষ্টু ছেলে। প্রাচীন কফ হুঙ্কার ছাড়লো, দুষ্টু ছেলে না হাতি, একেবারে ধাড়ি ছোকড়া। যাকে তোমরা বলো তরুণ নাগরিক, দেশের ভবিষ্যৎ। উত্তেজনায় তিনি যেন উন্মাদ হয়ে যাবেন, ভবিষ্যৎ ? দাঁতে দাঁত ঘষে তিনি একথা উচ্চারণ করলেন। হাত দুটো মুঠো হয়ে এল শূন্যে। যেন কাউকে খুন করে ফেলবেন।

কেন কি ব্যাপার ? অনির্দিষ্ট আতঙ্কে আমার কণ্ঠস্বর বাতাসে হিস-হিস করলো একটা অশরীরী আত্মার মতো।

আবার ব্যাপার ? অন্ধকার স্তব্ধ হয়েছে। মাথাটা নাড়তে-নাড়তে যেই কিনা নিচে তাকিয়েছি, দেখি ইঁটের টুকরোয় জড়ানো একটি কাগজ। তুলে খুলতেই—

কি ?

বিলেডু, খাসা বিলেডু। একটা পশুর মতো মুখ বিকৃত হয়ে এলো, একেবারে নির্ভেজাল প্রেমপত্র।

কণ্ট্রাক্টারের তেতলার কার্ণিস বেয়ে তরল অন্ধকার গড়িয়ে পড়ছিল এতক্ষণ। এবার হঠাৎ জমাট বেঁধে গেছে। আর তাই ভয় পেয়ে আর্ত চিৎকার করে উঠেছে একটা চামচিকে উঠোনের আকাশে।

ছোটটাকেই লিখেছে। বৃদ্ধের দু ঠোঁটে ব্যঙ্গ, আর তার কি ভাষা। দুঃখ, ক্ষোভ আর ঘৃণায় বৃদ্ধ যেন কেঁদেই ফেলবেন, সত্যি মাস্টার, অবাক করলে তোমরা। প্রেমের বেলায় শেয়ালের মতো ঠ্যাং-ঠ্যাং করে ছুটবে, অথচ বিয়ের কথা তুললেই পিঠটান। দুর্বল পদযুগলের একটি ভয়ঙ্কর আঘাত করলো স্যাঁত-স্যাঁতে দুর্বল মাটিকে, যত্তোসব স্কাউনড্রেলের দল ?

বাদুড়টা এবার পাইথনের আক্রমণে কাঁঠাল পাতার অরণ্যে ছটফট করে উঠলো। পাতার বিশ্রী আওয়াজটা অন্ধকারকে চমকে দিয়ে আবার নিথর হয়ে গেলো। আমি চারদিকে অবসাদ দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম, সে নিপুণ যাদুকরের মতো ধীরে-ধীরে আমাদের চারদিকে গভীর ও জমাট বেঁধে উঠছে। কিন্তু অকস্মাৎ আমাদের দুজনের মধ্যে দিয়ে একটি ভয়ঙ্কর ছুঁচো আর্তস্বরে ডেকে পালিয়ে যেতেই, বুঝলে, কতদিন থেকে একটা কথা ভাবছি, এই বলে বৃদ্ধ স্তব্ধতা ভাঙলেন এবং স্বগতোক্তির মতো আবার বলে উঠলেন, কাশেম মৌলভীর মেয়েটা সিনেমায় নামার পর থেকে কথাটা আমার মনে হয়েছে।

তিনি থামলেন। কাশলেন খুকখুক করে। গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর হিস-হিস করলেন আমার কানের কাছে, আমার মেয়ে দুটোর রূপ-যৌবন তো নেহাৎ মন্দ নয় মাস্টার। বরং একটু প্রাচুর্য আছে বলেই তো মনে হয়। তাছাড়া গান-বাজনাও তো নেহাৎ মন্দ জানে না ওরা। তা তুমি কি বলো ?

ভূতুরে গাছটা থেকে ধপ করে আছড়ে পড়লো সেই বাদুরটা। আমি চমকে উঠলাম। এবং কি বলতে চাইছেন, বুঝতে পারলাম না—এই বলে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলাম। কিন্তু তবু জিভ আর্দ্র হলো না।

বলছিলাম কি, আমার মেয়ে দুটোকেও সিনেমায় নামিয়ে দেবো। শত্রুপক্ষের গুপ্তচর বারুদঘরে আগুন লাগাবার পূর্ব মুহূর্তে আমার মুমূর্ষু কানের কাছে ষড়যন্ত্রের জাল বুনলো, একটা ছোকড়া ডাইরেকটার এসেছিল আমার কাছে। প্রজ্বলিত অগ্নি ধীরে-ধীরে অগ্রসর হচ্ছে বারুদ ভাণ্ডারে, আমার অতো নাক উঁচু স্বভাব নেই মাস্টার। প্রগতির যুগ এটা। তাছাড়া এটাও তো একটা আর্ট, মানে ফাইন আর্ট, হেঁহে। এতে

দোষের তো কিছু দেখি না আমি। প্রবল প্রচেষ্টায় গুপ্তচর হাসতে চাইছেন। কিন্তু শক্তি পাচ্ছেন না। হাসিটা তার বার-বার তাল কেটে ধসে পড়ছে, কি হে, তুমি চুপ করে আছো কেন? আমার দুর্বল কাঁধে নাড়া দিলেন, কিছু বল? দেশে যখন একটা মহৎ শিল্প গড়ে উঠতে চাইছে, তখন আমরা যদি সহযোগিতা না করি, হেঁ—হেঁ—হেঁ।

আগুন এবার বারুদ স্পর্শ করলো, আর তাতে করে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, প্রচণ্ড উত্তাপ এবং মৃত্যুর যন্ত্রণা। তাই আমার শরীর যন্ত্রণাকাতর পদযুগলকে, কার্যকর করে এই গলি থেকে, এই বাড়ী থেকে, এই অন্ধকার থেকে পালাতে চাইলো। কিন্তু গুপ্তচর আমার পেছনে হায়নার মতো ছুটে এলেন, এ কি, ওভাবে চললে কোথায়, শোন-শোন। হায়েনা আমার পেছনে তাড়া করেছেন, দাঁড়াও কথা আছে।

বলুন। আমি প্রচণ্ড প্রচেষ্টায় নিঃশ্বাস ধরে রেখেছি, একটা এনগেজমেণ্ট আছে আমার।

তাইতো। গুপ্তচর লজ্জা পেলেন, তোমার অনেক সময় নষ্ট করেছি। কিন্তু একটা কথা না বলে যে পারছি না মাষ্টার।

কি?

সাতটা টাকার জন্য আজ আবার তোমার কাছে আমায় হাত পাততে হচ্ছে। কুজো হয়ে আমার দুটো হাতই চেপে ধরলেন গুপ্তচর, যেন আরেকটু হলে তিনি আমার পা-ই জড়িয়ে ধরবেন।

ছাড়ুন। আমি এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করলাম, এভাবে হাত ধরবেন না।

প্লিজ, একটু দয়া করো। কথা দিচ্ছি, হাতে টাকা এলে সবার আগে আমি তোমার টাকাগুলো শোধ করবো। এবার তিনি কাঁদতে পারলেন, বিশ্বাস করো, আজ পনর দিন দোকানে কোনো কাজ পাই নি। অথচ এদিকে দু হপ্তার রেশন আনা হচ্ছে না। দুদিন ধরে বাড়ীতে তো সবাই উপোস। বল তো মাষ্টার, আমার এ দশা হবে কে জানতো? কে জানতো ওখান থেকে এভাবে বাজারটা সরে যাবে। অথচ নতুন জায়গায় দোকান দেবার আমার সাধ্যও নেই। নজরানাই লাগবে দশ হাজার টাকা।

আমার এই হাত, এই মুখ, এই নাক—সমস্ত শরীর আলোর আকাঙ্খায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে। তাই টর্পেডোর মতো হাতটা ছুটে গেছে পকেটের ভেতর, মুখ ঝড়ের মতো বলে উঠেছে, এই নিন, এই আছে, আর পা টলতে টলতে ছুটতে শুরু করেছে মৃতের মতো ঠাণ্ডা মাটির ওপর দিয়ে। তখন হাতের মুঠোয় শিকার পেয়ে উল্লাসে হেসে উঠলেন গরিলা। আমার পিঠের পেছনে সে উল্লাস-ধ্বনি বাতাস সচকিত করলো, যাও, শিগগির যাও। কোথায় যেন এনগেজমেণ্ট আছে বললে। আজকালকার ছেলেরা যা কুঁড়ো—

আমি ছুটছিলাম ভয়ঙ্করভাবে, ছুটছিলাম আলোর প্রত্যাশায়। কিন্তু আমি কোথাও আলো দেখতে পেলাম না। শুধু নষ্ট সিনেমার রিলের মতো শাঁ—শাঁ করে সরে যাচ্ছিল পুরনো প্রাচীর। সাদা চুনের ছিটে ফোঁটাতে মনে হচ্ছে ভূতের চোখ, এবং কৌতুকে নাচতে নাচতে তারা পেছনে সরে যাচ্ছিল। আমি বুঝতে পারলাম, আজ তাদের নারকীর উৎসব।

উঠোন শেষ, তিন ধাপের সিঁড়ি—বারান্দা—চৌকাঠ—-মেঝে, জমাট অন্ধকার। এরপর মেঝেটা পেরিয়ে গেলেই দরোজা, আর দরোজা খুললেই মুক্তি—

যাচ্ছো ?

আমি চমকে উঠলাম। আমার আর দরোজা খোলা হল না। আবার আমার সামনে প্রাচীর তৈরী হলো। এবং আমি পেছন ফিরে অন্ধকারে এ-বাড়ীর বড় মেয়েকে দেখতে পেলাম।

হুঁ। অন্ধকারের বুকে আর কোনো স্পন্দন নেই।

আচ্ছা। রাত্রির তমসার তরঙ্গেরা নিথর। বিদায় নেয়া হল। এবার আমি চলে যেতে পারবো বাইরের পৃথিবীতে। অন্ধকার হাতড়ে দরোজাটা খুলতে পারলেই ঘরের ভেতর আছড়ে পড়বে ল্যাম্প পোস্টের ধূসর আলো। আর তৎক্ষণাৎ দেখতে পাবো সেই চিরাচরিত স্যাঁতসেতে গলি, যা কিছুক্ষণ আগে আমার আগমনের পথ ছিল। এবার সেটা আমাকে ফিরিয়ে নেবে। এবং আমি এবার ছুটে গিয়ে দরোজাটা খুলে ফেলবো।

বড়দা তোমার কাছে আবার নালিশ করেছে, না?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। যেহেতু কোনো উত্তর নেই।

ভেনটিলেটারে ঢুকে পড়েছে চামচিকে। শনির চক্রের মতো ঘুরছে মাথার ওপর। এবং তার পাখার বিরক্তিকর আওয়াজটা আমাকে ধ্বংসের মতো অবক্ষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

বাবা তো আজ আবার তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। চামচিকেটা কড়িকাঠে ঝুলে গেছে। ঘরটা এবার মৃত্যুর মতো স্তব্ধ।

এ টাকা এরা কোনোদিন শুধতে পারবে বলে মনে করেছো তুমি? যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছে এ বাড়ীর বড় মেয়ের করুণ কণ্ঠস্বর। এবং যন্ত্রণা সংক্রামক। তাই আমিও এ যন্ত্রণায় শোচনীয়ভাবে সংক্রামিত হয়ে গেলাম। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছে এ-বাড়ীর বড় মেয়ের করুণ কণ্ঠস্বর।

আমার চারপাশের বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। আমি বুঝতে পারলাম, এ-ঘরের মাটির নিচে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়ে গেছে। বাতাসের হাজার অম্লকোয়াণ্টাসের মতোই ছিটকে পড়ে আমার সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে।

বাবা আর যেন কি বললো। এবার সে আর্তনাদ করলো, আমাদের সিনেমায় নামতে হবে?

কথা শেষ হলো না। হঠাৎ আমি ক্ষ্যাপার মতো ছুটতে শুরু করেছি। আমার উপমা আমি আবিষ্কার করলাম এভাবে, হীন কাপুরুষ রাজা শহর-প্রাচীরের ওপারে অত্যাচারী রাজার কামানের আওয়াজ শুনে আতঙ্কে প্রাচীন প্রাসাদ ছেড়ে পালাচ্ছে। আমি এবার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। এবং প্রথম প্রচেষ্টায় খুলে ফেললাম কপাট।

দাঁড়াও।

কেন? অন্ধকারে তাকে খুঁজলাম। কিন্তু শরীর নয়, শুধু তার চিবুকটিকেই দেখতে পেলাম। অন্ধকারের বুক চিরে একটা ধূসর আলোর রশ্মি বর্শার মতো আছড়ে এসে পড়েছে এ বাড়ীর বড় মেয়ের চিবুকের

# দূরদৃষ্টি

**জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত**

মানুষ কখনো ত্রিকালদর্শী নয়। এমন কি, পণ্ডিতগণ বলে থাকেন জীবন পদ্ম-পত্রে নীরবৎ। অতএব মাত্র মূহূর্তেক পরে কি ঘটবে তা-ও বলতে পারো না। অথচ তারুণ্যের ধর্ম এ নয় যে সে বসে বসে ভবিষ্যতের হিসাব পেতে রাখবে তারপর সেই ছককাটা ঘরে পা ফেলে স্বর্গগামী হবে।

পাঠাভ্যাস, জীবিকা নির্ণয়, অন্নসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রচুর বিবেচনা ব্যয় করা হলেও বিশেষ কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবেগ অস্থিরতা প্রভৃতিই প্রধান হয়ে থাকে। যতোই কোনো না উপদেশ বর্ষণ করা হোক, অনুশাসনের গণ্ডী আঁকা হোক, তরুণ মন সে সব মানবে না।

কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এমনি ঘটলো না। আমি যেনো বা বদ্ধপরিকর ছিলাম যে, সুবিবেচনা, দূরদৃষ্টি, স্থির চিন্তা, আবেগ বর্জিত সিদ্ধান্ত প্রভৃতিকে আমায় বজায় রাখতেই হবে। এবং সেই জন্যেই পঁচিশোর্ধ আমি—শিক্ষিত, সুদর্শন স্বাস্থ্যবান যুবক, কিছুতেই হৃদয় দৌর্বল্যকে প্রশ্রয় দিতে পারছি না। অথচ তীব্র আকাঙ্ক্ষার দহনে দগ্ধ হচ্ছি।

ঠিক স্মরণ নেই, কখন কিভাবে আমার মধ্যে এই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। কোনো বিশেষ রমণীর জন্যে বাসনা এত তীব্র হয় যে, রাজসিংহাসন অক্লেশে বর্জন করা যায়, আমি শুনেছিলাম। কেবল শোনাই মাত্র। নিজ জীবনে কখনো এই তথ্যকে সত্য মানবো এমন ভাবিনি। অথচ আমার সমস্ত চিন্তা, সিদ্ধান্ত, দৃঢ়তার মূলে অলক্ষ্যে কে কুঠারাঘাত করেছে এক সময় আর দেখছি আমিও এক বিশেষ রমণীর জন্যে দাহক বাসনার দাস হয়েছি। এ-ও লক্ষ্য করেছি। সেই রমণীরও আমার ইচ্ছায় সানন্দ সম্মতি জানাতে দ্বিধা করে না।

কিন্তু আমার পারিবারিক অভিজ্ঞতা, দুঃসময় অতীত এবং সীমাবদ্ধ ক্ষমতা যে কোনরকম তীব্র আবেগের পরিপন্থী।

অতি শৈশবেই আমি বুঝেছিলাম, আর আর সমবয়েসীরা যেমনভাবে দিন কাটাচ্ছে, বড়ো হ'য়ে উঠেছে, আমার জন্যে তেমন কিছু নির্দিষ্ট নেই অবশ্য বালসুলভ খেলাধূলা খেয়াল খুশি ইত্যাদি যে একেবারে করিনি। এমন নয়, তবে সবকিছুর আড়ালে স্বাতন্ত্র্য ছিল। আমি বুঝেছিলাম আমি বড়ো অসহায়—আমি এবং মা। কেবল টাকা পয়সার নয়। সহানুভূতি, ভালবাসা সবকিছুরই অভাব আমাদের পর্বত প্রমান ছিলো।

সেই বয়সেই আমি জেনেছিলাম, মা ছাড়া আপনার জন কেউ আর নেই। মাতুলালয়ে মানুষ হলেই যে সর্বব্যাপী রিক্ততায় চরাচর ভরে যাবে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু দৃঢ় মনোবল, আত্মমর্যাদা ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী কোনো নারী যদি স্বেচ্ছায় স্বামী সংগ পরিত্যাগ করে আসে, আপন ব্যক্তিত্বকে ভুলতে না পেরে কোনো নারী যদি পরবর্তী সমস্ত জীবনে সেই স্বামীর মুখদর্শন না করতে চায়, তাহলে অন্ততঃ আমাদের দেশে তার জন্য গুটি-কতক সজ্জন ব্যতীত আর কোন শুভানুধ্যায়ী থাকে না।

মাতামহের কাছ থেকে আমার মা উত্তরাধিকার সূত্রে যে মনোবল মর্যাদাজ্ঞান ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্ববোধ লাভ করেছিলেন মাতুলের মধ্যে তা তেমন প্রস্ফুট হয়নি। সেইজন্যই কেবল মাতামহের দেওয়া কিছু সম্পত্তি ও মাতুলের নিরাশক্তি সম্বল করেই আমার মা জীবন কাটাতে শুরু করেছিলেন। অবশ্য মামারও এমন কিছু সঙ্গতি ছিল না যার ব্যয়ে তিনি আমাদের পরম সহায়ক হতে পারতেন। তবুও আমাদের দিন কাটতো। আমি জেনেছিলাম, পরিপূর্ণ যৌবনকালেই মা একাকী হয়েছিলেন। আমার পিতা, যাঁর মুখাবয়বও এখন আমি স্মরণে আনতে পারি না, অন্ততঃ এটুকু আত্মজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যার বলে তিনি আমাকে মা-র কোল থেকে সরিয়ে নেননি। সম্ভবতঃ পরবর্তী বিবাহিত জীবনে আমার অনুপস্থিতি তাঁর কাম্যও ছিলো। যাই হোক, নিঃসঙ্গ জীবনে আমিই আমার মার একমাত্র সঙ্গী ছিলাম। একথা আমি বলবো না যে, তিনি আবার বিবাহ না-করার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। অতো কৃতঘ্ন আমি হতে পারবো না। বরং পরিণত বয়সে আমি ভাবতাম, যদি সেই কালে আমার সমস্ত ব্যাপার বুঝবার ক্ষমতা থাকতো তাহলে স্বেচ্ছায়

তাঁকে সুখী করার দায়িত্ব নিতাম। যে-কালে সেই জ্ঞান আমার হ'লো তখন আর কিছু করার ছিলো না।

পাছে এইসব ভেবে আমি কষ্ট পাই এবং নিজেকে অপরাধী মনে করি সেইজন্য সেই পরম বিবেচক, সম্মানী মহিলা,—আমার মা, বুঝবার মতো ক্ষমতা হবার পরই আমায় জানিয়েছিলেন যে, আসলে আমার জন্যে তাঁর ত্যাগ স্বীকার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বিশুদ্ধভাবে নিজের জন্যে এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। আমি বরং তাঁর উপকারই করেছি বাকী জীবনের সঙ্গী হিসাবে। ঠিক সর্বজয়ার মতোন করে তিনি আমায় মানুষ করেননি এতো দেখাই যাচ্ছে। এবং আমারও ইচ্ছা ছিলো না যে এককালে অপুর মতোনই আমি তাঁকে নিশ্চিন্তপুরের কুঁড়ে ঘরে একলা ফেলে যাবো। তবুও ম্যাট্রিক পাশ করবার পর আরো বড়ো শহরে না যেয়ে উপায় ছিলো না। অপুর সঙ্গে আমার তফাৎ হলো এই, আমার বয়স বাড়ার সঙ্গে মামা আমাদের দু'জনের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। এবং শহরে যাবার আগে মামার দ্বিধাহীন বিশ্বাস ছিলো পুত্রের অবর্তমানে মামা তার ভগ্নীর কোনোরকম অসুবিধা ঘটতে দেবেন না।

শহরে যাবার আগে মা আমার হাতে জনৈক অধ্যাপক চৌধুরীর নামে একখানা চিঠি—তাঁর ঠিকানাসহ, দিয়েছিলেন। সারা জীবনে যিনি কারো কাছে সামান্যতম করুণা প্রার্থনা করেন নি, কেনো জানি না কয়েক ছত্র লেখার মধ্য দিয়ে আপন পুত্রের শুভাশুভ অপরের হস্তে ন্যস্ত করলেন। তবে জানতাম, অধ্যাপক চৌধুরী এই শহরের অধিবাসী ছিলেন এককালে। বড়ো শহরে অধ্যাপক চৌধুরীকে খুঁজে পেতে আমার মোটেই কষ্ট করতে হয়নি। তাঁরই সুচারু ব্যবস্থায় অন্যান্য সমস্যাও আমার কাছে অনেক সহজ হয়ে এসেছিলো। প্রকৃতপক্ষে উচ্চশিক্ষার জীবনে অধ্যাপক চৌধুরী আমার সঙ্গে এতো ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন যে, বয়সের অসমতা সত্ত্বেও তাকে আমার পরম বন্ধু বলে ভাবতে ইচ্ছা করে। আমি অসংকোচে এবং কোনোরকম গ্লানি বোধ না করে বলতে পারি, তিনি না থাকলে আমার পক্ষে আদৌ কোনো পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হতো না। তাঁর সঙ্গে আমার দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক কোনোদিনই গড়ে ওঠেনি। কেবল তাঁর উপদেশ,

নির্দেশ প্রচেষ্টা ইত্যাদি সম্বল করেই আমি যেহেতু সমস্ত পথ পাড়ি দিয়েছি, সেই জন্যেই আমাদের সম্পর্কে কোনো গ্লানিমার ঠাঁই রইলো না।

অতএব আমি সমগ্র জীবনে আমার মা ও অধ্যাপক চৌধুরী এই দুজনের প্রিয় থাকার সংকল্প গ্রহণ বরেছিলাম। কোনো হঠকারী চিন্তা, চিত্তদৌর্বল্য প্রভৃতিকে স্থান দিয়ে আমি এঁদের মনোবেদনার কারণ হতে চাইনি। এবং এইজন্যেই প্রিয়-রমণীর প্রসঙ্গে আমি এত দ্বিধান্বিত। আমি নিজেকে কখনো অসাধারণ ভাবতে পারিনি। অধ্যাপক চৌধুরী আমায় শিখিয়েছেন, তোমার চিন্তা কাজ, আকাঙ্ক্ষা, দ্বিধা এ সমস্ত যে একান্তভাবে তোমারই একথা ভেবো না। তুমি বলতে পারো না, তোমার আগে--তোমারই পথে ভ্রমণ করে আরো কতজন যন্ত্রণা অথবা আনন্দ অনুভব করেছেন।

এই সমস্ত কথাই আমি প্রিয়তমাকে বোঝাচ্ছিলাম। আপাতত যদিও সে আমার সামনেই বসে আছে কিন্তু আমি জানি, এই দিন এবং এই সান্নিধ্য বহু বিলম্বিত করা যাবে না। আর করা যাবে না এই কথা ভাবতেই আর্ত বেদনায় সমস্ত শরীরে ভয়ঙ্কর অসুস্থতা অনুভূত হতে থাকে।

তবুও আমি ওকে বললাম, দেখো আজ আমরা মনে করছি আমাদের দুজনের সম্মিলিত পৃথিবী সর্বোত্তম সুখের স্থান হবে। কিন্তু তুমিও জানো না, আমিও বলতে পারবো না, সেই সুখ কতকাল স্থায়ী হবে। এমনো তো হতে পারে যে, ক্ষণজীবী সুখকাল অতিক্রান্ত হবার পরে তুমি আমাকে অথবা আমি তোমাকে ঘৃণা করতে শিখবো। তোমার আরো আলাপী আছে, আমারও অনেক আলাপিতা আছে তাই কোনো সময়ে আমরাতো ভাবতেও পারি, এ না হয়ে অমুক যদি আমার জীবনে আসতো তাহলে জীবনের চেহারাটা পালটে যেতো। তখন সর্বাপেক্ষা বেশী যাকে ভালোবাসা যাচ্ছে সেই হবে আমাদের চোখে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত। অতো বড়ো কদর্যতার মুখোমুখি হতে আমরা কেউই পারবো না। সেইজন্যে বরং আমাদের পরিচয়কে অস্বীকার করাই শ্রেয়। আমরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কাউকে নয়, সামাজিক পথে যে কাছে আসবে তাকেই বরণ করে নেবো। আমি সমস্ত কথা শেষ করে সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে মুখ ঢাকবার চেষ্টা করলাম। কারণ এইসব সময়ে নিজেকে কেমন অপরাধী আর দুর্বল বলে মনে হয়।

ও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো তারপর আমার চোখে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলো। গ্লাসের পানীয়ে আঙ্গুল ডুবিয়ে নানারকম নক্সা আঁকলো কিছুক্ষণ টেবিলের রঙ্গিন কাপড়ে। তারপর নিশ্বাস মুক্ত করে বললো, তুমি বড়ো বেশী সামনের দিকে চেয়ে আছো। অতো দূরে মানুষের দৃষ্টি যায় না।

আমি বললাম, কিন্তু হাতের কাছে যে আছে তাই কি তুমি নিঃসংশয়ে হৃদয়ে ধারণ করতে পারো?

এবারে ও আর কোনোরকম বিচলিত ভাব দেখালো না, শেষ কথা বললো, তা ঠিক। তবু সব শেষের কথা হচ্ছে আমরা পরস্পরকে ভালবাসি যার দাম আপাততঃ অনেক। তুমি সব কিছু আবার ভেবে দেখো। বলে সেদিনের মতো নিজের পথে চলে গেলো।

তুমি তো আমায় ভাবতে বলে গেলে এখন নূতন করে আমি কি ভাববো? এ-পিঠ ও-পিঠ দু-পিঠই আমি ভালো করে দেখেছি। তোমায়ও বলেছি, এখন আবার কি করা যায়?

আমার আর ভাবনা করবার ক্ষমতা ছিলো না বলে আর একজনের কাঁধে এই দায়িত্ব চাপানো স্থির করলাম। অধ্যাপক চৌধুরীর অজ্ঞাতে কোনো কিছু করবার প্রয়োজন কখনো দেখা দেয় নি। মনোবাসিনী মহিলার সম্পর্কে তাঁকে আমি বলেছি। কেবল তাঁকে নিয়ে আমার ভাবনার কথাগুলো এখনো গোপন রয়ে গেছে অবশ্য আমি তাঁর পরামর্শ চাইনি বলেই তিনি তাঁর মতামত আমায় জানান নি, একথা বলাই বাহুল্য।

আমি যখন পৌঁছলাম অকৃতদার, প্রৌঢ় অধ্যাপক তখনো প্রায়ন্ধকার ঘরে বাতি জ্বালান নি। টেবিলের সামনে চুপ করে বসেছিলেন। ওঁর নিশ্চয়ই স্মৃতির সায়র আছে, এমন সময় সেখানেই তিনি ডুবে যান বলে আমার বিশ্বাস। এই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে বিষণ্ণ আবহাওয়াকে বিষণ্ণতর করে তুলতে চাইছিলাম না। সেজন্যে পিছন দিকের দরজা দিয়ে বাড়ীর ভিতরে ঢুকলাম। রান্নাঘরের আলো এবং উনুন উভয়ই জ্বলছিলো। পাচকের সঙ্গে বিভিন্ন রকম কথাবার্তায় সময় কাটাতে চেষ্টা করলাম।

তিনি বোধহয় আমার গলার স্বর শুনতে পেয়েছিলেন। একটু পরে

উঠে ভিতরে এসে এখানে সেখানে কয়েকটা আলো জ্বালালেন। তারপর আমার সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালেন। আমিও হাসিতেই জবাব দিয়ে বললাম, খুব গম্ভীর কিছু ভাবছিলেন নিশ্চয় ?

কি করে বুঝলে ?

এ-সময়ে আপনি লেখাপড়া করেন না, আমি জানি।

হুঁ ঠিকই। ভাবছিলাম, বুঝলে, মানুষ কি বিচিত্র, কেউ কামনার উদ্দামতায় কাম্যকে জোর করে আয়ত্ত করে, কেউ বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে তাকে আত্মস্থ করে, আবার কেউ কেবল বাসনার নির্বাসন, কেবল স্বার্থত্যাগ, কেবল মঙ্গলেচ্ছা নিয়েই বেঁচে থাকে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আপনার জন্যে এসব তো খুব জটিল সমস্যা নয়, তাছাড়া আমি আজ মানব-চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি। বরং মানবজীবন সম্পর্কে কিছু গভীর তথ্য আলোচনা করবার আছে।

তাঁর সঙ্গে আবার আমি বসবার ঘরে গেলাম। তারপর সাধ্যানুযায়ী গুছিয়ে সব কথা ও সমস্যা তাকে বলবার চেষ্টা করলাম। শেষে তাঁর কি ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত জানতে চাইলাম। কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করলাম একটু আগের সেই হাসি, আর ওষ্ঠ প্রান্তে নেই। অকস্মাৎ ক্লান্ত, অস্থির ও গম্ভীর দেখাচ্ছিলো তাঁকে। মুখমণ্ডলে কয়েকটি কঠিন, ভারাক্রান্ত রেখা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছিলো। আসন ছেড়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। আমি নিস্তব্ধ, অনড় হয়ে বসে রইলাম। তিনি যে উত্তেজিত তা তাঁর আচরণ থেকেও বুঝা যাচ্ছিলো। এইরকম উত্তেজনা তার মধ্যে আমি খুব বেশী লক্ষ্য করিনি। প্রথম সাক্ষাতের দিন সম্ভবতঃ তিনি এর চেয়েও বেশী বিচলিত হয়েছিলেন কিন্তু আমার বয়স ও তার চেষ্টা সেই ভাবকে প্রকট করে তোলেনি।

একটু পরে তিনি বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন। কিছু সময় আমি তেমনি বসে থাকলাম। তারপর উঠে ধীরে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বারান্দার আলোটা জ্বালা ছিলো না বলে সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে তাঁকে এক মহান্ মূর্তির মতো দেখা যাচ্ছিলো।

ফিরে তাকালেন না তিনি, বললেন, তাহলে তুমি ভাবছো ওকে তোমার জীবনের সাথে না জড়ানোই ভালো হবে ?

হ্যাঁ, ভাবছি। তবে,—বলে আমি চুপ করে থাকলাম।

তাঁর নিশ্বাস পতনের শব্দ একটু দ্রুত শোনা যাচ্ছিলো, বললেন, তোমার মনে হচ্ছে না যে, যা করতে চাইছো তেমন আর কেউ করে না অথবা তুমি অনন্য, একক ?

দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, না, তেমন ভাবি না। আপনার কাছে জেনেছি, আরো অনেকে একই পথে হেঁটে গেছেন যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয়ে।

কেননা, তাঁরা কেউ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নন বলে—আবার তিনি হাঁটতে লাগলেন বারান্দার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। মনে হলো কথা বলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। একবার জোর করে গলায় শব্দ তুললেন। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, এমন মনে হচ্ছে না যে এই সিদ্ধান্ত ভুলও হতে পারে ?

ততোক্ষণে তাঁর আবেগ আমাকেও স্পর্শ করেছে, জবাব দিতে গিয়ে আমারও গলার স্বর বিকৃত হয়ে গেলো। বহুদিনে আয়ত্ত করা স্থির চেতনা আর কিছুকে বজায় রাখা যাচ্ছিলো না, বললাম, ভাবছি এমনো তো হতে পারে যে অল্পকাল পরে আমরা বুঝবো—

তিনি আমার মুখ থেকে কথা তুলে নিয়ে বললেন, যা ভাবা গিয়েছিলো তা হয়নি। কিসের শূন্যতা দিগন্ত বিস্তারী। আর তখন—এইখানে তিনি প্রাণপণে গলার স্বরকে সহজ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, আর তখন আপনাপন মূঢ়তাজনিত পরস্পরের প্রতি অভিমান সমস্ত জীবনের পরম দুঃখ বলে বিবেচিত হবে। সমস্ত সংসারকে উপেক্ষা করে সে হবে নিঃসঙ্গ নির্বাসিতা, আর তুমি—

তিনি কথা শেষ করতে পারলেন না, শেষ করা সম্ভবও ছিলো না, তাই আমিই সজল আবেগে, রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, আমি সারাজীবন নিয়তির মতো তাকে ভালোবেসে যাবো।

আর সেই ভালোবাসার প্রমাণ দেবার জন্যে অনেককাল তোমায় অপেক্ষা করতে হবে, যতোদিন না সেই সামান্য অনুরোধের সুযোগ—

বলতে বলতে তিনি তাড়াতাড়ি বারান্দা ছেড়ে বাগানে গেলেন।

# মন-গহন

## কাজী আবুল হোসেন

সমর্তভান এ গল্পের নায়িকা হওয়ার জন্য অপরাহ্নের স্তিমিত আলোয় কলসী কাঁখে ক'রে দীঘির পারে আসেনি সত্য। এসেছিল সে তার নিজেরই প্রয়োজনে। বৈঁচি কাঁটা ও বাবলা বনের ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল অস্তায়মান সূর্যরশ্মির ঝিলিমিলি। মাঠের উদাস চৈতি হাওয়া মাঝে মাঝে নাড়া দিয়ে যাচ্ছিল, গাছ-গাছালির শাখা পাতায়। এ সময় মনটা এমনি উদাস থাকে। সমর্তভানের মনেও কেমন একটা ঔদাসীন্যের ছোঁওয়া লেগেছিল যেন। কুব্—কুব্, কুব্, কুব্ ক'রে একটা পাখি ডুকরে কাঁদছিল বনের কোন্ গভীরে মুখ লুকিয়ে। হয়তো সে তার নিঃসঙ্গতার বেদনা প্রচার ক'রে চলেছিল পৃথিবীর সামনে।

কিন্তু সমর্তভানের ব্যথা কিসের? কাজল গাঁয়ের শাহাদৎ মোড়লের একমাত্র কন্যা সে। সুন্দরী, সুঠাম, গ্রামের পাঠশালার তিন, চার কেলাস পড়া মেয়ে। চিঠি লিখতে পারে, পড়তেও পারে। পাকা পুঁই ফলের মত দু'খানা পাতলা ঠোঁট। সারা অঙ্গে যৌবন তোরণে প্রবেশের পাস্‌পোর্ট। লাবণ্য তো বটেই। রসে টইটুম্বুর পাকা পীচ ফলের মত। রংটা ফর্সা। চোখ দু'টো তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল। একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে চেহারায়। এ হেন সমর্তভানের দুঃখ বা ব্যথার কি কারণ থাকতে পারে?

এই দৃশ্য-নাট্যের অপর অংক অভিনয় করছিল মনসুর।

একটা ছিপ হাতে ক'রে খুব মনোযোগ দিয়ে কালো দীঘির পানির দিকে লক্ষ্য ক'রে দস্তুরমত মাছ ধরার অনুশীলন করছিল সে। দৃষ্টি তারও লুকোচুরি খেলছিল—এ-দিক ও-দিক।

কাজল গাঁয়ের পাশের গাঁয়েই তার বাড়ী। বাপ রইসউদ্দীন মুনশী রাস-ভারী লোক। পুরনো দিনের আরবী পারশী পড়া ও অত্যন্ত পরহেজগার। একালের ন্যাকামো প্যান প্যানানির ধার ধারেন না! ছেলে মনসুর গাঁয়ের

স্কুলে ডিগবাজী খেতে খেতে ক্লাস এইট্ পর্যন্ত গিয়েছিল—তারপর বাপই তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আরবী-পারশী পড়ানো মনস্থ করলেন। কিন্তু প্রায় সময়ই মনসুর আত্মগোপন ক'রে চলার দরুণ তিনি তার প্রতি যে কতদূর প্রসন্ন ছিলেন, তা সকলেরই বুঝতে পারা উচিত।

শূন্য কলসী কাঁখে শরবনের আড়াল দিয়ে নীরবে এসে দাঁড়ালো সমর্তভান তার পিছনে—বলেছিলে কথাটা?

বড়শী ফেলে উঠে দাঁড়ায় মনসুর। তার কণ্ঠে মিনতির স্বর : আমার সাহস হয় না, সমর্ত।

—কেন সাহস হয় না,—তুমি মরদ না?

—মরদ কি না-মরদ একবার তুমি হুকুম কর, এই দীঘির পানিতে ডুবে মরি। কিন্তু আব্বার কাছে কোন কথা বলার মত সাহস আমার নেই।

সমর্তভান কাঁখের কলসীটা নীচেয় নামিয়ে রেখে বলে : ভালোই হলো। এদিকে পরশু আমাকে দেখতে আসছে। এখনও তুমি চুপ ক'রে মাছ ধরো।

মনসুরের গলাটা ধ'রে আসে। অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ ক'রে সে বলে : তার আগেই চলো না একদিকে চলে যাই।

সাঁজের আঁধার ঘন হয়ে আসছে। দীঘির পানিতে পড়েছে একটা ছায়া। সমর্তভানের দুটো চোখ দেখা যায় অস্পষ্টভাবে। সেখানে অলিখিত ঘৃণা, অবজ্ঞা! সে কঠোর স্বরে বলে : মানুষের সামনে বুক উঁচু ক'রে দাঁড়াবার মুরোদ যার নেই,—তারই সাথে চোর-দরজা দিয়ে পালিয়ে যাবো? তার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়াও ঢের ভালো।

কোন কথা বলে না মনসুর। সবকিছু তার বেতালা হয়ে যায়। একমাত্র বাপকে ছাড়া আর কাউকে সে ভয় করে না দুনিয়ায়। তার মনের এই অসহায় অবস্থাটা কেন বুঝতে পারে না সমর্তভান। একটা নিঃশব্দ মুহূর্ত ঘুরপাক খেয়ে হারিয়ে যায়।

সমর্তভানই আবার বলে : তা'হলে এই তোমার শেষ কথা?

মনসুর এবার গম্ভীর হয়ে বলে : আমার শেষ কথা কোন দিনই শেষ হবে না সমর্ত।

সমর্তভান বলে ঃ তোমার ওসব ঘোর-প্যাঁচের কথা রেখে দাও। সোজা কথায়, তুমি আমাকে চাও না।

মনসুর বলে ঃ চাওয়া আর পাওয়া এক কথা নয়। তবে আমার সারা দেহ, সারা মন দিয়ে একমাত্র কামনার বস্তু তুমি।

জলতরংগ বাজনার শব্দের মত একটু হাসলো সমর্তভান,—

—কথার যাদুকর। কথা দিয়েই এতদিন ভুলিয়ে রেখেছিলে। আজ সে সব আর ঢাকা রইলো না।

মনসুর সমর্তভানের হাত দুটো জড়িয়ে ধ'রে দীন ভিখারীর মত বলে ঃ আমাকে ভুল বুঝো না সমর্ত। আর যাই বলো,—আমাকে মিথ্যেবাদী বলো না।

সমর্তভান গোধুলির আঁধারের দিকে তাকিয়ে বলে ঃ হয়তো আমারই ভুল হয়েছে।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যায় সমর্তভান।

মনসুরের বুকের ভিতর তোলপাড় করে। মনে হয় চীৎকার ক'রে কাঁদে। চুপ ক'রে অনেকক্ষণ ব'সে থাকে সে অন্ধকারে বুনো জন্তুর মতো। দীঘির ধারে ধারে ব্যাঙগুলি বিচিত্র শব্দে মুখর ক'রে তোলে চারদিক। ঝিল্লীর একঘেয়ে শব্দ কানে আসে। আকাশের অসংখ্য তারা এই মাত্র মেঘের ওড়না সরিয়ে প্রকটিত হলো। জোর বাতাসের শব্দ শোনা যায় গাছের শাখায় পাতায়। মনসুরের মনে হয় ও যেন সমর্তভানের রোষের গর্জন।

বড়শীটা হাতে ক'রে বেশ খানিকটা রাতে ফিরলো মনসুর। বাড়ীর সামনে পিটুলী গাছটার গোড়ায় এসে একটু থমকে দাঁড়ালো। বাপ নিশ্চয় এখন বাড়ীতে। কোনক্রমে তাঁর সামনে পড়লে আর—

---কে রে ওখানে ?

পরিষ্কার রইসউদ্দীন মুনসীর কণ্ঠস্বর।

কি করবে মনসুর, ভেবে পায় না। দৌড়ে পালিয়ে যাবে না আত্মপ্রকাশ করবে ? বাপের গলার আওয়াজ শুনেই তার পা দু'টো যেন পাথরের মত ভারী হয়ে গেছে। ছিপটা হাত থেকে খসে পড়েছে। এক

পা দু'পা ক'রে এগিয়ে আসেন রইসউদ্দীন মুনশী। একেবারে কাছে এসে ধমকে ওঠেন: কথা বলছিস্ না কেন? কে তুই?

মনসুর বিকৃত স্বরে বলে: আমি,—মনসুর।

রইসউদ্দীন মুনশী ভূত দেখার মত বিস্ময় বোধ করেন। তিনি বলেন: তুই এখানে কেন? কি করছিস? মনসুর আমতা আমতা ক'রে বলতে চায় কিছু, কিন্তু তার সব ছাপিয়ে উঠে রইসউদ্দীন মুনশীর তর্জন: তুই আমার ছেলে হ'য়ে এমন কেন হলি? আমার নাম ডুবাতে চা'স? চল্, আজ তোর কাছে সব কথা শুনবো,—কেন তুই লেখাপড়া করলি নে,—কি চাস্ তুই? রাত্রি বেলায় বাইরে বাইরে কেন ঘুরিস? মন্থর পায়ে মনসুর বাড়ীর মধ্যে যায়।

রইসউদ্দীন মুনশী কঠিন লোক। তিনি সহজে ছাড়েন না ছেলেকে। কাঠগড়ার আসামীর মত দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করেন একের পর এক।

কিন্তু তাঁর সব ধমকানী প্রতিধ্বনি হ'য়ে ফিরে আসে। মনসুর কোন কথারই জবাব দেয় না। মুনশী সাহেব অসহ্য ক্রোধে ফেটে পড়েন।

এগিয়ে আসেন মুনশী-গিন্নী। ছেলেকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলেন: ছেলে এখন বড়ো হয়েছে না? তার গায় হাত তুলতে গেলে ভাবতে হয়।

হঠাৎ যেন মুনশী-গিন্নী ঠাস ক'রে মুনশী সাহেবের গালে চড় মেরে দিলেন।

মুনশী সাহেবের গলাও সহসা খাদে নেমে আসে। বিকৃত একটা গুঙানীর আওয়াজ বের হয় তাঁর কণ্ঠ থেকে: তুমিই মাথা খেয়েছো, আস্পর্দা দিয়ে।

মুনশী-গিন্নী বলেন: আস্পর্দা দিয়ে নয়,—তোমার শাসনই ওকে দিন দিন অমন ক'রে তুলেছে। নইলে যে ছেলের দাড়ি মোচ্ বেরিয়েছে, তাকে কোন আক্কেলে শাসন কর শুনি?—

মুনশী রইসউদ্দীন আর দেরী না ক'রে সরে যান সেখান থেকে। সত্যিই মনসুর এখন সেয়ানা হ'য়ে উঠেছে। দাড়ি কামায় বলে—

ছেলেমানুষ মনে হয়। যদি দাড়ি রাখতো তবে মস্ত বড় এক ব্যাটা'ই হ'য়ে যেতো।

কলসী কাঁখে বাড়ী ফিরে এসে সমর্তভান চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে ব'সে রইলো। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়লো, তখন সে প্রদীপ জ্বালিয়ে উঠে বসে, পুরনো টিনের তোরঙ খুলে একটা পুঁটলী বে'র করলো। পুঁটলীর ভিতর থেকে বেরোল একগাদা কাগজ। অনেক দিনের পুরনো যে কাগজ, তা' লালচে হ'য়ে গেছে। এক এক ক'রে নেড়েচেড়ে দেখে সে কাগজগুলি। মনসুরের লেখা ছোট বড় নানা সাইজের চিঠি। এই চিঠির প্রতিটি কথা সে এতদিন সত্য জেনে তাদের বুকে ক'রে আগলে রেখেছে!···কিন্তু আজ সে কি দেখলো মনসুরের চোখে মুখে? চিঠির ছত্রে ছত্রে সে যে ভালবাসার মধু ছিটিয়েছে—সে ভালোবাসার স্বরূপ কি এই? মুখ ফুটে মনের কথাটা বল'তে সাহস পায় না। এমনি এক না-মরদাকে সে মন দিয়ে ব'সে আছে? একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে সে কাগজগুলির উপর ধরলো। এ মিথ্যে।—মিথ্যেকে আর সে পুষে রাখবে না বুকের পিঞ্জরায়।—যদি তার মনের আকাশে নতুন রংধনুর উদয় হয়,—তবে মনের জঞ্জাল সাফ করে রাখাই ভালো। প্রদীপ নিবিয়ে আবার শুয়ে পড়লো সমর্তভান। বালিশের উপর গড়িয়ে পড়লো তার চোখের পানি। না, এ অন্ধকারে কেউ দেখবে না তার এ চোখের পানি।··

শাহাদৎ মোড়লের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল যথাযোগ্য আড়ম্বরের সাথে। আশ-পাশের অনেক গ্রামের লোক, ফকীর-বোষ্টম সবাই তুষ্টমনে ভুরিভোজন করে ফিরে গেল। বর স্বাস্থ্যবান, সুন্দর—তবে অশিক্ষিত। কোনদিন বইপত্রের ধারে কাছেও যায় নি। অবারিত মাঠ আর লাঙল বলদ-এদেরই সে চিনতো। মোড়ল গর্বভরে বললো: আমার মেয়ে লেখাপড়া জানে, তাকে দিয়ে ঢেঁকি আর গোবর ছড়ার কাজ চলবে না।

বরপক্ষের লোকও তেমনিভাবে বলে: আমাদের ঘরের মেয়েরা কোন দিনই ওসব কাজ করে না। ওর জন্যে আলাদা লোক আছে।

তবে আর কথা কি? মেয়ের জন্য ঐ ভাবনাই ছিল শাহাদৎ মোড়লের।

সমর্তভান নির্বিকার। এ বিয়েতে তার যেমন আগ্রহও নেই, তেমন অনাগ্রহও নেই। সবই কলের পুতুলের মত করে। পাড়ার সখি-সাথীদের সুনসুড়ীতে একটু-আধটু হাসেও। সত্যিই রহস্যময়ী সমর্তভান। মনসুরের কথা কি সে ভুলে গেছে? সেদিন তার চিঠির গোছা জ্বালিয়ে দেওয়ার সংগে সংগেই কি সব কিছুর অবসান ঘটেছে?

তবে আবার তার মনের মধ্যে উঁকি দেয় কেন, মনসুরের অসহায় কাতর মুখ: আমাকে ভুল বুঝো না সমর্ত।

কানের পাশে এখনো যেন গুঞ্জন তুলছে কথা কয়টি। করুণা হয় সমর্তভানের লোকটার প্রতি। এত চিঠি লেখালেখির পরও সে কেমন ক'রে নেতিয়ে পড়লো? সাহস করে বুক ঠুকে বলতে পারলো না, আমি সমর্তকে ভালোবাসি। তাকে না পেলে বাঁচবো না।

পরক্ষণেই তার মনে হয়,—এ সবই তার মুখের কথা। মন দিয়ে সে কোন দিন তাকে ভালোবাসতে পারেনি। প্রতারণা করেছে তাকে। একটা কান্নার উচ্ছ্বাস ছলছলিয়ে উঠে। সমর্তভান কাঁদে। সবাই দেখে তার কান্না। মা, খালা, চাচি, ফুফু সবাই চিনে বিয়ের দিনের এ কান্নাটুকু। কেউ নিষেধ করে না, সন্দেহও করে না। সবার মুখেই সান্ত্বনা ও সমবেদনার কথা। এবার সমর্তভানের নিজের উপরই রাগ হয়। তার সমবেদনার সব রকম উপকরণই আছে, কিন্তু মনসুরের?—যদি সে সত্যিই তাকে মন দিয়ে থাকে, তার উপায় কি হবে? প্রতারক কে? সে না মনসুর?

নেপথ্য নায়ক মনসুর নিজের অব্যক্ত বেদনা নিয়ে লুকিয়ে বেড়ায় জন্তুর মত। বাপের শাসনের পর সে বাড়ী ছেড়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রেও তার কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি। রইসউদ্দীন মুনশীর মুখের উত্তাপ এবার মনের গায়ে লাগে। একই মাত্র ছেলে—সেও নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। কিন্তু যাবে কোথায়? মেয়ের বাড়ীতে খোঁজ নিয়েছেন। মামা বাড়ী এবং সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনদের কারো বাড়ীতেই সে যায়নি। হাতের ঘুড়ি ছুটে গেলে যে দশা হয়, মুনশী সাহেবের দশাও সেই রকম। এখন একমাত্র নির্ভরতা পুত্রের শুভেচ্ছার উপর। সে যদি ইচ্ছে ক'রে জানায়, তবেই জানা যাবে তার ঠিকানা।

মুনশী-গিন্নী প্রথম আবিষ্কার করলেন কাগজখানা। দু'ছত্র লেখা।

"আব্বা, জন্মের মত বিদায় নিয়ে চললাম। আমাকে মাফ করবেন। আপনাকে যা ব'লতে চেয়েছিলাম,—তা' বলার মত সাহস আমার হয়নি"।
—মনস্থর

মুনশী সাহেবের কঠিন বুকখানাও এই দু'ছত্র লেখায় কেঁপে উঠলো। কি বলতে চেয়েছিল মনসুর? কেন তার বলার সাহস হয়নি? কেনই বা সে জন্মের মত বিদায় নিয়ে গেল? মুনশী-গিন্নীর মুখ গম্ভীর, থমথমে।

কাগজখানা ভাঁজ ক'রে পকেটে রাখতে রাখতে বেরিয়ে যান তিনি। মনসুর যেন তাঁর চোখের সামনেই ঘুরছে। বাড়ীর বাইরে এসে সেই পিটুলী গাছটার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। এখানেই শেষ দেখা হয়েছিল তাঁর সংগে। এই পিটুলী গাছটা যেন পিতা-পুত্রের মিলনের একটা নীরব সাক্ষ্য। মুনশী সাহেবের চোখ জ্বালা কর'ছিল।

মনসুর এ গল্পের নায়ক হতে চায়নি—সে সাহস তার ছিল না; তাই তার মরদেহটা একদিন সেই দীঘির বুকে ভেসে উঠ্‌লো। কথাটা বনের আগুনের মত দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। মুনশী সাহেবও শুনলেন। পাথরের মত চোখ দু'টো তার স্থির হয়ে রইলো। নিজের কানকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না; এতদিন যে উত্তাপ তাঁর বাইরে ছিল সেটা ভিতরে গিয়ে তাঁকে দৃষ্টিহীন ক'রে দিল।

মুনশী-গিন্নী সেই যে কথা বন্ধ করেছিলেন, তাঁর সে মৌনব্রত আর ভাঙেনি। স্বামীকে তিনি একটা কথাও বলেননি এতদিন, এখনও না। বাইরের আঘাত কামনা করলেও মুনশী সাহেব একটুও আঘাত পেলেন না এবং এই না পাওয়াটাই তার বুকের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এতদিন তিনি শাসন করে এসেছেন—এবার চান নিজেও শাসিত হ'তে। কিন্তু যে শাসন তার জন্য উদ্যত হয়েছিল, তাই এলো নেমে মাথার উপর।...

স্বামীর ঘরে নতুন বউ সমর্তভান। খবরটা তার কানেও গেছে। মনসুর এমন ক'রে তার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিবে সে কি কোনদিন তা ভেবেছিল? মনে পড়ে তার সেই চিঠির গোছার কথা। আজ হৃদপিণ্ডটা জ্বলতে থাকে তার, যেন সেই দেশলাইয়ের আগুনে। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি।..

# খরা

**সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়**

ছিপদহ থেকে ডাল্টনগঞ্জ যাবার পথে গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। ঝকমকে নতুন স্টেশন ওয়াগন, হঠাৎ খারাপ হবার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। ব্রিজ পেরিয়ে এসে চড়াই-এ ওঠবার মুখে দু-তিনবার দুর্বল শব্দ করে গাড়িটা যখন থেমেছিল, তখনও কেউ ভ্রুক্ষেপও করে নি, থেমেছে—আবার তো চলবেই, এই হিসেবে জানলা দিয়ে যে-যার নিজস্ব চোখে প্রকৃতি দেখতে লাগলো। মিঃ খেমকা সিগারেট কেস খুলে এগিয়ে দিলেন, জনে জনে পর্যায়-ক্রমে ইংরেজি-হিন্দি এমন কি বাংলাতেও অনুরোধ জানালেন, কেসে আটটা সিগারেট ছিল—একবারেই শেষ হয়ে গেল। মিনিট দশেকের মধ্যেও গাড়ি চললো না, পিছন থেকে একটা ট্রাক এসে হর্ন দিতে লাগলো, মিঃ খেমকা তখন নিজেই নেমে গেলেন।

সরু ব্রীজ পেরিয়ে রাস্তা, নদীর পাড় থেকেই খাড়া। নদী না, নদীর কঙ্কাল, রক্ত মাংস কিছু নেই। অরুণও নেমে দাঁড়ালো, গাড়ির মধ্যে ভ্যাপসা গরম। দু'হাত পিছনে ছড়িয়ে বুক চিতিয়ে আড়মোড়া ভাঙলো, শরীরটা চিড়বিড় করছে, স্নান না করতে পারলে অস্বস্তি কাটবে না। নদীতে জল থাকলে এখানেই নেমে পড়া যেত। গায়ে পড়া বাজে ইয়ার্কির মতন অসহ্য রোদ উঠেছে এই সাড়ে এগারোটার মধ্যেই। এখানে বোধহয় অনেকেরই গাড়ি খারাপ হয়, কিংবা ইচ্ছে করে থামে, কেন না পাহাড়ের চাঙ্গাড়ে অনেক শিক্ষিত হাতের লেখা কাঠকয়লা, চকখড়ির। চকখড়ি পায় কোথা থেকে, বেড়াতে বেরুবার সময় লোকে পকেটে চকখড়ি নিয়ে আসে নাকি? সবচেয়ে জ্বলজ্বলে লেখাটি এই, মন্দিরা, যোগচিহ্ন, লালকমল, সমান চিহ্ন, হেভেন। অরুণ অস্ফুট স্বরে বললো, গুড হেভেনস্। হাসলো।

ড্রাইভার বনেট তুলেছে, সেখানেই উঁকি মারা মাথা। গাড়ির ভেতর

থেকে হেরাল্ড ট্রিবিউনের লাহিড়ী বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো হেই, খেমকা, হোয়াট দা হেল ইউ···

খেমকা অত্যন্ত সপ্রতিভ, কখনো বিচলিত হয় না, সঙ্গে সঙ্গে মাথা তুলে বললো, লেটস্ ডু ওয়ান থিং···গাড়িটা যখন ট্রাবল দিচ্ছে, তখন আমরা নেমে যাই, কাছেই রূপা টুংরি ডাকবাংলো, ওখানেই আমরা লাঞ্চটা সেরে নিই।

ততক্ষণে আরও তিন-চারজন নেমে এসেছে। লাহিড়ীর কোনোদিনই সকালে মেজাজ ভালো থাকে না, সকালের দিকেই সে প্রায় প্রতি বাক্যে হেল উচ্চারণ করে, অরুণ লক্ষ্য করেছে। লাহিড়ী মুখ বিকৃত করে ঘড়ি দেখলো, ঘড়িতে সময় দেখার জন্য নয়, সকালের তারিখ, বললো, আজ এইটথ্, মাই গুডনেস, আজই আমায় পাটনা পৌঁছতে হবে—তোমাদের টাটা কোম্পানি এই ঝরঝরে লক্কর গাড়ি দিয়েছে—

খেমকা হা-হা করে হাসলো। বললো, একেবারে ব্র্যাণ্ড নিউ গাড়ি, সেইজন্যই ট্রাবল্ দিচ্ছে, চলুন, চলুন, ইট্স আ নাইস লিটল্ বাংলাউ, আপনার ভালো লাগবে,···মিঃ রুংগাচরি, হোয়াট ডু য়ু সাজেস্ট ?

রুংগাচারির আপত্তি নেই, আর কারুরই বিশেষ আপত্তি নেই, কিন্তু লাহিড়ী সবচেয়ে বড় ইংরেজি কাগজের লোক, সুতরাং তার মেজাজই সবচেয়ে বেশি। সে বিড়বিড় করতে লাগলো, ডালটনগঞ্জের ডি এম-এর সঙ্গে আমার এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল তিনটের সময়---যত সব,—বাংলো কত দূরে ? এখন রোদ্দুরের মধ্যে হাঁটাবে ?

—এই তো কাছেই। দেখা যাচ্ছে।

—সেখানে খাবার-দাবার জিনিসপত্র সব পাওয়া যাবে ? এ তল্লাটে কোথাও খাবার নেই।

—লিভ দ্যাট টু মি, আমার সঙ্গেও প্রভিসানস্ আছে, কোনো অসুবিধে হবে না।

খেমকা কিছুতেই অপ্রস্তুত বোধ করে না। লাহিড়ীর সঙ্গে সহাস্য মুখে কথা বলছিল, এবার ড্রাইভারের দিকে ফিরে মুখখানা সম্পূর্ণ বদলে একটা কর্কশ মুখোশ পরে নিল, ক্রুদ্ধ গলায় ড্রাইভারকে কি সব ধমকে, পর মুহূর্তে মুখোশখানা খুলে আবার হাসিমুখে লাহিড়ীকে বললো, মাঝে মাঝে

এই রকম আনরুটিনড্ ইনসিডেন্ট আমার কিন্তু বেশ ভালো লাগে। চলুন।

গাড়ির ক্লীনার মালপত্র বার করে পিছন পিছন বয়ে নিয়ে এল। এক কেস্ বীয়ার ও তিন বোতল স্কচ তখনও বাকি আছে, সসেজও সব ফুরোয় নি, সেইদিকে চোরাচোখে দেখে লাহিড়ীর মুখের রেখা সামান্য বদলালো।

বাংলোর দু'খানা ঘর, পরিচ্ছন্ন বাথরুম, তিনজন আর্দালি, একটু আগেই একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দলবল নিয়ে এখান থেকে গেছেন, সেইজন্য আর্দালিরা এখনো উর্দি খোলে নি। খেমকা ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতন সাবলীল দ্রুততায় অবিলম্বে সব ব্যবস্থা করে ফেললো, কিছুতেই তিনটের বেশী মুর্গী জোগাড় করা গেল না এই আফশোস প্রকাশ করতে করতে সে বীয়ারের বোতল খুলতে লাগলো। লাহিড়ীর কোঁচকানো ভুরু একটু সরল হয়েছে, টেবিলের ওপর আড়াআড়ি পা দুটো তুলে বললো, ওহে খেমকা, এদিকে কাছাকাছি তোমাদের টাটা কোম্পানির কোনো লঙ্গরখানা টঙ্গরখানা আছে নাকি ?

—না, এদিকে নেই। আমরা চারটে পয়েন্টে রিলিফ দিচ্ছি, কাল যেটা দেখলেন সেটা।

—যাক্ বাঁচিয়েছে। যা অত্যাচার করেছো এ তিন দিন !

—টরচার ? মিঃ লাহিড়ী, ইউ মাষ্ট ফেস লাইফ ! আপনারা জার্নালিষ্টরা—

—সকালবেলা খিস্তি করিওনা। লাইফ !···( ছাপার অযোগ্য ) নাও, ঢালো—

—দেশের কি অবস্থা তা আপনারা স্বচক্ষে দেখবেন না ? বিদেশী রিপোর্টাররা পর্যন্ত···

—দেশের অবস্থা দেখবার জন্য তোমাদের এত গরজ কেন হ্যা ? মেলা বক্‌বক্ করো না ! ভালগার ! এই অরুণ, তোর কাছে চারমিনার থাকে তো একটা দে- -

খেমকার সিগারেট কেস আবার ভর্তি। সে ফটাস করে খুলে এগিয়ে দিতেই লাহিড়ী বললো, তোমার ঐ গোল্ডফ্লেক খেতে খেতে মুখ একেবারে ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে। ঘাস ! দে অরুণ, চারমিনার দে—

অরুণ দূর থেকে প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিয়ে বললো, লাহিড়ীদা, আজ এখানে থেকে গেলে হয় না? জায়গাটা বেশ নিরিবিলি···

—তোর আর কি, সাতদিন দশদিন যত ইচ্ছে ছুটি মারবি। আমার পর্শুই কলকাতায় গিয়ে প্লেন ধরতে হবে, একটা দিন অবশ্য···মেজাজটা একেবারে খিঁচড়ে গেল ভাল্লাগে না—

খেমকা বললো, সত্যি, সহ্য করা যায় না। এমন করুণ দৃশ্য···

—কোনটে করুণ? কোনটে? অ্যাঁ?

লাহিড়ী পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসলো। বিশাল চেহারার চওড়া মুখ লাহিড়ীর, চোখে বেশী পাওয়ারের চশমা। এক হিসেবে তার মুখখানা শিশুর মতন, রাগ, বিস্ময়, বিরক্তি, হতাশা এসব অভিব্যক্তিগুলো স্পষ্ট ফুটে ওঠে। এখন অভেজাল বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, কোনটে করুণ? অ্যাঁ?

বোম্বে ট্রিবিউনের দেশপাণ্ডে বললো, মিঃ লাহিড়ী, ডিড য়্যু নোটিশ··· আমি একটা স্ন্যাপ নিয়ে রেখেছি, বেতলা রিলিফ সেণ্টারে···লাইনে বসে থাকতে থাকতেই একটা বুড্‌ঢির কোলে মাথা রেখে একটা বুড্‌ঢা মরে গেল···নিজের চোখে মানুষ এসব দেখতে পারে? জয়প্রকাশজীকে দেখলুম বারবার ঘাম মুছছেন, আমিও চোখ বুজে ফেলেছিলুম···

রুংগাচারি হাসতে হাসতে বললো, চোখ বোঁজার আগে ক্যামেরায় ছবিটা তো ঠিকই তুলে নিয়েছো! এখন ও ছবিটা টাইম্‌স কিংবা গার্ডিয়ানকে বিক্রী করবে—

দেশপাণ্ডে তীব্র কণ্ঠে বললো, কভি নেই! আমি আমার দেশের এই সব লজ্জার ছবি কখনো বিদেশীদের কাছে বেচি না।

লাহিড়ী মন দিয়ে শুনছিল, এবার বললো, ঐটা করুণদৃশ্য? তার চেয়ে আমাদের অবস্থা আরও করুণ না। এই শালা খেমকা—

খেমকা ঠোঁটমাখা হাসি সমেত নকল ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, আরে, আরে, আমি কি দোষ করলুম!

—তুমিই তো শালা যত নষ্টের মূল!

—কেন। দেশে কি হচ্ছে তা আপনারা···

—দেশে কি হচ্ছে, আমারা নিজের গরজে দেখব। কিংবা আমাদের কাগজ আমাদের দেখতে পাঠাবে। তুমি নেমন্তন্ন করে কেন দেখাতে এনেছো হে। নিজেরা দান খয়রাত করছো—তাই আবার ঢাক পিটিয়ে দেখানো চাই। নেমন্তন্ন করে এনে কেউ মানুষ মরা দেখায়? দিনরাত স্কচ খাওয়াচ্ছো। আরামে রেখেছো—আর মাঝে মাঝে একবার করে গিয়ে মানুষ-মরা দেখে আসা···হরিবল্, ভালগার···শালা, তোমাদের এগুলো খাচ্ছি বলেই যে তোমাদের পছন্দ করি, তা ভেবো না। নেশাখোর লোক, ভাল মাল দেখলে ছাড়তে পারি না, তা বলে এতখানি অত্যাচার?

খেমকা সম্পূর্ণ ভঙ্গি বদলে, মৃদু হাত তালি দিয়ে বললো, চমৎকার বলেছেন, আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু আমারও তো চাকরি···

লাহিড়ী চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে বারান্দার বাইরে থুথু ফেললো। পকেট থেকে রুমাল বার করে নাক ঝাড়লো। চশমাটা খুলতেই মুখের চেহারাটা সম্পূর্ণ বদলে গেল তার, সেই অসহায় ধরনের মুখে বললো, সত্যি, ভাল্লাগে না, ছাখো গে রান্না হয়েছে কিনা, খিদে পেয়েছে। আর একটু নেশা ধরে গেলে আর খেতেই ইচ্ছে করবে না।

ডাক বাংলোর উঠোনে মস্ত বড় ইদারা, দলে দলে লোক সেখানে আসছে জল নিতে। একজন আর্দালি সেখানে দাঁড়িয়ে খবর্দারি করছে, একজন যাতে এক কলসীর বেশী জল না নেয়। অরুণ সেই দিকে চেয়েছিল। লাহিড়ী তাঁর কাছে এসে বললো, কি দেখছিস? মেয়েছেলে? আমি সাত বছর আগে একবার এই পালামৌতে এসেছিলুম, তখন আমার বয়েস তোর সমান, সেবার দেখেছিলুম এই ওরাওঁ মেয়েগুলোর কী স্বাস্থ্য! এখন ছাখ, একটা মেয়েরও পাছা নেই, বুক নেই—

অরুণ কথা না বলে লাহিড়ীর মুখের দিকে চেয়ে হাসলো। লাহিড়ী আবার বললো, তা হলে কি ভাষা ভেবে নিচ্ছিস? তোদের বাংলা কাগজে তো আবার খুব ফলাউ কবিত্ব করতে হয়! নে আমি বলে দিচ্ছি, লিখবি, অগণিত জনতার মুখে মুখে বিষাদের ছবি, না ছবি না, ছবি কথাটা পুরোনো, ঘাম, বিষাদের ঘাম, আরও ভালো হয় বিষাদের স্বেদ,

ফার্স্টক্লাশ, রোদ, বধির রোদ্দুর, নে, চমৎকার হেডিং পর্যন্ত বলে দিচ্ছি, আকাশে বধির রোদ্দুর, নিচে বিষাদের স্বেদ—পোয়েট্রি।

অরুণ কথা না বলে আবার হাসলো। এই হাসিটা একটু অন্যরকম। লাহিড়ী সেটা লক্ষ্য করলো। বললো, একটু বেশি বক্‌বক্ করছি, না? সিলি অ্যাণ্ড স্টুপিড! ভেবে ভ্যাখ ট্রাজেডিটা, হাজার হাজার মানুষ না খেতে পেয়ে ধুঁকছে,—আর আমাদের কাজ কি, সেটা বর্ণনা করার সময় কোন্ ভাষাটা ভালো হবে, তাই নিয়ে মাথা ঘামানো, তাই না? ভাল্লাগে না!

—লাহিড়ীদা, কাছাকাছি কোথায় যেন একজন সাধু এসে খুব কাজ করছেন শুনেছিলুম··

—সাধু? কিসের সাধু?

—বোম্বে থেকে কোন্ সাধু এসে নাকি রোজ এক হাজার লোককে খাওয়াচ্ছেন। সাধুর বড়লোক ভক্তরা টাকা আর চাল পাঠাচ্ছে, ব্যাপারটা ইন্টারেষ্টিং, চলুন না, যখন এখানে থাকাই তোল, তখন ব্যাপারটা কভার করে আসি?

—সাধু লোক খাওয়াচ্ছে, তাতে তোর আমার কিরে শালা?

—সে নাকি এক এলাহি কাণ্ড। আপনাদের ইংরিজি কাগজের পক্ষে কিন্তু বেশ ভালো ষ্টোরি হয়—

—আঃ, চুপ কর না! বীয়ারটা এত তেতো, আঃ, আমাশার পাঁচন খাচ্ছি যেন···ভেজাল দিয়েছে বোধহয়।

—বীয়ার তো একটু তেতো হবেই।

—বাজে বকিস্ না! তুই দুধের বাচ্চা, তুই আমাকে শেখাবি—বীয়ার তেতো কিনা।

লাহিড়ী মুখটা কুঁকড়ে রইলেন। চশমা খোলা অসহায় মুখ। একবার এর কাছে একবার ওর কাছে যাচ্ছে, আবোল তাবোল বক্‌বক্ করছে অনবরত, অন্য কেউ কিছু বলতে গেলেই চেঁচাচ্ছে, আঃ, চুপ কর না। স্টপ্ হলারিং, উইল য়্যু? হঠাৎ লাহিড়ী খেমকার উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড চেঁচিয়ে উঠে বললো, এই শালা খেমকা, তোর নামে আমি রুস্তমজীর কাছে লাগাবো। তোকে আমি রাঁচিতে ট্রান্সফার করাবো।

খেমকা বসেছে বারান্দার একেবারে ধার ঘেঁষে, তার চোখে মুখে রোদ্দুর, মুখখানা সেই সুবাদে জ্বলন্ত, মিষ্টি সুরে খেমকা বললো, তা যদি করেন, বুঝবো আমার ভালোর জন্যই করেছেন। ইউ আর অলওয়েজ মাই ফ্রেণ্ড।

—ফ্রেণ্ড না কচু!

—অলওয়েজ! কিন্তু, এই মুহূর্তে আমার দোষটা কি?

লাহিড়ী কোমড়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। তাব্র চোখে তাকিয়ে খেমকার দোষ খুঁজছে। এদিকে ওদিকে তাকালো, চোখে পড়লো নিজেরই হাতের খালি গ্লাস। বললো, খালি তখন থেকে দেশী বীয়ার খাওয়াচ্ছো। স্কচগুলো কি তোমার মাগকে খাওয়াবে? অ্যাঁ?

খেমকা ঝটিতি উঠে টেবিলের তলা থেকে স্কচ বার করে বললো, আমি লক্ষ্য করেছি মন খারাপ হলে আপনি হুইস্কির বদলে বীয়ার খেতেই ভালবাসেন, সেইজন্য—

—আমার মন খারাপ তোমায় কে বলেছে, গাণ্ডু? আমার খিদে পেয়েছে। তখন থেকে বলছি খাবারের ব্যবস্থা করতে—

খাবার এখনই প্রস্তুত। ধপধপে সাদা সরু চালের ভাত, টিনের মাখন, আলুভাজা আর গরম গরম মুর্গির ঝোল। রুংগাচারি ফিসফিস করে অরুণকে বললো, এই কদিনের মধ্যে আজকের চালটাই সবচেয়ে ভালো। সবচেয়ে খরা অঞ্চলে আমরা সব চেয়ে ভালো চাল পেলাম—তাই না?

অরুণ বললো, মুর্গির স্বাদও খুব ভালো। রেঁধেছে যা—

—একটু বেশি ঝাল দিয়েছে।

তখন সবে মাত্র একটা বেজেছে, লাহিড়ীর এর মধ্যেই চুরচুরে নেশা। আঙুল দিয়ে খাবার ঘাঁটাঘাটি করছে, কিছুই খাবার দিকে মন নেই। চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে এসেছে—আজ সারাদিন ওর এ-রকমই চলবে। অথচ অরুণ দেখেছে, ঐ মানুষটাই যখন রিপোর্ট টাইপ করতে বসে তখন অন্য রকম চেহারা। অসাধারণ স্মৃতি শক্তি আর ভাষার জোর, কি একাগ্র মুখ তখন। অরুণ বললো, লাহিড়ীদা, আপনি কিছুই খাচ্ছেন না।

—না—ধুৎ! কি খাবো ভাল্লাগে না, পচা মুর্গির মাংসটা পচা।

খেমকা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে বললো, জ্যান্ত মুর্গি পচা? হাঃ-হাঃ

সকলেই হেসে উঠলো। লাহিড়ী ক্রুদ্ধ গলায় বললো, হোয়াট্‌স ফানি? অ্যাঁ? আলবাৎ পচা! ধ্যাৎ—

লাহিড়ী আঙুল দিয়ে ভাত আর মাংস মেঝেতে ছড়াতে লাগলো দেখে দেশপাণ্ডে বললো, দাদা, না খাবেন তো থাক্‌, নষ্ট করবেন না খাবার।

—বেশ করবো নষ্ট করবো। তোমার তাতে কি?

—এটা অন্যায়! এত লোক খেতে পাচ্ছে না, আর আমরা এরকম পেট ভরে খাচ্ছি সেটাই তো অন্যায়, তার ওপর আবার নষ্ট করা—

—আঃ, চুপ কর না! বেশ করবো নষ্ট করবো···

—কোনো মানে হয় না! বাংলোর বেয়ারারা খেতে পারে—কিংবা কোনো ভিখিরিকে দিলে···

—সাট আপ! আমি কিছু শুনতে চাই না। খেতে পাচ্ছে না, ভিখিরি···ভাল্লাগে না, আর সহ্য করতে পারি না! নতুন নাকি···আগে বুঝি না খেয়ে কেউ···আবার ডেকে দেখানো! এই খেমকা, আমি তোমাকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিচ্ছি—আজ সারাদিন এখানে কেউ ওসব খেতে না পাওয়া টাওয়ার কথা বলতে পারবে না! এনাফ্‌! আজ সারাদিন ছুটি, বুইলে। আজ দুর্ভিক্ষ থেকে ছুটি, বুইলে তো সবাই, আজ শুধু মদ আর মেয়েছেলের গল্প করবো—খবর্দার কেউ আর ওসব কথা···

—তার দরকার হবে না মিঃ লাহিড়ী, গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে, খেয়ে উঠেই আমরা স্টার্ট করতে পারবো।

—মাইরি আরকি! খেয়ে উঠেই আমি এখন তোমার ঐ ঝকাং ঝকাং গাড়িতে উঠছি আর কি। আজ আমরা এখানে থাকবো।

—কিন্তু আপনি বলছিলেন পর্শু কলকাতায় আপনাকে প্লেন ধরতে হবে?

—আমার প্লেন ধরতে হবে তো, তোমার অত ভাবনা কিসের? বলছি তো আজ ছুটি।

দিল্লীর সাংবাদিক দু'জন অবশ্য তখনই চলে যেতে চায়। দেশপাণ্ডেরও থাকার ইচ্ছে নেই। তার তোলা ছবিগুলো টাট্‌কা ছাড়তে না পারলে মূল্য থাকবে না। শেষ পর্যন্ত চারজন চলে গেল। বাকি চারজন রয়ে গেল, গাড়ি আবার ফিরে আসবে।

বারান্দায় ইজি চেয়ারে ওরা বসেছে। লাহিড়ী আবার গ্লাসে হুইস্কি ঢেলেছে, জোর করে অন্যদের গ্লাসেও ঢালিয়েছে। অ্যালকোহল এখন রক্তে মিশেছে, শরীরের সব ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্তের সঙ্গে ছুটছে অ্যালকোহল, লাহিড়ী একেবারে ছটফট করছে। একবার চেয়ার ছেড়ে উঠছে, কখনো পায়চারি করছে, আবার বসছে। খাঁ খাঁ করছে রোদ, এই রোদ্দুরের মধ্যে হাওয়া উঠলে অলৌকিক শব্দ হয়। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটে আসে সেই শব্দকারী হাওয়া।

ইঁদারা থেকে জল নেবার জন্য তখনও অনবরত, নারী-পুরুষ আসছে। কপিকলের ঘড় ঘড় শব্দ, ওদের দুর্বোধ্য ভাষায় ঝগড়া। লাহিড়ী নিজের সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললো, কি সব চুপচাপ কেন? গল্প হোক! এই রুংগাচারি, এবার যে রাশিয়া থেকে ঘুরে এলে, ওখানে মেয়েছেলে টেয়েছেলে কি রকম? পাওয়া যায়?

রুংগাচারি হাই তুলে বললো, আমার খুঁজে দেখার সময় হয় নি। এমন টাইট প্রোগ্রাম ছিল!

—তুমি মেয়েছেলের খোঁজ করো নি, তাই বিশ্বাস করবো? সেবার জার্মানিতে গিয়ে তো, বলো না, সেই একটা গল্পই বলো না।

—আপনি বলুন!

—আমি আর কি বলবো! জুলপিগুলো সব পেকে গেল এই যা দুঃখু, এখন আর,···এই অরুণ, তোর কাঁচা বয়েস, বিয়ে তো করিস্ নি, প্রেম ট্রেম, দু একটা গল্প ছাড় না।

—লাহিড়ীদা, আপনি বরং আপনার সেই স্পেনের অ্যাফেয়ারটা—

রাম যশ শিং অত্যন্ত সিরীয়াস ধরণের লোক। কারুর ইন্টারভিউর নেবার সময় ছাড়া সহজে মুখ খোলে না। মদও খেয়ে যায় চুপচাপ। রুংগাচরি তাকে ফিসফিস্ করে জিজ্ঞেস করলো, বিহারের কত পার্সেন্ট পপুলেশান ড্রট অ্যাফেকটেড?

রাম যশ সিং সংক্ষেপে বললো, ফিফটি ফোর পার্সেন্ট, এখন পর্যন্ত।

—স্টার্ভেসানে মৃত্যুর সংখ্যা?

—কোনো অফিসিয়াল রেকর্ড নেই। আন অফিসিয়ালি—

লাহিড়ী হুংকার দিয়ে উঠলো, আবার ঐ কথা ? পাগল করে ছাড়বে দেখছি ! বললুম না, আজ ছুটি ! একদিনের জন্যও চাকরি ভুলতে পারো না !

—মিঃ লাহিড়ী, এটা শুধু চাকরির ইন্টারেষ্ট নয়। হিউম্যান ইন্টারেষ্ট।

-সাট আপ্ ! কোন কথা শুনতে চাই না।

—নো ইউজ আরগুইং উইথ এ ড্রাঙ্ক।

—মোটেই ড্রাঙ্ক নই ! পরের পয়সায় মদ মুর্গি পেঁদিয়ে এখন আবার হিউম্যান ইন্টারেষ্ট ! বুল শীট ! এখন মেয়েছেলের গল্প হবে। মদ মাংসর পর মেয়েছেলের গল্পই ঠিক—

—বলুন না, আমরা তো শুনতে রাজীই আছি।

—লাষ্ট ইয়ারের জানুয়ারিতে, ম্যাড্রিডে ছিলাম তখন, হোটেলে··· রাত্তিরবেলা মেয়েটা বাথটবে গা ডুবিয়ে ছিল, আমি নক করতেই তোয়ালে জড়িয়ে ··আমার তখন প্রচণ্ড নেশা···এই ছাখো, ঘুমোচ্ছে ··এই রুংগচারি, এই ! রুংগচারির দিব্যি নাক ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। লাহিড়ী তিন চারবার তাকে চেঁচিয়ে ডাকলো, কোনো সাড়া নেই। টলতে টলতে লাহিড়ী এগিয়ে গিয়ে তার চুলে টান মেরে বললো, এই শালা, রুংগচারি—। রুংগাচারি ধড় ফড় করে উঠে বললো, ও ঘুম এসে গিয়েছিল—। দেখুন না, খেমকাও ঘুমোচ্ছে—

—শালা খেমকার নামে আমি রুস্তমজীর কাছে লাগাবো ! এই ছাপার অযোগ্য ) খেমকা—

খেমকা চোখ খুলে বললো, আমি ঘুমোচ্ছি না। এমনি চোখ বুজে আছি, আপনি বলুন না, আমি শুনছি। তারপর সেই তোয়ালে জড়ানো মেয়ে—

—আমি একটানে তোয়ালেটা খুলে নিলুম ! অমনি দেখলুম, জগজ্জনীর রূপ ওফ্ ! বাজী ফেলে বলতে পারি, ওরকম মেয়ে কোটিতে একটা নেই, সারা গায়ে ছুরির ধার। বুক কি, তুখানা সার্চ লাইট, আর উরু, মেয়েটা প্রথমেই কি বললো, বলবো ? মেয়েটা তখন আমায় কি বললো ?

কে জবাব দেবে ? তিনজনের নাক দিয়ে ফিচফিচে ঘুমের নিঃশ্বাস। মাথা হেলিয়ে সব ঘুমোচ্ছে। একমাত্র অরুণ জেগে। অল্প অল্প হাসছে।

লাহিড়ীর মুখে স্পষ্ট বেদনার ছায়া। চোখ বিস্ফারিত করে বললো, সব ঘুমিয়ে পড়লো, অ্যাঁ? পুরুষমানুষ? এরা পুরুষমানুষ? মেয়েছেলে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে? হিউম্যান ইন্টারেষ্ট! শালারা—

অরুণ বললো, লাহিড়ীদা, আপনি বলুন না। কি বললো মেয়েটা?

—শুনবি! আমার হাতে তোয়ালে, মেয়েটা ঠ্যাকারে হেসে বললো, আমার পিঠটা ভিজে আছে, মুছে দাও। আমি তখন—ধ্যাৎ, ভাল্লাগে না। তিন তিনটে মোষের নাক ডাকা—এর মধ্যে ওসব গল্প হয়! চল্ উঠে পড়ি, একটু ঘুরে আসি।

—কোথায় আর যাবেন এই রোদ্দুরে! বসুন না। লাহিড়ীদা, আপনার জন্ম হয়েছিল কোথায়?

—এলাহাবাদে। আমার বাবা ওখানে প্রফেসর ছিলেন। কেন, তা দিয়ে তোর কি দরকার?

—এমনিই জিজ্ঞেস করছিলুম।

ঐ হুইস্কির বোতলটা এদিকে নিয়ে আয় তো! আচ্ছা, যাক্, আর খাবো না, ভাল্লাগছে না। এখন কি করি বলতো?

—আপনিও ঘুমিয়ে পড়ুন না।

—দুপুরবেলা পড়ে পড়ে ঘুমোবো? ধুৎ! তার চেয়ে চলে গেলেই হতো দেখছি—এই কতগুলো নাকডাকা মোষের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা··· তুই এখন কি করবি?

—কিছু না। আমি এখানেই চুপচাপ বসে থাকবো আমার অনেকগুলো কথা মনে পড়ল এখানে এসে—

—কি কথা? প্রেমিকা—

—না, না! আমি জন্মেছিলাম পূর্ববঙ্গে, ১৯৪৩ সালে—আমি পূর্ববঙ্গেই ছিলুম—সেইসব দিনের কথা মনে পড়ছে হঠাৎ।

—তখন তো তুই বাচ্চা ছেলে ছিলি!

—হ্যাঁ। আমার খুব পেটের অসুখ ছিল, খিদেও পেতো সব সময়। সারাদিন শুধু খাই খাই করতুম আর কাঁদতুম। বাড়ির লোককে খুব কষ্ট দিয়েছি।

—আ মোলো। হঠাৎ এখানে এসে তোর সে কথা মনে পড়ছে কেন ?

—বাবা কলকাতায় মাস্টারী করতেন, সে আমলের ব্যাপার তো জানেন, বাবা মাসে মাসে কুড়ি টাকা করে পাঠাতেন, তখন পূর্ববাংলায় আমাদের গ্রামে চালের মণ ছাপ্পান্ন টাকা! বাড়িতে পাঁচজন লোক। সারাদিনে একবার মাত্র ভাত আর ফ্যান মিশিয়ে—খাবার জুটতো আমাদের। আর আলুসেদ্ধ। পকেটে আলুসেদ্ধ রাখতুম সব সময়—তখন ক্লাশ ফোরে পড়ি, ইস্কুলে গিয়েও পকেট থেকে আলুসেদ্ধ বার করে করে খেতুম। ক্লাশের সব ছেলেই বাড়ি থেকে আলু সেদ্ধ আনতো—বেঞ্চির ওপর নুন···আমার সহ্য হতো না, পেটের অসুখের রুগী তো, ফেনভাত সহ্য হতো না, আলুসেদ্ধ সহ্য হতো না, তবু খিদে, মাকে জ্বালাতুম, মা খেতে বসলে মা'র খাবার কেড়ে খেতুম।

লাহিড়ী অকারণে মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন। বলতে লাগলো, বুঝেছি, বুঝেছি! লাহিড়ী সেখান থেকে উঠে বারান্দার কোণে চলে গেল, অন্যদিকে চেয়ে বললো, বুঝেছি, তোর মা বেঁচে নেই, না ?

—না, আমার মা সেই বছরই টি. বি-তে মারা যান। তখন কিছু বুঝতুম না—এখন সব মনে পড়ছে। কাল লঙ্গরখানায় লাইন দেখে হঠাৎ কি রকম যেন লাগলো। একটু মজাই লাগলো বলতে গেলে। মনে হলো, কি আশ্চর্যভাবে, আমি তো ঠিক বেঁচে গেছি!

লাহিড়ী সিগারেটের শেষ টুকরোটা আঙুলের ওপর রেখে টুসকি মেরে দূরে ছুঁড়ে দিল। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরো পয়সাগুলো নিয়ে ঝনঝন্ করলো। এক হাত রাখলো মাথার চুলে। হঠাৎ লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নামলো নিচে, একটা ফুল ছিঁড়লো। চেঁচিয়ে বললো, যা, অরুণ তুই ঘরে যা—কিছুক্ষণ ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাক্ বরং। ভালো লাগবে।

অরুণ চোখ দিয়ে লাহিড়ীর গতি অনুসরণ করছিল। জবাব দিল, না, ঠিক আছে, এখানেই বেশ ভালো লাগছে।

লাহিড়ী এগিয়ে গেল ইঁদারাটার দিকে। একটা মেয়ে সদ্য কলসীতে

জল ভরে ফিরছে, তাকে বললো, দে তো মাঝিন্, একটু জল দে, মুখটা ধুয়েনি !

মেয়েটা একটু আড়ষ্টভাবে দাঁড়ালো, তাকালো লাহিড়ীর নেশাগ্রস্ত লাল চোখের দিকে। তারপর কাঁখ থেকেই কলসীটা বাঁকিয়ে ঢেলে দিলে খানিকটা জল। অঞ্জলি পেতে টলটলে ঠাণ্ডা জল নিয়ে লাহিড়ী ঝাপটা মেরে তার চশমা-খোলা অন্য মুখটা ধুয়ে নিল। আবার চেয়ে নিয়ে খানিকটা জল খেয়েও ফেললো। তারপর মেয়েটিকে বললো, আয়, তোকে আবার জল ভরে দিচ্ছি।

আর্দালিকে সরিয়ে দিয়ে বললো, ঠিক হ্যায়, তুম যাও। আমিই এদের সকলকে জল তুলে দিচ্ছি।

উঁকি মেরে দেখলো, কুয়োর অনেক নিচে জল। তা হোক, ফুরোবে না।

# ঘরের পথ

## শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আমার বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। মা গিয়েছিল পাহাড়ে, পাতা কুড়োতে।

কেউই আর ফিরল না।

আমাদের বাড়িটা ছিল মাটির। তাতে ফাটল ধরেছিল। যখন বাতাস বইত তখন সেই ফাটলের মুখে শিস্ দেওয়ার মতো শব্দ হত। যেন বাইরে থেকে কেউ ডাকছে। কখনো কখনো রাত্রিবেলা সেই শব্দে ভয় পেয়ে আমি মাকে জড়িয়ে ধরতাম, মা আমাকে। মাটির দাওয়ায় কিংবা দেওয়ালে অশ্বত্থ গাছের চারা দেখলেই মা আমাকে সেটি কেটে ফেলতে বলত। অশ্বত্থ চারা কাটতে কাটতে আমার অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অবসর পেলেই আমি দা হাতে অশ্বত্থ চারা খুঁজে বেড়াতাম।

ঘরের চালে ভাল খড় ছিল না। বর্ষাকালে জল পড়লে আমাদের ভিজতে হত। সারা ঘর যখন জলে থই থই করত তখন মা আমাকে আধখানা আঁচলের আড়ালে রেখে আমাদের আগের দিনের সুখের গল্প বলত। আমাকে আঁচল দিয়ে ঢাকা ছিল মার স্বভাব। শীতে কিংবা বর্ষায় কিংবা ঝড়ে আমি মার আঁচলের আড়ালে চাপা থাকতাম। আমার বাবার একটা বুড়ো ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটা কোনো কাজ করত না। আমি ঘাস কেটে এনে ওকে খাওয়াতাম। ঘোড়াটাকে বাবা খুব ভালবাসত। আমি বাবাকে দেখিনি। যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। তারপর আর ফেরেনি। আমি বাবার ঘোড়াকে ভালবাসতাম। ওর গায়ের গন্ধে আমার বাবার কথা মনে পড়তো।

বাবা ফিরল না দেখে মা পাহাড়ে কাঠপাতা কুড়োতে যেত। আমাদের গাঁয়ের গরীব মানুষেরা সবাই কাঠ কুড়োত। মা তাদের সঙ্গে খুব ভোরে

চলে যেত। ফিরত সন্ধ্যেবেলায়, কখনো কখনো রাত্রি হ'ত। যাওয়ার সময় মা বলত, সারাদিন ঘর পাহারা দিও। ঘোড়াটাকে ঘাসজল দিও। সন্ধ্যেবেলায় শুকনো পাতা জড়ো করে বাইরে একটা আগুন জ্বেলে তার পাশে বসে থেকো। পাহাড় থেকে আগুনটি দেখতে পেলেই আমি বুঝবো তুমি ভাল আছো, ঘরে আছ। তা হলেই আমার ভাবনা থাকবে না।

আমি সারা দিন ঘরে থাকতাম। ঘোড়াটাকে ঘাসজল দিতাম। আর সন্ধ্যে হলেই শুকনো পাতা জড়ো করে বাইরে একটি মস্ত আগুন জ্বালতাম। আগুনের পাশে বসে দেখতাম দূরে বহু দূরে নীল পাহাড় দৈত্যের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাঁ দিকে মস্ত মাঠের ওপাশে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পাহাড়টি মেঘ আর কুয়াশার মতো আবছা হয়ে যেত। তবু পাহাড়টি আমার চোখ থেকে কখনো হারিয়ে যায়নি। ছবির মতো হয়ে পাহাড়টা আমার চোখের ওপর স্থির থাকত। আগুন জ্বলতে জ্বলতে নিবে আসত। পাহাড়টিকে আমার বড়ো ভয়। ঐ পাহাড় পেরিয়েই আমার বাবা চলে গিয়েছিল। আর ফেরেনি। মা কখন ফিরবে ভাবতে ভাবতে আমি কখনো কখনো ঘুমিয়ে পড়ে মা ফিরে আসার স্বপ্ন দেখতাম।

কখনো কখনো মা আমাকে বাবার গল্প বলত। ঐ পাহাড়ের ওপাশে অনেক নদী-নালা খাল-বিল পেরিয়ে বাবা বিদেশে গেছে। সেখানে যেতে হলে ক'টা নদী ক'টা পাহাড় পার হতে হয় তা মা জানে না। মা শুধু জানে, একদিন বাবা অনেক রোজগার করে ফিরে আসবে। তখন আমি নতুন জামা জুতো পরে একটা বাচ্চা ঘোড়ায় চড়ে বাবার বুড়ো ঘোড়াটার পাশে পাশে টগবগিয়ে কোথাও চলে যাব।

মা কখনো কখনো পাহাড়টাকে অভিশাপ দিত, ওটা গোটা পৃথিবীটাকে আড়াল করে আছে বলে। আবার কাঠ-পাতা কুড়োতে ঐ পাহাড়েই যেত।

একদিন মা আর ফিরল না। অনেকক্ষণ জ্বলে জ্বলে আগুনটা নিবল। দূরের নীল পাহাড় মেঘ আর কুয়াশার মত আবছা হ'ল। মা আর ফিরল না।

ভোর হতেই আমি মার খোঁজে বেরোলাম।

যারা কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল তারা সবাই ফিরেছে, শুধু আমার মা বাদে। তাদের মধ্যে একজন বলল, "তোর মা গেছে সুখের খোঁজে। পাহাড়ের ওপারে। তুই ছিলি গলার কাঁটা, তাই তোকে ফেলে গেছে।"

আমার বিশ্বাস হ'ল না। ওরা হাসল প্রাণ খুলে। আমার পিঠে চওড়া হাতের চাপড় মেরে বলল, "তার জন্য ভাবনা কি, তুইও তো জোয়ান মরদ হয়ে উঠবি দু-দিন বাদে। খেটে খেতে পারবি না? চিরকাল কি মায়ের আঁচল-চাপা থাকে কেউ, না কি আমাদের তাই করলে চলে?"

মা আমাকে ফাঁকি দিয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে ভেবে সারা গাঁ পাতি পাতি করে খুঁজলাম!

ওরা বলল, "খুঁজে কি করবি! তার চেয়ে পাহাড়ে চল। পাতা কুড়োবি।"

আমি পাহাড়ে গেলাম। কিন্তু কাঠ-পাতা কুড়োতে মন গেল না।

ওরা বলল, "তোর মা গেছে সুখের খোঁজে। পাহাড়ের ওপারে। আয়, কাঠ কুড়োবি।"

আমি জেনেছিলাম যে আমি আছি বলেই মার সুখ। সুখ মানেই দুঃখের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি। আমি আছি বলেই মার সেই শক্তি আছে। অনেক বড় হয়ে জেনেছিলাম যে আমিই মার দুঃখ, আমি ছিলাম বলেই মা সুখের খোঁজে চলে যেতে পারছিল না। দুঃখ মানেই সুখের পথ আগলে যে দাঁড়ায়।

আমার বাবা গেল পাহাড়ের ওপারে, আমার মাও আর ফিরল না। রইল শুধু ঘোড়াটি। সেই ঘোড়াটাও বুড়ো হয়েছে। কাজকর্ম করতে পারে না। কখনো মাঠে চরতে যায়, বেশীর ভাগ সময়েই ঘরে বসে ঝিমোয়। আমি ঘাস কেটে এনে খাওয়াই, জল দিই। যেমন বাপ বুড়ো হলে ছেলে তার কাজকর্ম করে। মাঝে মাঝে ওর প্রকাণ্ড বুড়ো মাথাটি আমার কাঁধে নামিয়ে রাখত। তখন ওর ঘন, গাঢ় দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যেত।

সে নিঃশ্বাসে ওর গায়ের চামড়া থরথর করে কাঁপত। ওর মুখে, চোয়ালে, ঘাড়ে শিরাগুলো থাকত ফুলে, ওর ভাঙাচোরা মুখটা ছিল গাছের কাণ্ডের মত এবড়োথেবড়ো। ওর প্রকাণ্ড ঘাড়টা দু হাতে জড়িয়ে থেকে আমার মনে হত যেন বহুদিনের পুরোনো একটা বটগাছ শাখাপ্রশাখা মেলে আমায় আশ্রয় দিয়েছে।

একদিন ঘোড়াটিকে দেখে গাঁওবুড়ো বলল, "ঘোড়াতে চেপে তোর বাপ বিয়ে করতে গিয়েছিল। ঘোড়াটি তোর বাপের মতন। ওকে যত্ন-আত্তি করিস।"

ঘোড়াটিকে নিয়ে ছিলাম মেতে। বাদবাকি সময়টা কাটতো চুপচাপ দাওয়ায় বসে। সারা দিন বাতাস আমাদের ফাঁকা বাড়িটায় শিস দিয়ে খেলা করত। দেখতাম, গুড়মি শাকের জঙ্গলে চড়াই নেচে বেড়াচ্ছে, ধনে পাতার গন্ধে বাতাস ভারী, সরসর করে গাছের শুকনো পাতায় বাতাস বইছে। কুয়োর পারের মাটিতে ছোট্ট একটু গর্তে জমে থাকা জলে শালিক চান করছে জল ছিটিয়ে। ও চলে গেলে জলের কয়েকটা সরু রেখা থাকতো মাটিতে, কয়েকটা পালক বাতাসে। আমার চকচকে দা'টাতে মরচে পড়ল। সারা বাড়িটায় অশ্বত্থ চারা উঠলো গজিয়ে।

দিন কাটে। সন্ধ্যে হ'লে পাতা জড়ো করে আগুন জেলে চুপ করে শুয়ে থাকি। আগুনটা মরে এলে তার নরম আঁচ অনেকটা মার শরীরের তাপের মত মনে হয়। তাই কখনো ঘুম আসে। শরীর অবশ করে দিয়ে।

যে দাই আমার নাড়ী কেটেছিল সে এসে একদিন বলল, "এমনি করে কি না খেয়ে মরবি? তার চেয়ে আমার কাছে চল। আমার তো ছেলে নেই, একটা মাত্র মেয়ে। দু'জনে বেশ থাকবি।"

"উঁহু। আমি রাতে স্বপ্ন দেখি বাবা ফিরে আসছে।"

"হ্যাঁ, যেমন তোর মা মুখপুড়ী ফিরল। তা খাস কি?"

"শাকপাতা যখন যা হয়।"

বুড়ী গজগজ করে আমাকে বকতে বকতে চলে গেল।

তারপর থেকে দাইমার মেয়ে চন্দ্রা আমার জন্য ভাত আনত। রোজ।

ভাতের থালাটা মাটিতে রেখে বেড়ালের মত খাপ পেতে আমার দিকে চেয়ে থাকত চন্দ্রা, যেন শহরের মানুষ দেখছে।

একদিন আমি বললাম, "কি দেখছিস? কি দেখিস রোজ?"

ও বলল, "তোকে। তুই একটা বুড়ো জানোয়ারের সঙ্গে থাকিস কেন?"

"ওকে আমি আমার বাপের মতো ভালবাসি।"

ও খিলখিল করে হাসল। তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে থামল। বলল, "ভালবাসার আর লোক পেলি না! ওটা চড়ে তুই কোন দেশ জয় করতে যাবি?"

আমি ভাবলাম, যাব, একদিন যাব। পুবদিকে যাব—যে দিকে সূর্য ওঠে। একদিন আমি রাজা হয়ে ফিরব, দেখিস। আমি বললাম, "জানি না রে।"

ও হাত তুলে আমাকে আমার ঘর দেখাল। বলল, "ওই দেখ গাছের শেকড়গুলো সাপের মতো দেওয়ালের মাটিতে গর্ত খুঁড়ছে। তোর চারপাশের দেয়াল আর বেশীদিন থাকবে না; ধসে পড়বে! সময় থাকতে শত্তুরগুলোকে মুড়িয়ে কাট।"

আমি ঠাট্টা করে বললাম, "ওরা আমার মায়ের মত। কেটে ফেললে বাইরে থেকে ডালপালা দেখা যায় না, কিন্তু মনের মধ্যে ওদের শেকড় থাকে।"

শুনে ও রাগ করে চলে গেল। বলে গেল, "তোর মরণ এসেছে ঘনিয়ে। একদিন তুই দেয়ালচাপা হয়ে মরবি।"

আমি ভাবলাম, শেকড়গুলো গর্ত খুঁড়বে, আরো গভীর হবে। মনের দেয়ালে চিড় ধরবে, ফাটল হবে। তারপর একদিন চৌচির হয়ে ভাঙবে। সেদিন আমি আমার বুড়ো ঘোড়ায় চেপে পুবদিকে রওনা দেব। গাঁয়ের লোকেরা দেখবে আমার লাঠির আগায় বাঁধা পুঁটলিটা আস্তে আস্তে দূর থেকে দূরে পাকা ধানের ক্ষেতের আড়ালে মিলিয়ে গেল। ওরা জানবে, আমি ফিরে আসবো একদিন। রাজা হয়ে।

একদিন চন্দ্রা আমার ভাত নিয়ে এল না। ফাগনলালের ঘরের পাশ

দিয়ে মৌরি-ক্ষেতের কিনারায় কিনারায় যে পথটা ধরে চন্দ্রা আসে, সে দিকে চেয়ে সারা দুপুর কাটল। চন্দ্রা এল না। তার পরদিনও না। তার পরদিনও না। চন্দ্রা এল না দেখে আমি উঠে খুঁজে পেতে আমার পুরোনো মরচে ধরা দা'টা বের করে পাথরে শান দিতে বসলাম।

সারাটা দুপুর পাথরে মুখ ঘষে দা'টা ঝকঝক করে হেসে উঠল। ওর গায়ে আগুন ছুটল। দা'য়ে শান দিয়ে দিয়ে আমার হাতপায়ের মাংসগুলো ফুলে উঠল, শিরায় শিরায় গরম রক্ত ছুটল টগবগিয়ে। কেমন যেন খুশী লাগল, নেশা পেল।

ভেবেছিলাম সূর্য ডোবার আগেই অশ্বত্থের চারাগুলো কেটে ফেলব। এমন সময় চন্দ্রা এল হাতে ভাতের থালা নিয়ে। রোজ যেমন আসত।

আমি বললাম, "এতদিন আসিসনি কেন?"

ও গম্ভীর হয়ে বলে, "একটা বাঘ রোজ আমার পথ আগলে থাকে। বলে, কোথায় যাচ্ছিস? থালা নামিয়ে রাখ আমার সামনে, আর বসে বসে আমার লেজে হাত বুলিয়ে দে। নইলে তোকে যমের বাড়ি পাঠাবো। রোজ এমনি করে বাঘটা তোর ভাত খেয়ে ফেলে।"

আমি বললাম, "জানি। এ গল্প আমি মার কাছে শুনেছি। এক বুড়ী রোজ তার ছেলের কাছে খাবার নিয়ে যেত, আর পথ আগলে থাকত বাঘ।"

"হ্যাঁ, শুনেছিস্। তাতে কি? এমন বুঝি হয় না?"

আমি ভেবেছিলাম, বড় হয়ে আমি বাঘটাকে মেরে ফেলব। খিদেকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই, তেষ্টাকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। পথ আগলে যেই থাকবে তাকে সাফ করে দাও।

চন্দ্রা খিলখিল করে হাসল মুখে আঁচল দিয়ে। বলল, "তুই বাঘটাকে মারবি, না ওর লেজে হাত বুলিয়ে দিবি?"

আমি বললাম, "জানি না।"

ও বলল, "মা দেখেছিল, তুই খিদের জ্বালায় আমাদের বাড়ি যাস কি না। মা তোকে যাচাই করছিল। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে মা বলেছে, তুই মানুষ নয়। তোর বাপটা ছিল এমনি গোঁয়ার, তাই একমুখো চলে

গেছে। ঘরের পথ ফিরে চিনল না। তুইও যাবি, যাবি। কাঁদতে কাঁদতে মা ভাত বেড়ে দিল।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, অনেক ভেবে চন্দ্রা বলল, "কিন্তু আমি জানি তুই যাবি না।"

এই বলে ও চলে গেল। আমি আমার দা'টা হাতে নিলাম। এক এক কোপে অশ্বত্থের মোটা মোটা ডালগুলো খ'সে পড়তে লাগল। আমার শরীর গরম হ'ল, ছলাৎ-ছল করে রক্ত বইল শিরায় শিরায়। আমি আপন মনে হাসতে লাগলাম। শীতকালে আমাদের বুড়ো ঘোড়াটার গা থেকে ধোঁয়ার মত একটা ভাপ বেরোত। সেই ভাপে ওর রক্তমাংস আর ঘামের গন্ধ পাওয়া যেত। নিজের শরীর থেকে আমি তেমনি এক গন্ধ পেলাম। মদের যেমন স্বাদ নেই, এ গন্ধেরও তেমন ভালমন্দ নেই। এ শুধু আমাকে মাতাল করে। আমি আপন মনে হাসলাম। যেন আমার নেশা হ'ল। আমার ইচ্ছে হ'ল নিজের শরীরটাকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করি। মাটির দাওয়ায় আমি শরীরটাকে গড়িয়ে দিলাম। আমার শরীরের ঘাম মাটির সঙ্গে মিশল। শীতের শেষে বসন্তের গোড়ার দিকে আমার কাছে এক বাঁশীওয়ালা এল। তখন বাতাসে টান লেগেছে। শুকনো পাতাগুলো টুপটাপ করে ঝরে ঝরে শেষ হয়েছে। ক্ষেতের মটর শাকে পাক ধরল। যারা শুকনো কাঠ-পাতা কুড়োতে যেত তাদের দিন গেল।

এমনি একদিন শেষ দুপুরে অনেক দূর থেকে বাঁশীওয়ালা এসে আমার দাওয়ায় বসল। তার গায়ে এক শো রঙের এক শো তালি দেওয়া একটা জোব্বা, মাথায় একটা মস্ত পাগড়ি। সেই পাগড়িটা তার কপালটিকে ঢেকে ফেলেছে। রোগা দুটো পা রাঙা ধুলোয় মাখা। আমি কখনো এই বাঁশীওয়ালাকে দেখিনি।

সে বলল, "আমি বাঁশী বিক্রি করি না। বাঁশীর সুর বিক্রি করি।" এই বলে সে তার বাঁশীতে একটা অদ্ভুত সুর বাজাল।

আমি বললাম, "বাঁশীতে তুমি ওটা কি সুর বাজালে? আমি তার কতক বুঝলাম, কতক বুঝলাম না।"

বাঁশীওয়ালা তার ঘন ভ্রুর নীচে গভীর গর্তের মত চোখ দুটো দিয়ে

আমায় দেখল। বলল, "এ সুর আমি কোথাও শিখিনি বাবা, কেউ আমাকে শেখায়নি। আমার কোনো গুরু নেই। আমি হাটে মাঠে ঘাটে যা শুনি তাই বাজিয়ে বেড়াই। কখনো নোঙর-করা নৌকোয় জলের ঢেউ লাগবার সুর, কখনো শীতের শুকনো পাতায় বাতাস লাগবার সুর।"

সে আবার তার বাঁশীতে ফুঁ দিল। শেষে শীতের শুকনো বাতাসে বাঁশীর টান লাগল। কয়েকটা সুর তীরের মতো আকাশে ছড়িয়ে মিলিয়ে গেল। আমার চোখের সামনে দুপুরটা মাতালের মত টলতে লাগল যেন অনেক দূর পথ! আমাদের এই মৌরি-ক্ষেত ডিঙিয়ে ধানের আবাদের পাশ দিয়ে, পাহাড় পেরিয়ে চলেছে—চলেছে—চলেছে। কত গঞ্জ, কত ব্যাপারীর আস্তানা, কত বন্দর, ঘাট মাঠ পেরিয়ে যাওয়া দেশ। বাঁশীর সুর সেই দূর দূরান্তের আভাস মাত্র নিয়ে কোকিলের অস্পষ্ট ডাকের মত নরম, বিষণ্ণ হয়ে ফিরে ফিরে আসছে। সেই পথ ধরে, অনেক আলো, অনেক অন্ধকার মাড়িয়ে মাড়িয়ে কে যেন আসছে—আসছে— আসছে।

বড় ক্লান্ত পথ! বড় দীর্ঘ পথ! আমি চোখ বুজে ভাবলাম, সে আমার বাবা। কত দিন গেল, কত রাত গেল। ঘোড়াটা বুড়ো হ'ল। বাবা ফিরল না।

বাঁশীওয়ালা সুর পাল্টে নতুন সুর ধরল। কখন আমার চোখ ছাপিয়ে কান্না এসেছে। এ কেমন সুর যা দিনের আলোকে অন্ধকার করে দেয়?

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "এর মানে কি? আমাকে বুঝিয়ে দাও।"

বাঁশীওয়ালা থামল না।

যেন এতদিন মাঠটা ছিল রোদে পোড়া, ফাটা ফাটা। একদিন পাহাড়ে মেঘ জমল। বৃষ্টি নামল। আঝোর ধারে বৃষ্টি। মাটির কোষে কোষে জল ঢুকল। বীজধান ফুলে উঠল। বুক ফাটিয়ে শীষ বার করল আকাশে।

বাঁশীওয়ালা থামল। বলল, "এর অর্থ যেমন করে কুঁড়ি থেকে ফুল হয় আস্তে আস্তে, তোমার চোখের আড়ালে অন্ধকারে যেমন করে আস্তে আস্তে পাপড়িগুলো মেলে দেয়, যেমন করে শুকনো পাতা ঝরে

পড়ে আবার নতুন পাতায় ছেয়ে যায় গাছ—তেমনি করে তোমার দেহেও একটা ঋতু আসে আর একটা যায়।"

এই বলে বাঁশীওয়ালা আবার তার বাঁশীতে সুর দিল। যেন বলল, বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ ক'রো না। এক-একটি ঋতু যায়, আর একটি আসে। দুঃখকে সহ্য কর। ক্ষেতে আগুন লাগলে ফসল ভাল হয়।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "এ সুর তুমি কোথায় পেলে?"

সে দাঁড়িয়ে উঠে হাসল।

আমি বললাম, "আমাকে এ সুর শিখিয়ে দাও। আমি তোমার মতো জোব্বা পরে বাঁশী বাজিয়ে বেড়াব।"

বাঁশীওয়ালা ফিরে বলল, "তুমি আমাকে অবাক করলে বাবা, এ জোব্বা কি তোমাকে মানায়। আমি যেখানে যখন যেমন পেয়েছি তেমন কুড়িয়ে-বুড়িয়ে এই কাপড়ের টুকরোগুলো জুড়ে সেলাই করে এই জোব্বা বানিয়েছি। যারা সুখে আছে এ জোব্বা তারা সাধ করে পরে না। আমার মনে রঙ নেই, তাই বাইরে এত রঙের বাহার।"

বাঁশীওয়ালা চলতে লাগল। আমি দেখলাম শীতের ঘন রোদে রোগা দুটো পায়ে রাঙা ধুলো মেখে সে আস্তে আস্তে আমাদের পাড়া ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য ডাকছে না। শেষ শীতের গরম দুপুরে সেই অদ্ভুত বাঁশীওয়ালা আর তার সুর দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল।

আমি কাঁদতে কাঁদতে ভাবলামঃ এ সুর তুমি কোথায় পেলে বাঁশীওয়ালা? আমার সারাটা দিন যেন টালমাটাল-টালমাটাল। যেন আমি বিনিমদের মাতাল। যেন আমি এক পাগল বাঁশীওয়ালা। শিরা ছিঁড়ে সুর তৈরি করে—সে সুরে আমি সারাদিন গাই। কাঁদি। কেন বাঁশীওয়ালা আমাকে দিল সারাদিন বাজাবার এই বাঁশী? আমি যে একে ছাড়তে পারি না। এ যে আগুনে দিলে পোড়ে না, ঝড়ে ওড়ে না। পোষা কবুতরের মতো নড়ে-চড়ে ঘুরে বেড়ায়। উড়ে যায় না।

উঁচু-নীচু পথ। পাথর ছড়ানো। চড়াই উৎরাই ভেঙে বাঁশীওয়ালা চলেছে। শুকনো হাওয়ায় তার চামড়া ফেটেছে, পাথরে তার পা ফেটেছে। তবু তার চলবার শেষ নেই। সে পুব থেকে পশ্চিমে গেল। যেদিকে সূর্য

ওঠে সেদিক থেকে যেদিকে সূর্য ডোবে সেদিকে গেল, যে পথে আমার বাবা গেছে তার বুড়ো ঘোড়াকে রেখে, যেদিকে মা গেছে আগুনের পাশে তার ছেলেকে বসিয়ে রেখে।

বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ ক'রো না। ক্ষেতে আগুন দিলে ফসল ভাল হয়। মাটির কোষে কোষে বৃষ্টির জল ঢুকবে, বীজধান কেঁচোর মতো ফুলবে, বুক ফাটিয়ে শীষ বের করবে আকাশে। আমি জানি বাঁশীওয়ালা আর ফিরবে না। কোনোদিন না। দাওয়ায় শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে কখন আমার দিন গেল।

একদিন সকালে ঘোড়াটাকে দেখে মনে হল আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমার চোখের সামনেই বুড়ো ঘোড়াটা কখন যেন আরো একটু বুড়ো হয়ে গেছে। ওর গায়ে হেলান দিয়ে আমি আমার মাকে ভাবলাম। কিন্তু মার মুখ আমার মনে এল না। রোদ লেগে ঘাসের বুক থেকে শিশির যেমন ভাপ হয়ে মিলিয়ে যায়, তেমনি করে মা'র মুখটা হারিয়ে গেছে। শাড়ির আঁচল, পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকা শান্ত ছায়ায় ঢাকা দীঘির মত সেই চোখ আমি আগের জন্মে দেখেছিলাম।

গাঁওবুড়ো আমায় দেখে চোখ কুঁচকে বলল, "তুই যে আড়েদীঘে রীতি মতো পুরুষমানুষ হয়ে উঠলি! কখন এত ঢ্যাঙা হয়ে উঠলি, বেড়ে উঠলি আমাদের চোখের সামনে, টেরও পেলাম না।"

আমি লজ্জা পেলাম।

গাঁওবুড়ো বলল, "তোর গড়নপেটন হয়েছে তোর বাবার মতন, কিন্তু চোখ দুটো পেয়েছিস মা'র। তা এবার তো জোয়ান হলি, কাজকর্মে লেগে যা। বসে থাকিস না, দিনগুলো চলে যেতে দিস না। বুড়ো ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস, ঘর সামলে রাখিস।"

আমি ভাবলাম গাঁওবুড়োকে বাঁশীওয়ালার কথা বলব।

আমার চোখের দিকে চেয়ে গাঁওবুড়ো হাসল, "জানি রে জানি, তোর কাছে এক বাঁশীওয়ালা এসেছিল। সে মাত্র একবারই আসে। মাত্র একবার।" গাঁওবুড়ো তার নড়বড়ে মাথাটা দোলাল, "তাই তো বলছি দিনগুলো চলে যেতে দিস না। বসে থাকিস না। ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস। ঘরদোর সামলে রাখিস।"

চন্দ্রা এসে বলল, "তুই নাকি পয়সা দিয়ে বাঁশীর সুর কিনেছিস ?"

আমি বলি, "হুঁ ।"

চন্দ্রা আমার কাছে এসে বসল, "পাখি কিনেছিস, আর খাঁচা কিনিসনি? সুর কিনেছিস, আর বাঁশী কিনিসনি ? তবে তোর ঘরে রইল কি, তোর নিজের বলতে থাকল কি ? কিনতে হয় এমন জিনিস কিনবি যা হাত দিয়ে ধরাছোঁয়া যায়, চোখ দিয়ে দেখা যায়, যাকে ধরে ছুঁয়ে দেখে মনের সুখ, ভাল না লাগলে যাকে বেচে দিয়ে আবার পয়সা পাওয়া যায় ।"

এই বলে ও হাসল । বলল, "আমি আর কতকাল তোর জন্য ভাত বয়ে আনব ? তোরই তো ভাত দেওয়ার বয়স হল । তুই কাজকর্ম করবি, না সারা দিন দাওয়ায় বসে হাঁ করে আকাশ গিলবি ?"

আমি বললাম, "জানি না ।"

"গাঁওবুড়ো বলছিল ঘরে মেয়ে না দিলে জোয়ানগুলো কাজকর্মে মন দেয় না ।"

এই বলে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ও চলে গেল । আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম ওর বাসন্তী রঙের ডুরে শাড়ির আঁচল বাতাসে উড়তে উড়তে ফাগনলালের দাওয়া পেরিয়ে মৌরিক্ষেতের পাশ দিয়ে ওর শরীরের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে চলে গেল। খুব পাতলা বুটিদার একটা মেঘ রোদের মুখের ওপর দিয়ে সরে গেল । সেই ছায়াটা একটু সময়ের জন্য ওর মুখের ওপর থাকল । বাতাস ওর চারদিকে একটু খেলা করল । ওর চারপাশে উড়ে বেড়াতে লাগল কয়েকটা মৌমাছি ।

আমি বাঁশীর সুর কিনেছি বলে গাঁয়ের বুড়োরা আমার নিন্দে করল । দুঃখ করে বলল, আমার ঘরে কিছুই থাকবে না । যেমন করে আমার বাবা থাকল না, মা থাকল না । গাঁয়ের জোয়ান মরদরা এসে আমার পিঠ চাপড়ে গেল ঃ এই তো চাই । বাঁশীর সুর কিনবি, পাখির ডিম কিনবি । যেমন করে পারিস উড়িয়ে দিবি রোজগারের টাকা । আমরা জোয়ান মরদ, আমাদের রোজগারের ভাবনা কি ? দেখছিস্ না বুড়োগুলোর দশা, দু' আঙুলের ফাঁক দিয়ে পুরো আয়ুটা খরচ হয়ে গেল । ওরা আমাদের বেহিসেবী বলে । কিন্তু সামনের শীতে ওরা যখন মরবে তখন তো আমরাই থাকব । এই শুনে

আমি বুড়ো ঘোড়াটার কাছে গেলাম। ও আমার কাঁধে ওর প্রকাণ্ড মাথাটা রাখল।

কখন আমার শরীর দীঘল হয়েছে, হাত পা কোমর হয়েছে সরু, আমার চামড়ায় টান লেগেছে, রুক্ষ হয়েছে মুখ তা আমি নিজেই জানি না। কিন্তু ও যেন টের পেল। আমার কাঁধে মুখ ঘষে শরীর কাঁপিয়ে ওর খুশি জানাল। আমি ওর গাছের কাণ্ডের মতো এবড়ো-খেবড়ো মুখে আমার গাল রাখলাম। ওর রেশমের মতো কেশর আমার হাতে খেলা করল। আমি বললাম, "বুড়ো, তুই আমার বাপ। কোনো ভাবনা করিস না, আমি তোকে দেখব।"

এই শুনে পাঁজর কাঁপিয়ে ও নিঃশ্বাস ছাড়ল। ঘোড়াটা বুড়ো হয়েছে বলে দুঃখ ক'রো না। ও বুড়ো হচ্ছে তার মানে তুমি বড়ো হয়েছ। কবে শীত আসবে তার জন্য দুঃখ করে দিনগুলোকে চলে যেতে দিও না। মনে রেখ, দু আঙুলের ফাঁক দিয়ে স্রোতের জল বয়ে যায়। আটকানো যায় না। সামনের শীতে ঘোড়াটা যদি মরে, তুমি থাকবে।

"বুড়ো, তুই আমার বাপ।" আমি বললাম, "কোনো ভাবনা করিস না বুড়ো, আমি তোকে দেখব।"

ঘোড়াটা পুরোনো ঠাণ্ডা শরীর দিয়ে আমার শরীর থেকে তাপ নিল। আমি দু' হাতে ওর গলাটা জড়িয়ে চোখ বুজে রইলাম। যেন আমি পুরোনো প্রকাণ্ড একটা বটগাছের আশ্রয়ে আছি।

চন্দ্রা এসে বলল, "সারা দিন ঘরে বসে কি বকিস্ একা একা ?"

আমি শান্তভাবে ওর দিকে তাকালাম। ওর শরীর ঘামে ভিজে তেল-তেল করছে। দু' চোখে মিটমিটে আলো। এ কেমন আলো ? আমি কোনোদিন এমন আলো দেখিনি। ওর শরীর থেকে কেমন একটা মাতাল মাতাল গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। আমি ভাবলাম, বোধহয় কোনো ফুলের গন্ধ। এ কেমন ফুল ? জানি না। কেমন তার রঙ্ ? জানি না।

ও আমার হাত টেনে বলল, 'চল্, তোকে আজ একটা নতুন জিনিস দেখাব।"

"কি জিনিস ?"

ও ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, "সে একটা রাজার বাড়ি। খুব অদ্ভুত।"

"কোথায় সেটা?"

ও হাসল, "আছে আছে। তোর খুব কাছেই আছে। অথচ তুই দেখিসনি।"

চন্দ্রা ওর বুকের কাপড় সরিয়ে নিল। তারপর কাপড়টা ওকে একা রেখে মাটির ওপর ছড়িয়ে পড়ল। চোখে হাত চেপে ও বলল, "এ এমন রাজা যে দখল নেয় না, দখল ছাড়েও না। আমি সারাদিন সব কাজ ফেলে তার বাড়ি পাহারা দেব কেন?"

ওর বেলেমাটির মতো শরীরের দিকে চেয়ে আমি ভয় পেলাম।

চোখে হাত চেপে ও কাঁদছিল; "আমার সারা দিনের কাজ পড়ে থাকে। আনমনে আমার বেলা বয়ে যায়। তোর বাঁশীওয়ালা কি তোকে এ কথা বলেনি?"

সেই অচেনা ফুলের গন্ধ বাতাসে ভাসছে। এ কেমন ফুল জানি না। কেমন তার গন্ধ জানি না। আমার বুক ফেটে কান্না এল। আমি ভেবেছিলাম, যে বাঘটি রোজ পথ আগলে থাকে, বড় হয়ে তাকে মেরে ফেলব। কিন্তু ক'টা বাঘকে মারব আমি? গাঁওবুড়ো বলেছিল, ঘরদোর সামলে রাখিস। গাঁয়ের বুড়োরা বলেছিল, বাঁশীর সুর কিনিস না।

চন্দ্রা দু' হাতে আমার মাথাটা টেনে নিল। বলল, "আমি তোকে কতক বুঝি, কতক বুঝি না।"

ওর বুক, ছিঁড়ে-নেওয়া ফুলের বোঁটার মত আমার কপালে, চোখের পাতায় নরম হয়ে লেগে লেগে মুছে গেল।

ও বলল, "একদিন তুই পাহাড়ে যাবি কাঠ কুড়োতে। সেদিন আমি তোর ঘর পাহারা দেব। পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালব বাইরে, যেন তুই পাহাড় থেকে দেখতে পাস।"

বাঁশীওয়ালা তার প্রথম সুরে বলেছিল, ঘর বলতে তোর কোনো কিছুই নেই। কোনোদিন ছিল না। বৃথাই তুই সারা বিকেল আগুন জ্বলে পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলি। যারা পাহাড়ের ওপারে গেছে তারা আর ফিরবে না। আমি কাঁদতে লাগলাম।

চন্দ্রা কেঁদে কেঁদে বলল, 'তুই যদি আমাকে ছেড়ে না যাস, আমি‌ও যাব না। আমরা ঘর বাধব।"

ওর চোখের জলে আমার মাথা ভিজল। আমি ভয় পেয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ও আমাকে ওর বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিল। চুমু খেল আমার ঠোঁটে। জন্মের পর আমরা যেমন ছিলাম তেমনি হয়ে শুয়ে রইলাম।

বসন্তকাল প্রায় শেষ হয়ে এল। আমার বুড়ো ঘোড়াটা আরো বুড়ো হয়েছে। খুটখুট করে সারাদিন ঘাস খায়, কখনো ঝিমোয়।

বাতাসে গরম হলকা ছুটল। বুড়োরা বলল, "এইবার আকাল এল। ঘাট শুকোবে, মাঠ ফাটবে। সেই বর্ষা যতদিন না আসছে।"

কাছাকাছি মাঠের ঘাসগুলো হলদে হয়ে এল। তাই আমি একদিন বুড়ো ঘোড়াটাকে দূরের মাঠে নিয়ে ছেড়ে দিলাম। সন্ধ্যেবেলা ও নিজেই খুট্‌খুট্‌ করে ঘরে ফিরতে লাগল। কিন্তু একদিন ও ফিরল না। সারা সন্ধ্যে আমি দাওয়ায় বসে রইলাম পথের দিকে চেয়ে। দূরের পাহাড় ঝাপসা হয়ে এল। ও এল না। আকাশে মস্ত বড় চাঁদ উঠলো। জ্যোৎস্নার বান ডাকল দিগন্ত জুড়ে। কিন্তু পেটের নীচে নিজের বাঁকাচোরা বুড়ো ছায়াটা নিয়ে ঠুক্‌ঠুক্‌ করে ও ফিরল না। অনেক ভেবে আমি হাতে দড়ির ফাঁস নিলাম। তারপর পথে নামলাম। মনে মনে বললাম: যখন আমি ছোট ছিলাম তখন কেউ কেউ আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু বুড়ো, তোকে আমি চলে যেতে দেব না। আমি তোকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখব। চলতে চলতে আমি ধানক্ষেত ছাড়িয়ে, মরা মটরশাকের ক্ষেতের পাশ দিয়ে, বুড়ো বটের তলায় মহাবীরের থান পেরিয়ে গেলাম। তারপর দিগন্তজোড়া মাঠ। মাঠে বান-ডাকা সমুদ্রের মত টলটল করছে জ্যোৎস্না। কিন্তু তার কোথাও আমার বুড়োর ছায়া নেই।

আমি পাগলের মতো সারা মাঠ বুড়োকে খুঁজতে লাগলাম। আমার ভাঙা গলার ডাক আমাকে ঘিরেই ঘুরতে লাগল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "বুড়ো, আমি তোকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখব।"

আমি মাঠ পেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকলাম। আমার চারধারে ঘন গাছ।

আলো আর ছায়ার মধ্যে আমি হাঁটতে লাগলাম। তারপর আমি ভয় পেলাম। আমার মনে হ'ল কেউ যেন আছে। কাছেই—পাশেই। মৃত শুকনো পাতাগুলোতে শব্দ হল। মনে হল, যেন কোনো আত্মা আমার পিছু নিয়েছে। আমার গায়ে কাঁটা দিল। যেন সেই আত্মা আমার হাত ধরল, তারপর আমাকে আমার চেনা পথ ভুলিয়ে নিয়ে চলল কোথাও। আমি ভাঙা গলায় বুড়োকে ডাকতে লাগলাম। বন পার হয়ে আমি একটা জলার ধারে এলাম। তাকিয়ে দেখলাম, আমি এর আগে কখনো এখানে আসিনি। এত জ্যোৎস্না আমি কোনোদিন দেখিনি। জলাটা মস্ত বড়। তার ওপাশে বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ও যেন কিছু শুনছে, কিছু দেখছে। আমি ডাকলাম, "বুড়ো বুড়ো।"

ও শুনল না। তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আস্তে আস্তে ওর কাছে গেলাম, ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম, "বুড়ো, তোকে আমি পেয়েছি।"

ও ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখল। তারপর ভয় পেয়ে ও সরে গেল। আমি বুঝলাম, ও আমাকে চিনতে পারল না। আমি ওর কাছে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ও চীৎকার করে আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ছুটতে লাগল। ওর ছায়াটা এবড়ো-খেবড়ো মাঠের ওপর টাল খেতে লাগল। আমি ওর পিছনে ছুটলাম। প্রাণপণে ওকে ডাকলাম। সেই ভীষণ ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্নার মধ্যেও বুড়ো আমাকে চিনতে পারল না। আমি দড়ির ফাঁসটা মুঠো করে ধরলাম। তারপর শেষবারের মত ওকে ডাকলাম। ও শুনল না। কাকে যেন ও দেখতে পেয়েছে। কে যেন ওকে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি ফাঁসটা ছুঁড়ে দিলাম। ও দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার হাত-ধরা দড়িটা থরথর করে কাঁপল। আমি বুঝলাম ফাঁসটা ওর গলায় পড়েছে।

আমি বললাম, "বুড়ো, আমি তোকে চলে যেতে দেব না। দেব না।"

আমি কাছে এগোতেই বুড়ো চীৎকার করে ছুটতে চাইল। ফাঁসের দড়িটা কাঁপতে লাগল থরথর করে।

বুড়ো দড়িটা ছিঁড়ে চলে যেতে চাইল। আমি দড়িটা ছাড়লাম না। বললাম, "বুড়ো, আমি তোকে চলে যেতে দেব না। দেব না।"

ও চাৎকার করে বারবার যেন আমাকে অভিশাপ দিল। আমি বললাম, "বুড়ো, আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই দেব।"

বুড়ো শুনল না। ও ছেড়ে যেতে চাইল। আমি ধরে রইলাম।

কিন্তু বুড়োকে একসময়ে থামতে হ'ল। চারটে পা ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়াল বুড়ো। তারপর কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ল।

কাছে গিয়ে দেখলাম ফাঁসটা ওর গলায় আটকে গেছে। ও দম নিতে পারছে না। আমি কপালের ঘাম মুছে বললাম, "বুড়ো, তোকে আমি যেতে দেব না। আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই দিয়েছি।"

এই বলে আমি ওর গলার ফাঁসটা খুলতে চাইলাম। কিন্তু ফাঁসটা খুলল না। নীচু হয়ে দেখলাম দড়ির গায়ে ছোট্ট একটা গিটে ফাঁসটা আটকে গেছে, গভীর হয়ে বসেছে বুড়োর গলায়।

আমি প্রাণপণে চেষ্টা করলাম। কপালে বিন্‌বিনে ঘাম ফুটল। কিন্তু ফাঁসটা নড়ল না। বুড়ো ছটফট করতে লাগল। আমি দড়িতে দাঁত দিলাম। দড়িটা লোহার মতো বসেছে। আমার গলার রগ ফুলল, রক্তে ভরে গেল সারাটা মুখ। বুড়ো আমার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে স্থির হয়ে এল। আমি ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে চীৎকার করে বললাম, "বুড়ো, আমি ফাঁসটা খুলব, খুলব।"

বুড়ো আমার দিকে তাকাল। আমার পা থেকে পিতৃহত্যার সমস্ত পাঁপ মুছে নিতে চাইল। তারপর সেই ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্নার ভেতর ওর ত্বটো চোখ ঘোলা হয়ে গেল। আমি বললাম, "বুড়ো, এই ফাঁসটা দিয়ে আমি তোকে ধরতে চেয়েছিলাম।"

আমি দড়িটা ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের পথ ধরলাম। ভাবলাম—আমার হাত দিয়ে কে তোকে মেরেছে আমি তা জানি না। জানি না।

আমার বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। আমার মা গিয়েছিল পাহাড়ে, পাতা কুড়োতে। আমাদের ঘোড়াটা গিয়েছিল জলার ধারে, ঘাস খেতে। কেউই আর ফিরল না।

গাঁওবুড়ো একদিন সবাইকে ডেকে বলল, "শোনো তোমাদের এক গল্প বলি। গাছের তলায় ধুনী জ্বেলে একটা সাধু বসে থাকত। তাকে মস্ত

বড় সাধু ভেবে গৃহস্থরা তার চারধারে হাতজোড় করে থাকত। একদিন একটা লোক এসে বলল, সাধুবাবা, আমার ইচ্ছে তোমাকে কিছু খাওয়াই। সাধু রাজী হ'ল। লোকটি কিছু রুটি কিনে আনল। তারপর আবার বলল, সাধুবাবা, তুমি এই শুকনো রুটি কি করে খাবে? তোমার লোটাটা দাও, দুধ নিয়ে আসি। সাধু খুশী হয়ে লোটা দিল। লোটা নিয়ে লোকটা সেই যে চলে গেল আর ফিরল না।"

সবাই বলল, "তারপর?"

গাঁওবুড়ো বলল, "তারপর লোটার শোকে সাধুর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সে কি কান্না। সবাইকে ডেকে ডেকে বলে, "দেখ দেখ, চোট্টার কাণ্ড দেখ, আমাকে এক পোয়া রুটি খাইয়ে আমার রূপোর লোটাটা নিয়ে ভেগেছে।"

সবাই বলল, "তারপর?"

গাঁওবুড়ো হাসল, "যার লোটা চুরি যায় সে বোকা। কিন্তু সেই লোটার শোকে যে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে সে আরও বোকা।"

এই বলে শীত আসবার আগেই গাঁওবুড়ো মরে গেল। গাঁয়ের বুড়োরা জমায়েত হয়ে বলল, "জন্মের পর মৃত্যু, তারপর আবার জন্ম। ঠিক যেমন ঢেউয়ের পর ঢেউ। চলতে চলতে পড়ে যাওয়া, আবার ওঠা। কে যেন আমাদের নিয়ে দিনরাত এই খেলা খেলছে। এ খেলার শেষ নেই।"

শীত আসছে শুনে বুড়োরা ভয় পেল। বলল, "এবার ঘর ছাড়তে হবে।"

কেউ বলল, "ঘর আর কোথায়! ঐ তো নড়বড়ে পাতার ছাউনি, রোদ মানে না, জল মানে না।"

বুড়ো ঘোড়ার মতো খুট্‌খুট্‌ করে শীত এল। তারপর বুড়োদের কাঁধে মাথা রেখে তাদের দেহ থেকে তাপ শুষে নিতে লাগল। বুড়োরা পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালল। গোল হয়ে ঘিরে বসল। তারপরে প্রাণপণে বলতে লাগল, "কে যেন জন্মের পর স্রোতে ভাসিয়েছিল! তাই চেয়ে দেখলাম মাথার ওপর ছাদ নেই, চারিদিকের দেয়াল নেই।"

কেউ বলল, "অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে পথ চলছিলাম কোন ভিন-গাঁয়ের সীমানা ডিঙিয়ে। তারপর অন্ধকার হ'ল, যারা ছিল সাথের সাথী

তাদের মুখ দেখা যায় না, পাশে কে চলছে জানা যায় না। অন্ধকারকে গাল পাড়ি, কিন্তু ঠাহর করে দেখলে এ অন্ধকারও সুন্দর।”

কেউ বলল, “যাব আর কোথায়, সেই ফিরে আসতেই হয়। অণু অণু হয়ে আমি বাতাসে মাটিতে মিশব। কিন্তু দেখো, তারপর একদিন পাহাড়ে মেঘ জমবে বৃষ্টি আসবে, বাতাস ভিজবে, মাটির কোষে কোষে ঢুকবে জল। তখন আমি ফুল হয়ে ফুটব, নদীর জল হয়ে বয়ে যাব, বাতাস হয়ে খেল্‌ব, মেঘ হয়ে ভাসব।” এইসব শুনে গাঁয়ের জোয়ানগুলো হাসল।

তাই আমি চন্দ্রাকে নিয়ে ঘর বাঁধলাম।

আমার মা বলেছিল, “বাইরে একটি আগুন জ্বেলে রেখো। পাহাড় থেকে আমি যেন দেখতে পাই তুমি ঘরে আছ, তুমি ভাল আছ। ঘর সামলে রেখো, কোথাও যেও না।”

দাইমা বলেছিল ঃ আমার কাছে চল। আমার ছেলে নেই, তোকে ছেলের মত পাল্‌ব।

বাঁশীওয়ালা বলেছিল ঃ বৃষ্টির জল লেগে বীজধান ফুলবে। বুক ফাটিয়ে শীষ বের করবে আকাশে। বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ ক’রো না। একটা ঋতু আসে, আর একটা যায়।

গাঁওবুড়ো বলেছিল ঃ ঘরদোর সামলে রাখিস। বুড়ো ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস। বসে থাকিস না, দিনগুলো চলে যেতে দিস না। মনে রাখিস বাঁশীওয়ালা মাত্র একবার আসে।

গাঁয়ের বুড়োরা বলেছিল ঃ বাঁশীর সুর কিনিস না। তা হলে তোর ঘরে কিছুই থাকবে না।

আমি বলেছিলাম ঃ বুড়ো, তুই আমার বাপ। ভাবনা করিস না, আমি তোকে দেখব।

আমি আগুন জ্বেলেছিলাম। ঘর আগলে ছিলাম। তবু কেন যে আমার বাবা গেল বিদেশে, রোজগার করতে। আমার মা গেল পাহাড়ে, পাতা কুড়োতে! আমার ঘোড়াটা গেল জলার ধারে, ঘাস খেতে।

# এক হাত গণ্ডারের ছবি

## অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

চার্চের ঠিক সামনে এক পাগল। সে হাঁকছিল, 'তু ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর।' ওর হাতে লাঠি এবং লাঠিতে পালক বাঁধা। মাথায় লাল রুমাল। দূরে বেরন হোটেলের পর্দা উড়ছে। পাগল চার্চের সদর দরজা থেকে বেরন হোটেলের দরজা পর্যন্ত ছুটে আসছিল বার বার আর ডিগবাজি খাচ্ছিল। সে কোন যানবাহন দেখছিল না, সে এক পাগলিনীর জন্য যেন প্রতিক্ষা করছিল কারণ পাগলিনী অন্য পারে ঠিক পেচ্ছাবখানার পাশে এবং কিছুদূর হেঁটে গেলে অনেক কাপড়ের দোকান, ছায়া ষ্টোরস্ অথবা হরলালকা আর গ্রীষ্মের দিন বলে প্রখর উত্তাপে পাগলিনী নগ্ন এবং বধির, পাগলিনী পথের উপর বসে পড়ল।

ঠিক তখন চার্চের দরজার সামনে শববাহী শকট। সোনালী ঝালরের কাজ করা কালো কফিনে মৃত পুরুষ এবং কত ফুল। শোকের পোশাক পড়া যুবক যুবতীরা, বৃদ্ধেরা সদর দরজা ধরে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। সকাল হচ্ছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। বড় বড় গাছের মাথায় সূর্য অকারণ কিরণ দিচ্ছে। তখন পাগল হাঁক দিয়ে সকলকে যেন বলছিল, 'কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়।' অথবা নানা রকমের অশ্লীল আলাপ—যা শোনা যায় না—যার জন্য পথে হাঁটা দায়। তখন পথ ধরে কোটিপতি পুরুষের স্ত্রী দামী গাড়ীতে নিউ মার্কেট যাচ্ছে। পথে দেবদারু গাছ এবং গাছের ছায়া পাগলিনীর মুখে। পাগল ঊর্ধ্ববাহু হয়ে পাখীর পালক উড়াচ্ছে আকাশে। পাগলিনী বসেছিল, আর উঠছে না। এই সব দৃশ্য এ-অঞ্চলে হামেশাই ঘটছে, পুলিশের প্রহরা এবং তীর্যক সব দৃষ্টির জন্য যানবাহন থেমে থাকছে না। বড় নোংরা এই অঞ্চল। দেয়ালে দেয়ালে বিচিত্র সব নগ্ন দৃশ্য চিত্রতারকাদের এবং রাজাবাজার পর্যন্ত অকারণ

অশ্লীলতা। হামেশাই পথে ঘাটে নগ্ন যুবতীরা পাগলিনী প্রায় শুয়ে থাকছে। সব অসহ্য।

এবং মনে হয় এরা সকলে রাতে ফুটপাথে নিশি যাপন করেছিল। এখন এরা নিজেদের ছেঁড়া কাঁথার সঞ্চয় ছেড়ে রোজগারের জন্য বের হয়ে পড়বে। পাগল তার সঞ্চয় সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিল। কিছুই ফেলা যায় না। সে নারকেলের মালা এবং সিগারেটের বাক্স দিয়ে মালা গেঁথে গলায় পরেছিল—পিঠে পুরাতন জামার নীচে পচা ঘায়ের গন্ধ। সে শুধু এখন হাসছিল। পথে লোকের ভীড় বাড়ছে, ট্রাম বাসের ভীড় বাড়ছে। মানুষের মিছিল সারা দিনমান চলবে। পাগল হেসে হেসে সকলকে উদ্দেশ্য করে বলছিল, 'তু ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর।' সে এখন অন্য কোন সংলাপ আর খুঁজে পাচ্ছিল না।

গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ এবং ছায়াবিহীন এই পথ। ফুটপাথে অথবা গাড়ী বারান্দায় যারা রাত যাপন করছে, যারা ঠিকানাবিহীন, যাদের সব তৈজসপত্র ছেঁড়া, নোংরা এবং প্রাচীনকাল থেকে সব সংরক্ষণ করছে—নগরীর সেইসব প্রাচীন রক্ষিরা এখন অন্নের জন্য ফেরববাজের মত ঘোরাফেরা করছে। ছেঁড়া সব তৈজসপত্রের ভিতর এক অতিকায় বৃদ্ধ, মুখে দাড়ি শন পাটের মত এবং সাদা মিহি চুল আর অবয়বে রবীন্দ্রনাথের মত যে, কপালে হাত রেখে গ্রীষ্মের সূর্যকে দেখার চেষ্টা করছে।

অন্য ফুটপাতে পাগল ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আছে। ওর এই পাগলকে যেন কতকাল থেকে চেনা। বড় স্বার্থপর—বৃদ্ধ এই ইচ্ছাকৃত পাগলামীর জন্য একদিন রাতে তখন নগরীর সকল মানুষেরা ঘুমিয়ে পড়েছে; তখন হাসপাতালের বড় আলোটা পর্যন্ত নিভে গিয়েছিল, রাজবাড়ীর সদর বন্ধ হচ্ছে এবং যখন শেষ ট্রাম চলে গেল, যানবাহন বলতে পথে কোন কপর্দক পড়ে নেই · সব নিঃশেষ, শুধু কুকুরের মাঝে মাঝে আর্ত চীৎকার তখন পাগল ঐ পাগলিনীর পাশে শুয়ে নোংরা তৈজসপত্রের ভিতর থেকে ছোট ছোট উচ্ছিষ্ট হাড় ( আমজাদিয়া অথবা বেরন হোটেল থেকে সংগ্রহ করা ) দুজনে চুষছিল। রাতের দ্বিপ্রহরে ওদের উদরে মাংসের রস যাচ্ছে, ওরা সারা দিনমান পাগলামীর জন্য ফের প্রস্তুত হতে পারছে—বৃদ্ধ হাঁ করে

দেখতে দেখতে বলেছিল, 'এই সরে বোস, এটা পাগলামীর জায়গা নয়। ঘুমোতে দে। রাজ্যের সব নোংরা এনে জড় করেছিস?'

পাগল কিছুক্ষণ ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকল। কথাটা বোধগম্য হয়নি। কিন্তু পাগলিনী সুলভ রমণীর মত কাছে এসে বলল, 'তোর বাপের জায়গা!' ঠিক ভাল মানুষের মত, ঠিক সুলভ রমণীর মত এবং দিনের জন্য অভিনয়টুকু তখন আর ধরা পড়ছে না, পাগলিনী গলাটা খাটো করে বলল, 'তোর মুখে চুনকালী পড়বে।'

পাশে তের বছরের সুমি চীৎকার শুনে উঠে বসেছিল। রাতে এবং পিতামহের হাত ধরে ফুটপাথের অন্য প্রান্তে চলে গিয়েছিল। ওরা পাগলিনীর ঝোলাঝুলির ভিতর পচা গন্ধ পাচ্ছিল কারণ এই ঝোলাঝুলি বরফ ঘরের মত—সবই দুর্দিনের জন্য সংরক্ষণ করা এবং কত রকমের সব উচ্ছিষ্ট খাবার। পাগলিনী চিৎ হয়ে শুয়েছিল। মাংসের হাড় অনবরত চোষার জন্য গালের দুধারে ঘায়ের মত সাদা দাগ। শরীরে দীর্ঘদিনের ময়লার পলেস্তারা মুখের অবয়বকে নষ্ট করে দিয়েছে। চেনা যাচ্ছিল না ওরা জন্মসূত্রে কোন গ্রাম্য গৃহস্থের ঔরসজাত না অন্য কোনভাবে অথবা কোন অলৌকিক ঘটনার নিমিত্ত এই ফুটপাথ সংলগ্ন ডাকবাক্সের মত পাতলা অস্থায়ী প্লাইউডের বাড়ীতে বসবাস করছে।

পাশের বাড়ীটা চারতলা এবং নীচে ফুটপাথের উপর ছাদের মত গাড়ী-বারান্দা। সামনে হাসপাতাল এবং রাজবাড়ী, সদর দরজার উপর একটা এক হাত লম্বা গণ্ডারের ছবি ঝুলছে। সময়ে অসময়ে বৃদ্ধ ছবিটার নীচে কয়েকজনের নাম উচ্চারণ করে পড়ার সময় 'নাট্যকার' এই শব্দটি ভয়ঙ্কর-ভাবে কষ্ট দিতে থাকে। আর হাসপাতালের বাড়ীটা দীর্ঘদিন খালি পড়েছিল, শুধু কাক উড়ত ছাদে এবং পাঁচীলের পাশের পেয়ারা গাছটাতে একজোড়া ঘুঘু পাখী আশ্রয় নিয়েছিল। ইদানীং চুনকাম হবার সময় মোষের মত এক ইতর ছোকরা কিছু চুনগোলা জল ছাদ থেকে নালীর ফুটোর উপর ফেলে দিয়েছিল। সেই মোষটা হালফিলে সকল খবর নিয়ে গেছে এবং চেটেপুটে রেখে গেছে সুমিকে। চুনগোলা জলের জন্য ঘুঘু পাখীরা উড়ে চলে গেল। তারপর একদিন যেন মনে হল ফের এম্বুলেন্স

আসতে শুরু করেছে, ফের এই বাড়ীতে আলো জ্বলে উঠল এবং ট্রাম ডিপোতে ফের ঘন্টি বাজছে।

আর এই বাড়ীটার জন্যই ভোরের দিকে সূর্যের উত্তাপ ছাদের নীচে যেন পৌঁছতে পারে না অথবা লম্বা হয়ে যখন সূর্য হাসপাতালের মৃত মানুষের ঘর অতিক্রম করে পেয়ারা গাছের মাথায় এসে পৌঁছায় তখন ছাদের ছায়া বৃদ্ধ ফকীরচাঁদকে রক্ষা করতে থাকে। এই জন্যই অভ্যাসের মত এই স্থান বসবাসের উপযোগী। সুমি পাশে নেই—কোথাও আহারের জন্য অন্ন সংস্থান করতে গেছে। সে নিজে একটা শতচ্ছিন্ন চাদর ফুটপাথে বিছিয়ে তার পাশে কিছু কিছু গোটা গোটা অক্ষরে—তার জীবনের বিগত ইতিহাস --পরাজিত সৈনিকের মত মাথা হেঁট করে ধিক্কৃত জীবন এবং গ্লানিকর জীবনের জন্য করুণা ভিক্ষা করছিল।

গ্রীষ্মের উত্তাপ প্রচণ্ড। দীর্ঘদিন থেকে অনাবৃষ্টি। সব কিছু রোদের উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে। পথের গলা পীচে করপোরেশনের গাড়ী বালি ছিটিয়ে গেছে। তখন পাগল পীচগলা পথে, মাথায় দুপুরের রোদ, লাঠিতে পাখীর পালক বাঁধা—হাঁটছে। ইতস্তত সব ডাষ্টবীনের জংসন এবং সেখানে হয়ত সুমি পোড়া কয়লা কাগজ অথবা লোহার টুকরো খুঁজছে। ফকীর চাঁদ উঠে এক মগ চা সংগ্রহ করল। রাতের আহারের জন্য খড়কুটো অথবা পাতলা কাঠ সংগ্রহ করতে হয়—ফকীরচাঁদ আকাশ দেখল, আকাশ থেকে গনগনে আঁচ ঝরে পড়ছে, সে এই রোদে বের হতে সাহস করল না। সে হাত বাড়াল রোদে—যথার্থই হাত পুড়ে যাচ্ছে যেন, শুধু রাজবাড়ীর সদর দেউড়ীতে এক হাত গণ্ডারের ছবিটা এই রোদে চিক চিক করছিল।

বৃদ্ধ ফকীরচাঁদ এবার পা দিয়ে নিজের সুন্দর হস্তাক্ষর মুছে দিল। পাঁচীল সংলগ্ন ওর ছোট প্লাইউডের সংসার—বসবাসের উপযোগী নয়, শুধু তৈজসপত্র রাখার জন্য পাতলা প্লাষ্টিকের চাদর দিয়ে সব ঢাকা। ফকীরচাঁদ সব টেনে বের করল—মেটে হাঁড়ি পাতিল, ছেঁড়া কাঁথা, ভাঙা জলের কুঁজো সবই সুমির সংগ্রহ করা, মেয়েটার সারাদিন ঘুরে ঘুরে ঐ এক সংগ্রহের বাতিক এবং সুমিই একদা শেয়ালদা ষ্টেশন থেকে এই বাড়ী সংলগ্ন গাড়ী বারান্দা আবিষ্কার করে ফকীরচাঁদের হাত ধরে চলে এসেছিল।

সেই থেকে দিনগত পাপক্ষয়। সে এ-সময় ভাল করে চারিদিকটা দেখল। মগের চা কিছু খেয়ে কিছু রেখে দিল, পাশে পাগল পাগলিনীর আস্তানা। দুজনই সারাপথে অভিনয়ের জন্য বের হয়ে গেছে। দুজনই হোটেলের উচ্ছিষ্ট খাবার রাতের জন্য সংগ্রহ করছে।

প্রখর উত্তাপের জন্য পথ জনবিরল। দোতলায় মসজিদ এবং সেখানে মোল্লার আজান। ফকীরচাঁদ এবার চীৎকার করে ডাকল—সু...উ...মি। ফকীরচাঁদ কপালে হাত রেখে দেখল ট্রামডিপোর সামনে ডাষ্টবিন এবং সেখানে সুমি উপুড় হয়ে কি খুঁজছে। সে কোথাও আজ বের হল না ভিক্ষার জন্য, ফকীরচাঁদ মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ক্ষোভে দুঃখে ফের বড় বড় সুন্দর হস্তাক্ষরে ফকীরচাঁদ ফুটপাথ ভরিয়ে তুলল। সামনের বড় বড় বাড়ীগুলোর দরজা জানালা বন্ধ। ট্রাম ফাঁকা এবং বাসযাত্রী উত্তাপের জন্য কম। সে সুন্দর হস্তাক্ষরের উপর থুথু ফেলল তারপর রাগে দুঃখে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। সুমি আসছে না, ওর গলার আওয়াজ প্রখর নয়, সুতরাং সুমি ফকীরচাঁদের কথা শুনতে পাচ্ছে না। ফকীরচাঁদ নিজেকে বড় অসহায় ভাবল—এই দুর্দিনে সে যেন আরও স্থবির হয়ে যাচ্ছে, চলৎ-শক্তি হারিয়ে ফেলছে, ক্রমশ জীবন থেকে সোনার আপেলের স্বপ্ন ফুরিয়ে যাচ্ছে। এত বেলা হল, তখনও পেট নিরন্ন, সামনের হোটেলটাতে এখন গিয়ে দাঁড়ালে সুমি নিশ্চয়ই কিছু পেত, কারণ শেষ খদ্দের ওদের চলে যাচ্ছে। ফকীরচাঁদ অভিমানে নিজেই উঠে যাবার জন্য দাঁড়াতে গিয়ে প্রথম পড়ে গেল, পরে হেঁটে হেঁটে রেস্তোরার সামনে যখন উপাসনার ভঙ্গীতে মাথা হেঁট করে দাঁড়াল, যখন করুণাই একমাত্র জীবন ধারণের সম্বল এবং আর কিছু করণীয় নেই এই ভাব—তখন সে দেখল সব সোনা রূপোর পাহাড় আকাশে। আকাশ গুড় গুড় করে উঠল, মেঘে মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে আর বাতাস পড়ে গেল, দরজা জানালা খুলে এবং বৃষ্টির জন্য সর্বত্র কোলাহল উঠছে।

আর তখনই চার্চের দরজাতে শববাহী শকট মাঠের মসৃণ ঘাস পার হয়ে অন্য এক ইচ্ছার জগতে উঠে যাচ্ছে। ফুটপাথ ধরে অজস্র যাত্রী—গুণে শেষ করা যায় না, ফকীরচাঁদ অন্তত সময়ের প্রহরী হিসাবে গুণে

শেষ করতে পারছে না। বাস ষ্ট্যাণ্ডে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা পর্যন্ত কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করল কারণ দীর্ঘ সময় এই অনাবৃষ্টি···ফলে নগরীর দূরতম প্রান্ত আর দূরের মাঠ ঘাস সবাই ক্লিষ্ট—সকলে দরজা জানালা খুলে বৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকল। ফকীরচাঁদ একটু বৃষ্টিতে ভেজার জন্য পথে গিয়ে বসল। আজ অফিস পাড়ায় এই বৃষ্টি উৎসবের মত। সকলে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য মাঠে এবং জলের ভেতর ছুটোছুটি করছিল।

এবং পাগল যে শুধু হাঁকছিল, 'তুঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর', যে শুধু হাঁকছিল, 'কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়'—সে এখন কিছু না হেঁকে শান্ত নিরীহ বালকের মত অথবা কোন কৈশোর জীবনের স্মৃতিকে স্মরণ করে আকাশে মেঘের খেলা দেখছিল। আর পাগলের পাখীর পালক তখন লাঠি থেকে উড়ে গেল—পাগল পালকের জন্য ঝড়ের সঙ্গে ছুটছে।

পাগলিনী নিভৃতে ট্রাম ডিপোর বাইরে লোহার পাইপের ভিতর শুয়ে বৃষ্টির খেলা দেখছিল। সে নখে দাত খুঁটছে। পাগলকে ছুটতে দেখে খপ করে পাগলের পা চেপে ধরল এবং বলল, 'ছাখ কেমন বৃষ্টি আসছে।'

'হায় আমার পাখী উড়ে গেল, বৃষ্টি দেখে পাখী উড়ে গেল···' পাগল হাউ হাউ করে কাঁদছে।

দীর্ঘদিনের উত্তাপ, অনাবৃষ্টি বৃষ্টির জলে ভেসে গেল। পাগল বৃষ্টি দেখে পালকের কথা ভুলে গেছে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টির জল ওদের শরীরে মুখে পড়ল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি হচ্ছিল। সুমি ওর ক্লিষ্ট চেহারা নিয়ে কোন রকমে দৌড়ে ফকীরচাঁদের কাছে চলে এল। বৃষ্টির ফোটা হীরের কুচির মত ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। পথের যাত্রীরা যে যার মত গাড়ীবারান্দায়, বাস ষ্টপের সেডে এবং দোকানে সাময়িক আশ্রয়ের জন্য ঢুকে গেল—ওরা সকলেই যেন প্রাচীন কাল থেকে কোন বিস্তীর্ণ কবরভূমি হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত-ওরা সবুজ শস্যকণা এই বৃষ্টির জলে ভাসতে দেখল।

পরদিন ভোরে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে 'কলকাতায় বছরের প্রথম বর্ষণ' এই শীর্ষকে প্রবন্ধ এবং ঠিক প্রথম পাতার

উপরে বড় এক ছবি, আর যুবতী নারী জলের ফোটা মুখে চন্দনের মত মেখে নিচ্ছে। অথবা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের ছবি, দুর্গের বুরুজে জালালী

বৃষ্টি সারারাত ধরে হয়েছে। কখনও টিপ টিপ কখনও ঘোর বর্ষণ এবং জোরে হাওয়া বইছিল। ভোরের দিকে যখন কর্পোরেশনের গাড়ী গলা জলে নেমে ম্যানহোল খুলে দিচ্ছিল, যখন ট্রাম-বাস বন্ধ, যখন বৃষ্টির জন্য ছাতার পাখীরা কলকাতার মাঠ পার হয়ে গঙ্গার পাড়ে, অথবা হুগলী নদীর পাড়ে পাড়ে সব চটকলের বাবুরা বাগানে ফুলের চারা পুতে দিচ্ছিল তখন বৃদ্ধ ফকীরচাঁদ কলকাতায় গলা জল থেকে আকাশ দেখল। পাশে সুমি। সে পেটের নীচে হাত দিয়ে রেখেছে—ভয়, নীচে যে সন্তান জন্মলাভ করছে, ঠাণ্ডায় ওর কষ্ট না হয়।

পাতলা প্লাইউডের ঘর এখন জলের তলায়। মরা ইঁদুর ভেসে যাচ্ছিল জলে। জানালায় যুবক যুবতীর মুখ—ওরা বৃষ্টির জলে হাত রেখে বড় বড় হাই তুলছিল। কিছু টানা রিক্স চলছে, ট্রাম রাস্তার উপরে যেখানে জল কম, যেখানে একটা মরা কুকুর পড়ে আছে টানা রিক্সগুলো সেই সব পথ ধরে প্রায় হিক্কা তোলার মত এগুচ্ছে। এই বর্ষায় পীচের পথ সব ভগ্নপ্রায়, মাঝে মাঝে ভয়ানক ক্ষতের মত দাগ, সুতরাং রিক্স চলতে গিয়ে ভয়ঙ্কর টাল খাচ্ছে। বর্ষার জলে পথ ভেসে গেছে বলে সুখী লোকেরা কাগজের সব নৌকা জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। সুমি এবং বৃদ্ধ ফকীরচাঁদ সারা রাত জলে ভিজে ভিজে শীতে কাঁপছিল। অন্য ডাঙার সন্ধানে যাওয়ার জন্য ওরা গলা জলে নেড়ী কুকুরের মত সাঁতরাচ্ছিল। ওরা আর পারছে না। গভীর রাতে যখন বর্ষণ ঘন ছিল, যখন কেউ জেগে নেই, যখন পথের সব আলো মৃত জোনাকীর মত আলো দিচ্ছে....সুমি অসীম সাহস বুকে নিয়ে ডাঙা জমির জন্য সর্বত্র বিচরণ করতে করতে সামনের চার্চ এবং রাজাবাজারের ডিপোতে অথবা জলের পাইপগুলো অতিক্রম করে অন্য কোথাও···সুমি পরিচিত সব স্থান খুঁজে এসেছে, ডাঙা জমির কোথাও একটু সে ছাদ খুঁজে পায়নি

ওরা সাঁতার কেটে ওপারে এসে উঠতেই দেখল বৃষ্টি ধরে আসছে

আকাশের গুমোট অন্ধকারটা নেই এবং কিছু হাল্কা মেঘ দেখা যাচ্ছে। এ সময়ে সেই পাগল পুরোপুরি নগ্ন। ভিজে জামাকাপড় গায়ে রাখতে সাহস করছে না। সুমি পাঁচিলের সামনে শরীর আড়াল করে কাপড় চিপে নিল এবং ফকীরচাঁদের কাপড় চিপে দিল। ফকীরচাঁদ শীতে ক্রমশ আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পাগলিনী জলের পাইপের ভেতর শুয়ে থেকে শুকনো হাড় চুষে চুষে শীতের কষ্ট থেকে রেহাই পাচ্ছে। ওর সব বসনভূষণ পাইপের ভিতর যত্ন করে রাখা। পাগল কিছু কাগজ সংগ্রহ করে কোমরের ধারে ধারে ধারণ করে যেন কত কষ্টে লজ্জা নিবারণ করছিল। আকাশে হাল্কা মেঘ দেখে এবং আর বৃষ্টি হবে না ভেবে ঠিক টাকী হাউসের সামনে বা হাত কোমরে অথবা সামনে....তেরে কাটা ধিন এই সব বোলে পাগল হামেশাই নাচছে—কলকাতা বৃষ্টির জলে ডুবে গেল আমার পাখী উড়ে গেল বাতাসে। পাগল' এই সব গান গাইছিল।

সুমি পাগলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল এবং একটু ঠেলে দিয়ে বলল, 'এই তুই ফের নেংটো হয়েছিস! তুই ভারি অসভ্য।' বলে খিল খিল করে করে হেসে উঠল, ফকীরচাঁদ পাঁচিলের গোড়ায় বসে রয়েছে। সে হাসতে পারছে না। থেকে থেকে কাসি উঠছে এবং চোখ ক্রমশ ঘোলা দেখাচ্ছিল। আকাশের মেঘ হাল্কা, হয়ত আর বৃষ্টি হবে না। ফের ট্রাম বাস চলতে সুরু করবে অথবা এই সব সারি সারি ট্রাম বাস উটের মত মুখ তুলে 'দীর্ঘ উ টি আছে ঝুলে' বলে সারাদিন মুখ থুবড়ে থেমে থাকবে। ফকীরচাঁদ শীত তাড়াবার জন্য কাতরভাবে শৈশবের 'অ য় অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে, ই ঁদুর ছানা ভয়ে মরে'—যা বৃষ্টি শালা কোন ইঁদুরের ছানাকে আর বেঁচে থাকতে হচ্ছে না। সে দেয়ালে এ-সময় কি লেখার চেষ্টা করল কিন্তু বাতাসে আর্দ্রতা ঘন বলে কোন লেখা ফুটে উঠল না।

ফকীরচাঁদ রোদের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকল। ফুটপাথ থেকে জল নেমে যাচ্ছে ট্রাম বাস ফের চলতে সুরু করেছে এবং দুপুরের দিকে আকাশ যথার্থই পরিষ্কার—মনে হচ্ছে বৃষ্টি আর হবে না, যেন শরৎকালীন হাওয়া দিচ্ছে। বৃদ্ধ এ-সময় সুমিকে পাশে নিয়ে বসল। রোদ উঠবে ভেবে সে

সুমিকে জীবনের কিছু সুখ দুঃখের গল্প শোনাল। ভিজে কাপড় শরীরে থেকে থেকে শুকিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় জল কমে গেছে—বৃদ্ধ এবার উঠে দাঁড়াল এবং এক মগ চা এনে পরস্পর ভাগ করে খেল। বৃষ্টি আর আসছে না, বৃদ্ধ অনেকদিন আগের কোন গ্রাম্য সঙ্গীত মিন্‌মিনে গলায় গাইছে। সে তার স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তির ভিতর থেকে একটা ভাঙ্গা এনামেলের থালা বের করে রেস্তোরা অথবা কোন হোটেলের উদ্‌বৃত্ত এবং উচ্ছিষ্ট অন্নের জন্য বের হয়ে গেল। জীবনটা এ-ভাবেই কেটে যাচ্ছে—জীবনটা রাজবাড়ীর সদরে ঝুলানো এক হাত গণ্ডারের ছবির মত—মাথা সব সময় উঁচিয়েই আছে।

কিন্তু কিসে কি হল বলা গেল না। সমাজের সব ধূর্ত শেয়ালদের মত আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল। ফের বৃষ্টি—বর্ষাকাল এসে গেল। বৃষ্টি ঘন নয় অথচ অবিরাম। ফকীরচাঁদের বসবাসের স্থানটুকু ভিজে গেছে। পাগল পাগলিনীকে আর এ-অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে না। ফকীরচাঁদ উচ্ছিষ্ট অন্ন খেতে খেতে হাঁ করে থাকল—কারণ আকাশের অবস্থা নিদারুণ, আজ সারাদিন বৃষ্টি হবে···উত্তাপের জন্য ওর ফের কান্না পাচ্ছিল।

সুমি পাঁচিলের পাশে ফকীরচাঁদকে টেনে তুলল। এই শেষ শুকনো স্থান। ওর ভিতরে ভিতরে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল। তলপেট কুঁকড়ে যাচ্ছে এবং ভেঙে যাচ্ছে। সুমি নিজের কষ্টের কথা ভুলে গেল এবং যে কোনভাবে ফকীরচাঁদের শরীরে উত্তাপ সঞ্চয় হোক এই চাইল। ফকীরচাঁদ শীতের কথা ভেবে মড়া কান্নায় ভেঙে পড়ছে। ফকীরচাঁদ খেতে পারছিল না—কত দীর্ঘদিন থেকে যেন বৃষ্টি আর থাকবে না। শীতে শীতে বছর কেটে যাবে। ফকীরচাঁদ বলল, 'সুমি আমাকে নিয়ে অন্য কোথাও চল।'

'কোথায় যাব রে! আমার শরীর দিচ্ছে না রে!' তের বছরের সুমি তলপেটে দু পাশে দু হাত রেখে কথাগুলো বলল।

ফকীরচাঁদ পুনরাবৃত্তি করল, 'আমাকে কোথাও নিয়ে চল রে সুমি।'

সুমি এনামেলের থালা থেকে বাসি রুটি এবং ডাল খাচ্ছিল। ভিজে জবজবে কাপড়। ভিতর থেকে ওর-ও শীত উপরে উঠে আসছে। এবং মনে হচ্ছিল জরায়ুর ভিতর কেউ যেন গাঁইতি মেরে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করার চেষ্টা

করছে। সুমি নিজের এই কষ্টের জন্য রুটি মুখে দিতে পারছে না এখন এবং ফকীরচাঁদের কথার জবাব দিতে পারছে না।

বাস ট্রাম যাবার সময় কাদা জল উঠে আসছে ফুটপাথে। ফুটপাথ কর্দমময়। ফকীরচাঁদের এখন উঠে দাঁড়াবার পর্যন্ত শক্তি নেই। সে ক্রমশ স্থবির হয়ে পড়ছে। এখন সর্বত্র যেন বরফের মত ঠাণ্ডা এবং কাকগুলো বিজলির তারে বসে বসে ভিজছে। থেকে থেকে ট্রাম বাস চলছে এবং ছাতা মাথায় যারা যাচ্ছিল তারা ছাতার জলে আরও ভয়াবহ করে তুলছে ফুটপাথ—সুতরাং ফকীরচাঁদ কিছু বলতে পারছে না, ফকীরচাঁদ বৃদ্ধ, সুন্দর হস্তাক্ষর ছিল হাতের, পণ্ডিত ছিল ফকীরচাঁদ—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, তারপর ফকিরচাঁদ পুত্র এবং পরিবারের সকলকে হারিয়ে দীর্ঘসূত্রতার জন্য ফুটপাথের ফকীরচাঁদ হয়ে গেল। ফকীরচাঁদের সংগ্রহ করা শতছিন্ন গেঞ্জি এবং আবরণ এখন কর্দমময়। সে শীতে ফের কাঁপতে থাকল এবং ফের কথা বলতে গিয়ে দেখল দাঁতমুখ শক্ত, শরীর শক্ত এবং অসমর্থ। সে যেন কোনরকমে নিজের হাতটা সুমির দিকে বাড়িয়ে ধরল। এখন দিন নিঃশেষের দিকে। সুমি একটু শুকনো আশ্রয়ের জন্য গোমাংসের দোকান অতিক্রম করে রাজাবাজারের পুল পর্যন্ত হেঁটে গেছে। সর্বত্র মানুষের ভীড় এবং এতটুকু আশ্রয় সুমির জন্য কোথাও পড়ে নেই। সকল ফুটপাথবাসী অথবা বাসিনীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। সকলেই মাথার উপর ভাঙা ছাদ পেলে খুশি আর সর্বত্র ওলাওঠার মত মড়কের সামিল পথ ঘাট। সুতরাং সুমি ফিরে এসে হতাশায় ফকীরচাঁদকে কিছু বলতে পারল না। সে ফকীরচাঁদের পাশে চুপচাপ বসে পড়ল। ঠাণ্ডা লাগার জন্য শীতে এখন সে কাঁপছে।

ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির ছাট সর্বত্রগামী। বৃদ্ধের চুল দাড়ি ভিজে গেছে। রাস্তার আলো বৃদ্ধ ফকীরচাঁদের মুখে—দাড়িতে বিন্দু বিন্দু জল মুক্তোর অক্ষরের মত—যেন লেখা, আমার নাম ফকীরচাঁদ শর্মা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, নিবাস যশোহর—ফকীরচাঁদ উদাস চোখে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে এ-সব ভাবছিল। চোখ ঘোলা ঘোলা ওর, সুমি এই বৃষ্টিতে বসেই এনামেলের থালা থেকে ঠাণ্ডা অড়হড়ের ডাল এবং রুটি

ফকীরচাঁদের মুখে দিতে গেল। সে মুখে খাবার তুলতে পারছে না—ঠাণ্ডায় মুখ শক্ত। সে শুধু উত্তাপের জন্য হাত দুটো সুমির হাটুর নীচে মসৃণ ত্বকের ভিতর গুঁজে দিতে চাইল।

সুমি বলল, ‘দাদু তুই ইতর হয়েছিস?’ বলে হাতটা তুলে দিতেই দেখল, ফকীরচাঁদের চোখ যেন ঘোলা ঘোলা—ফকীরচাঁদ যেন মরে যাচ্ছে।

সে চীৎকার করে উঠল, ‘দাদু! দাদু!’

ফকীরচাঁদ ঈষৎ চোখ মেলে ফের চোখ বুজতে চাইল।

সুমি তাড়াতাড়ি একটু আশ্রয়ের জন্য হোক অথবা ভীতির জন্য হোক উঠে পড়ল। বৃষ্টি মাথায় একটু আশ্রয়ের জন্য দোকানে দোকানে এবং ফুটপাথের সর্বত্র এমন কি গলি ঘুজির সন্ধানে সে ছুটে ছুটে বেড়াল। বৃষ্টি ক্রমশ বাড়ছে। ফুটপাথে ফের জল উঠতে আরম্ভ করেছে। আর অধিক রাতে সুমি যখন ফিরল, যখন ফের তলপেটে ঈশ্বর কামড়ে ধরছে, শরীরটা নুয়ে পড়ছিল, জলের জন্য ভিতরে ভিতরে ঈশ্বর মোচড় দিচ্ছে এবং ট্রাম বাস চলছে না, ইতস্তত দূরে দূরে কিছু ট্যাক্সি কচ্ছপের মত ভেসে আছে এবং হোটেল রেস্তোরার দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কেউ বৃষ্টিতে ভিজে জেগে থাকবার জন্য বসে নেই—সুমির তখন ক্লিষ্ট চেহারা বড় করুণ দেখাচ্ছিল। সামনে অপরিচিত অন্ধকার, চার্চের সামনে হেমলক গাছ—লোহার রেলিং টপকে গেলে ছোট ঘর এবং সেখানে কাঠের কফিন মাচানের মত করে রাখা। হেমলক গাছের বড় বড় পাতার ভিতর জলের শব্দ আর সামনে সব কবরভূমি—চার্চের ভিতর কোন আলো জ্বলছে না ··সুমি নিঃশব্দে লোহার রেলিং টপকে কাঠের কফিনের ভিতর শুয়ে সন্তান প্রসবের কথা ভাবতেই ফকীরচাঁদের কথা মনে হল—আবার সেই পথ এবং জলের শব্দ, সুমি ফুটপাথের জল ভেঙে ফকীরচাঁদকে আনার জন্য ধীরে ধীরে রাজবাড়ীর সদর দরজায় ঝোলানো এক হাত গণ্ডারের ছবির নীচে দাঁড়াল। ওর অদ্ভুত এক কান্না উঠে আসছে ভিতর থেকে। জন্মের পর এই বৃদ্ধকে সে দেখেছে আর সেই মোষের মত পুরুষটা যাকে সে তার ভালবাসা দিতে চেয়েছিল, যে চুণ গোলা জল ফেলে ঘুঘু পাখীদের উড়িয়ে দিয়েছে···সদর দরজায় এক হাত গণ্ডারের ছবির নীচে দাঁড়িয়ে সুমি কাঁদতে থাকল। বৃষ্টির ঘন ফোঁটা

গাছ গাছালীর অস্পষ্ট ছায়া অথবা সাপ বাঘের ডাকের মত ব্যাঙের ডাক আর নগরীর দুর্ভেদ্য স্বার্থপরতা সুমির দুঃখকে অসহনীয় করে তুলছে। সুমির শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এমন কি পাগলেরাও এই বৃষ্টিতে বের হচ্ছে না, পুলিশ কোথাও পাহারায় নেই। সুমি একা, এত বড় সহরের ভিতর এখন একা এবং একমাত্র সন্তান যে মুখ বের করবার জন্য ভিতরে ভিতরে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তখনই সুমি দেখতে পাচ্ছে পাগল জলের-ভিতর হেঁকে হেঁকে যাচ্ছে, 'দু ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর।' পিছনে পাগলিনী আজ এই রাতে দুজনের হাতেই লাঠি। লাঠির মাথায় পাখীর পালক উড়ছে

সুমি ফকীরচাঁদের হাত ধরে কফিনের ভিতর ঢুকে প্রসব করার জন্য কাঠের দোকানগুলো অতিক্রম করে গেল। ফকীরচাঁদ দেখল ওদের কাপড় জামা জলে ভিজে সপ সপ করছে। শীত সেজন্য ভয়ঙ্কর। ওরা দুজনে প্রথম জামা কাপড় ছেড়ে ফেলল—এখন ফকীরচাঁদই সব করছে। সুমি অতীব দুঃখে এবং বেদনায় একটা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিল। ওদের শরীরে কোন আবরণ ছিল না। মাচানের নীচে সুমি ঢুকে যেতে চাইল। কিন্তু কফিনের ভিতর কে যেন ফিস ফিস করে কথা বলছে। '—কে! কে!' ফকীরচাঁদ চীৎকার করে যুবকের মত রুখে দাঁড়াল। কফিনের ডালা খুলে মুখ বের করতেই বুঝল সেই পাগল, পাগলিনী। ওরা আশ্রয়ের জন্য এখানে এসে উঠেছে।

ফকীরচাঁদ বলল, 'তোরা সকলে মিলে সুমিকে ধর। সুমির বাচ্চা হবে।'

ফকীরচাঁদ এবং পাগল হেমলক গাছটার নীচে বসে থাকল। পাগলিনী মায়ের মত স্নেহ দিয়ে সুমিকে কোলে তুলে চুমু খেল একটা। তারপর কফিনের ভিতর সন্তানের জন্ম হলে পাগলিনী গ্রাম্য প্রথায় তিনবার উলু দিল। সেই শব্দের ঝংকারে মনে হচ্ছিল সমুদ্র কোথাও না কোথাও আপন পথে অগ্রসর হচ্ছে, মনে হচ্ছিল—এই সংসার হাতির অথবা গণ্ডারের ছবির ভিতর কখনও কখনও লুকিয়ে থাকে। শুধু কোন সৎ যুবকের সংগ্রাম প্রয়োজন। পাগল হেমলক গাছের নীচে শেষ বারের মত চীৎকার করে উঠল—'কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়।' ফকীরচাঁদ ধূসর অন্ধকারের ভিতর সুন্দর হস্তাক্ষরে শিশুর নূতন নামকরণ করে অদৃশ্য এক জগতের উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

# কালবেলা

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

একটি লোক একজোড়া হাঁস, একটা কুকুর ও একটা মেয়েমানুষ পুষত। হাঁস দু'টো সারাদিন জলার ধারে কাদা খুঁচত, কোঁত কোঁত করে কেঁচো খেত, কখনো-সখনো ডাঙায় উঠে তালশাঁসের মতো ঠোঁট দিয়ে কুরকুর করে নিজের গায়ে বিলি কাটত। সন্ধ্যা হলে লোকটা যখন লাঠি হাতে এদিক-ওদিক লক্ষ্য করে ডাকত, আঃ আঃ আঃ—তখন ওরা খুট খুট করে হেঁটে এসে একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে ঢুকে পড়ে নিশ্চিন্ত হত। আর, কুকুরটা সারাদিন গা-গড়িমসি করে আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করত। কখনো আবার দাওয়ার পাশে বহুকালের পুরনো যে বস্তাটা পাতা আছে তার ওপর বসে বসে হাই কাটত। হাই কাটত, ঝিমোত, ঘুমোত। রাত্রি হলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জানান দিত, ও আছে। লোকটা কুকুরটাকে বলত, শালা শুয়রের বাচ্চা থাকিস কোথায়, এ্যা? কুকুরটা তখন ঘড়ঘড় করে সোহাগ-সোহাগ ভাব দেখাত। তবে মেয়েমানুষটার কথা একটু আলাদা। মেয়েমানুষটা ভাত রাঁধত চুল বাঁধত, গা ধুত, আবার কদাচিৎ আদুরে আদুরে ভাব করে লোকটার সঙ্গে কথা কইত। লোকটা ওকে আদুরি নামে ডাকত। বলত, আদুরি, তামাক সাজ।

তা, সেই হাঁস দুটো কুকুরটা আর মেয়েমানুষটা এদের নিয়েই এ গল্প, তবে লোকটার কথা দিয়েই শুরু করি। লোকটা একটা উঁচু মতন মাচা বানিয়ে নিয়েছিল। তিন মানুষ উঁচু। এত উঁচু যে পুরো একটা মাঠ ছুটোছুটি না করেই ও মাঠের আনাচ-কানাচ নজরে-নজরে রাখতে পারত। প্রত্যেক দিন রাত্রে মাচায় বসে ও হঠাৎ-হঠাৎ টিন পেটাত। জানান দিত, ও আছে। ও, আছে, অর্থাৎ ওর ঐ চোয়াড়ে লম্বা চেহারাটা, ওর ঐ ঘোলা-ঘোলা মরা মাছের মতো চোখ জোড়া, ওর গায়ের ঐ খুশকি-খুশকি

চামড়ার খোলশটা, চিবুকের কাছে কাঁচা সুপুরির রঙের মতো কাটা দাগটা, আর ওর সারা গায়ের ঘাম-ঘাম চাষাড়ে-চাষাড়ে গন্ধটা।

লোকটা একটা ঝুড়ো-বুড়ো একচালায় বাস করত। চালার কোণে হামেশাই চড়ুই এসে ঘর বেঁধে ডিম পাড়ত। লোকটা এমন নিষ্ঠুর ছিল যে, ডিম ফুটে কচি-কচি কুশি-কুশি ছানা হলেই তুলে নিয়ে ও কুকুরটাকে দিয়ে খাওয়াত। মেয়েমানুষটা অর্থাৎ ঐ আতুরি একবার ভীষণ দাপাদাপি করেছিল তাই নিয়ে। লোকটা তখন রামদা নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল ওর দিকে, শালী, ফের যদি বকবক করবি, তো তোকেও কুকুর দিয়ে খাওয়াব। লোকটা এভাবে নিষ্ঠুর হতে পেরে মনে মনে খুব খুশি হত। কিন্তু কুকুরটা যদি হাঁস দু'টোকে তেড়ে যেত তা হলেও ও সইতে পারত না। একবার, সে মাস ছয়েক আগের কথা, কুকুরটা ওর অগোচরে একটা হাঁসের বাচ্চা চুরি করে খেয়ে ফেলেছিল, তাইতে ও দু'হাতে ওটাকে তুলে ধরে এমন-ভাবে আছড়িয়েছিল যে সেই থেকে কুকুরটা একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। একবার, সে মাসখানেক আগের কথা, হাট থেকে একটা মুরগী এনে জবাই করবার সময় ও পেট চিরে আতুরিকে দেখিয়েছিল। দেখিয়েছিল ঠিক কোন জায়গাটায় কেমন ভাবে ডিম থাকে। সেই রাত্রে আতুরি ওকে বলেছিল, তোমার প্রাণটা যেন পাথরের। লোকটা বলেছিল, আমার ইচ্ছে হয় জ্যান্ত মেয়েমানুষের পেট চিরে দেখতে কেমনভাবে ওখানে রক্তে চর্বিতে বাচ্চাটা লুকিয়ে থাকে।

লোকটার একচালা ঘরটার চাল বেয়ে বর্ষায় বর্ষায় জল গড়াত। তাইতে, খানকয়েক ক্যানেস্তারা টিন গুঁজে তাপ্পি দিয়ে রেখেছিল ও। জলপড়া বন্ধ হলে, চালার পেছন দিকে যে ছাইগাদা সেই ছাইগাদায় ও বাঁশ পুঁতে ঘরটাকে ঠেকা দিয়ে রাখত। একটা দু'টো তিনটে, তিনটে পাঁচটা সাতটা, ঠেকা খেয়ে খেয়ে ঘরটা কেমন জর্জর হয়ে থাকত। যেন সারা গায়ে বিষ-ব্যথা নিয়ে কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে আছে। আতুরি বলত, যেমন তুমি শ্যামসুন্দর তেমন তোমার ললিতে। লোকটা বলত, দালান ধুয়ে জল খাব নাকি? আমার মতো লোকদের এই বেশ।

সর্বোপরি লোকটার একটা মনিব ছিল। মনিববাবু থাকত আড়াই

ক্রোশ দূরে একটা বামুন-কায়েতের গ্রামে। গ্রামের বড় সরকের পাশে মস্ত একটা পাকা বাহারে ধরনের বাড়িতে। মনিববাবু ওকে বলত, হারামজাদা ছোট জাতের কম্ম তো, কত আর হবে। বেটা জাত চাড়াল।

অথচ লোকটা তাতে দুঃখ পেত না, কারণ ও জানত ওর বাপ চাড়াল, মা চাড়াল, ও নিজেও তাই। কিন্তু আদুরি একদিন যেই না ওকে চাড়ালের গুষ্টি বলে গালি পাড়ল অমনি ও লাফিয়ে উঠে এমনভাবে মুখ চেপে ধরেছিল যে, মেয়েমানুষটার চোয়াল যেন হাতের মুঠোয় চিপসে গিয়েছিল। তখন রাত্রি ছিল, তাই ও বুঝতে পারে নি ওর হাতটা যে চটচট করে ভিজে যাচ্ছিল তা লালায় না রক্তে। ভেজা হাতটা মাটিতে মুছে নিতে নিতে গজগজ করে ও শুনিয়ে দিয়েছিল, আমি চাড়াল, তাই তুই বর্তে গেলি। আমি চাড়াল বলেই তোর মতো ঢ্যামনা মাগী পালতে পারি। বুঝলি?

যাই হোক লোকটার সেই মনিববাবু, একদিন ওকে ডেকে পাঠাল।

লোকটা এল।

মনিববাবু বলল, শুনলাম, তোর নাকি কয়েক জোড়া হাঁস আছে?

লোকটা বলল, একজোড়া। একটা এবার ডিম পাড়বে।

ডিম পাড়বে। বেশ বেশ। সেলামীটা ভুলিস না যেন, বুঝলি?

আচ্ছা। লোকটা তখন মাথা নীচু করে ফিরে এল। কি বুঝল ভগবান জানে, সেই রাত্রে মেয়েমানুষটাকে আদর করতে করতে ও এক সময় সোনার ডিম পাড়া রাজহাঁসের গল্প শোনাতে লাগল। একটা রাজহাঁস সোনার ডিম পাড়ত। বুঝলি আদুরি, একটা রাজহাঁস সোনার ডিম পাড়ত। তাই দেখে লোভে পড়ে হাঁসটার পেট চিরে ডিম বার করতে গিয়েছিল এক আহাম্মক, বুঝলি আদুরি, ডিম বার করতে গিয়েছিল এক আহাম্মক। কুকুরটা তখন উঠানে পড়ে পরিত্রাণে চেঁচাচ্ছিল, আর হাঁস দু'টো তখন গায়ে গায়ে এক হয়ে কাঠের বাক্সটার মধ্যে বসেছিল। খানিক বাদে লোকটা টিন পিটিয়ে নিজেকে জানান দেবার জন্য ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

যাই হোক লোকটার সেই মনিববাবু, আর একদিন ওকে ডেকে পাঠাল।

লোকটা এল।

মনিববাবু বলল, শুনলাম, তোর নাকি কুকুর আছে?

লোকটা বলল, একটা।

একটা। বেশ বেশ। মাংস-টাংস খেতে দিস, তেজিয়ান হবে। বুঝলি?

আচ্ছা। লোকটা তখন মাথা নিচু করে ফিরে এল। কি বুঝল ভগবান-জানে, দাওয়ার ওপর কুকুরটাকে ঝিমোতে দেখে আপাদ অঙ্গ জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। এই শুয়রের বাচ্চা, তোকে না বলেছি ঘর-দোর পাহারা দিবি? ঝিমচ্ছিস যে বড়? তোকে না বলেছি সজাগ থাকবি, ঘুমুচ্ছিস যে বড়? তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, লোকটা তাই হাঁস দু'টোর খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়ল।

•

যাই হোক লোকটার সেই মনিববাবু, আবার আর একদিন ওকে ডেকে পাঠাল।

লোকটা এল।

মনিববাবু বলল, শুনলাম, তোর নাকি একটা মেয়েমানুষ আছে? বলিস নি তো কখনো?

লোকটা বলল, আছে। ভাত রেঁধে দেয়, তামাক সেজে দেয়।

দেয় বুঝি? বেশ বেশ। তবে মেয়েমানুষের কথায় বেশি ওঠবস করিস না, বুঝলি?

আচ্ছা। লোকটা তখন মাথা নিচু করে ফিরে এল। কি বুঝল ভগবান জানে, লোকটা ডাকল, আতুরি? আতুরি এসে সামনে দাঁড়াতেই, তামাক সাজ। তামাক সাজতেই, জল দে। জলের ঘটি এগিয়ে ধরতেই, এখানে বস। বসতেই, উঠে দাঁড়া। দাঁড়াতেই ফ্যাল ফ্যাল করে আতুরির দিকে তাকিয়ে ও যাচাই করে নিল সত্যি সত্যি ও মেয়েমানুষের কথায় ওঠবস করে, না ঠিক উলটোটা।

তখন খা খা রোদ চড়েছিল। লোকটা বেরিয়ে পড়ল মাঠময় একবার টহল দেবার জন্য। মাঠের গোটাটাই এক বুক উঁচু পুষ্ট-পুষ্ট ধান চারা।

ডগা ধার কচি-কচি ধানপাতা গায়ে পায়ে বুক হাতে পরশ কাটছিল। ভেজা ভেজা সবুজ পাতার গন্ধ আসছিল। নরম নরম আলের মাটি পায়ের নিচে পিছলে পড়ছিল। লোকটা এমন ধানক্ষেতের মধ্যি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে কেমন বোকা ভাবতে লাগল। কারণ, পুবে তখন ধানক্ষেত, পশ্চিমেও ধানক্ষেত, উত্তরেও, দক্ষিণেও অথচ লোকটা ধান-গাছের কথা না ভেবে ওর হাঁসজোড়া, কুকুরটা আর মেয়েমানুষটার কথাই ভাবছিল।

এই যেমন, লোকটার কিছুদিন আগেও কয়েক জোড়া হাঁস ছিল। সব হাঁস খুইয়ে গিয়ে এখন কেবল দু'টোয় এসে দাঁড়িয়েছে। এ হাঁস দু'টো আগের দু'টোর ডিম থেকে ফুটিয়ে অনেক সাধ্য-সাধনা করে পেতে হয়েছে ওকে। আগের একটা শেয়ালে খেয়েছে, আর একটা রোগে ভুগে মারা গেছে। এ-দু'টো যে এখনো আছে তা ওর নেহাতই কপাল ফেরে। মাদীটা এবার থেকে ডিম পাড়বে। হপ্তায় যদি দু'-জোড়া করে ডিম দিতে থাকে, তবে, তার থেকে একজোড়া মনিবাবুকে দিয়ে আসতে হবে। আর বাকি একজোড়ার একটা বিক্রি করে পয়সা আনতে হবে। বাকি থাকে একটা। এই একটাকে যদি খাওয়া যায়? খেলে তো ফুরিয়েই গেল। তারপর খেই হারিয়ে লোকটা কুকুরটার কথা ভাবতে লাগল।

কুকুরটা বড় লোভী। কুকুরটাকে ও রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে নিজের দাওয়ায় ঠাঁই দিয়েছিল। ভেবেছিল, বাড়িতে একটা কুকুর থাকলে চোর বদমাস তফাৎ থাকবে। কুকুরটা ওর পাহারাদারের মতো, যেমন ও নিজেই মনিববাবুর ধানক্ষেতের পাহারাদার। তা, হারাজাদার নজর যেন সবসময়, ঐ হাঁস দু'টোরই দিকে। বেটা হাড়ে হাড়ে শয়তান হয়ে উঠেছে। পথে কুড়নো কুকুর, বেশি তেড়িবেড়ি করলে পথেই আবার তাড়িয়ে দিতে হবে। কুকুরটার একটা সুরাহা হতে ও মেয়েমানুষটার কথা ভাবতে লাগল।

মেয়েমানুষটাকে ও পঞ্চাশ টাকা নগদ ঢেলে কিনে এনেছিল এক বাপ মায়ের কাছে থেকে। লোকে যেমন পয়সা দিয়ে বাঁশি কেনে, কি বেহালা কেনে, কি কলের গান কেনে তেমনি ও পয়সা দিয়ে, পয়সা দেবার আগে বাপ মায়ের সঙ্গে অনেক দর কষাকষি করে, মেয়েমানুষটাকে কিনে

এনেছে। লোকে যেমন বাঁশি বাজিয়ে, কি বেহালা বাজিয়ে, কি কলের গান বাজিয়ে সুখ পায়, ও তেমনি সুখ চেয়েছিল। সুখ সাধ আহ্লাদ পুরোপুরি মেটাবার জন্য মেয়েমানুষটার নাম রেখেছিল ও আহুরি। আহুরিকে কাছে পেয়ে ও বুঝল, যতদিন কাছে না পেয়েছিল ততদিনই সুখ ছিল। মেয়েমানুষ ঘরে এসে লোকটার সব সুখ নিজের করে নিয়েছে, ফলে ও অসুখী হয়ে গেছে। কিন্তু এমন হল কেন? লোকটা আবার ভাবতে লাগল। পুবে তখন ধানক্ষেত, পশ্চিমেও ধানক্ষেত, উত্তরেও, দক্ষিণেও অথচ লোকটা ধান-গাছের কথা না ভেবে নিজের জীবনের গণ্ডগোলগুলির কথা ভাবতে লাগল।

যদি ও হাঁস দু'টো না পালত? না পাললে ডিম বিক্রি করার কথা ওকে হয়ত ভাবতেই হত না। ফলে কিন্তু ওর দু'চার পয়সা আয়ের পথ বন্ধ হত। হাঁস দু'টো ওর না থাকলে পাহারাদার কুকুরটারও দরকার হত না। কুকুরটা ওর না থাকলে কুকুরটাকে আদর আত্তি কিংবা খেতে দেওয়ার কথাও ভাবতে হত না। তখন ওর কেবল ঐ মনিবের দয়ায় বাঁচতে হত। কেবল ঐ মনিবের দয়ায় বাঁচতে হলে তখন ও কাউকে আর দয়া দেখাতে পারত না। ফলে ও আহুরিকে নিজের ঘরেও ঠাঁই দিতে পারত না। আহুরিকে না পুষতে হলে, ও নিজের মতো, নিজের ঘরে, নিজের হয়ে থাকতে পারত।

অর্থাৎ, ও লক্ষ্য করল, কান টানলে যেমন মাথা আসে, ঠিক তেমনি ভাবে, হাঁস দু'টো, কুকুরটা, মেয়েমানুষটা, ও নিজে, ওর মনিববাবু সব কেমন একটার সঙ্গে একটা জড়ানো। একটাকে টানলে আর একটা আসে। ভারী মজার ব্যাপার। খানিকটা গোলকধাঁধার মতো। গোলকধাঁধা বলেই ও অনেকক্ষণ ধরে ভাবল। ভাবল, আর বোকার মতো চারপাশে তাকাল। কারণ, পুবে তখন ধানক্ষেত, পশ্চিমেও ধানক্ষেত, উত্তরেও, দক্ষিণেও। অথচ লোকটা ধানগাছের কথা না ভেবে গোলকধাঁধার জটে আটকা পড়ে গিয়ে একসময় খাপ্পা হয়ে গেল। লোকটা তখন বিষ ব্যথায় জর্জর ঘরটার কাছে ফিরে আসে। এসে প্রথমেই ওর নজর পড়ে হাঁস দু'টোর দিকে। একটা আর একটার গা ঠোকড়াচ্ছে। অন্য সময় হলে

তাকিয়ে দেখতে লোকটা। এখন সব কেমন যেন গুলিয়ে আছে, ডাকল. আহুরি? আহুরি?

আহুরি তখন আঙুলের নখে রঙ মাখছিল, ছুটতে ছুটতে এল, কি?

রামদা দে।

কেন? রামদা কেন? রামদা কি হবে?

হাঁস ছ'টোকে জবাই করব। বাঞ্চোতরা কেবল ফষ্টিনষ্টিই জানে, ডিম পাড়ছে না কেন? এ্যা?

সত্যি সত্যিই হাঁস ছ'টোকে জবাই করে ফেলত লোকটা, নেহাৎ আহুরি কেমন কৌশল করে জলার ধারে ও ছ'টোকে তাড়িয়ে দিল। ফলে, লোকটা আবার ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ল।

ভাল কথা, হাঁস ছুটো, কুকুরটা, মেয়েমানুষটা আর মনিববাবু ছাড়া লোকটার জনাকয়েক বন্ধু ছিল। বন্ধুরা সব যেমন হয়, নেহাৎ-নেহাৎ বন্ধু। অর্থাৎ লোকটা যখন মেজাজে থাকে তখন ওদের বলতে শোনা যায় মেজাজ-মেজাজ কথা। লোকটা যখন বেজারে থাকে তখন ওদের বলতে শোনা যায় বেজার-বেজার কথা।

একজন ছিল, সে বলত, ভাই হে, এই যে সব ধানগাছ দেখছ, এই যে দিকবিদিক ধানবন, বলত এসব কার?

কার আবার, মনিবের, অর্থাৎ জমি যার তার।

উঁহু, ভেবে বল ভেবে বল।

লোকটা তখন অনেকক্ষণ চিবুকের ওপর আঙুলের টোকা দিয়ে ভাবল। কার হবে? কার হতে পারে? ওঃ হো, মনে পড়ল, বলল, যে চাষ করেছে তার, অর্থাৎ চাষীর।

উঁহু, চাষীরও না, ভেবে বল ভেবে বল।

লোকটা এবার অনেকক্ষণ হিসেব কষে ভাবল। কার হবে? কার হতে পারে? ওঃ হো, মনে পড়ল, বলল, যে খাবে তার, অর্থাৎ খরিদ্দারের, অর্থাৎ যার ঘরে চাল থাকবে না তার।

উঁহু, তারও না, ভেবে বল ভেবে বল।

লোকটা বলল, তুমিই বল।

বলব? বলল, সবই হচ্ছে তার, অর্থাৎ আমাদের খোদার, তোমাদের ভগবানের।

আর একজন ছিল, সে বলত, ভাই হে এই যে সব ধানগাছ দেখছ, এই যে দিকবিদিক ধানবন, বলত এসব কার?

লোকটা অমনি টপ করে বলে ফেলল, ভগবানের অর্থাৎ খোদার।

উঁহু, অমনি সে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল। এসব হল শেখানো কথা। আসলে কাগজ পত্রে এ হচ্ছে তোমার মনিবের, কিন্তু বেআইনী ভাবে তোমার।

আমার? লোকটা কেমন হকচকিয়ে গেল।

হ্যাঁ তোমার, যা পার হাতিয়ে নাও, বুঝলে হে? হাতিয়ে নাও।

আর একজন ছিল, সে বলত, ভাই হে এই যে সব ধানগাছ দেখছ, এই যে দিকবিদিক ধানবন, বলত এসব কার?

লোকটা অমনি টপ করে বলে ফেলল, কাগজ পত্রে মনিবের, বেআইনী ভাবে আমার।

উঁহু, অমনি সে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল। এসব হল শেখানো কথা। আসলে এ হচ্ছে ভাগ্যের। তোমার ভাগ্যে নেই, তাই তুমি পাচ্ছ না। মনিবের ভাগ্যে আছে তাই সে পাচ্ছে।

এমনি ধরন লোকটার অনেকজন বন্ধু ছিল। বন্ধুদের সঙ্গে কখনো-সখনো দেখা হত। কখনো হাটে, কখনো গাঁয়ে, কখনো পথে। হাট কিংবা গাঁ কিংবা তেমন-তেমন পথ সবই ওর বিষ জর্জর ঘর থেকে অনেক দূরে দূরে ছিল। কারণ, ওর মনিবের ইচ্ছে ছিল হাট থেকে, গাঁ থেকে কিংবা তেমন-তেমন পথ থেকে ও দূরে থাকে। তাই ও লোকালয় থেকে দূরে যেখানে চারদিকে ধানক্ষেত আর মাঝখানে এই টিলার মতো উঁচু জায়গা, এই জায়গাটাতে ঘর বেঁধে নিয়েছিল। আর মনিববাবু ওকে সাবধান করে দিয়েছিল, শালিক কি চড়ুই যেন ঠোঁটে করে ধান নিয়ে না পালায়। শালিক কি চড়ুই কি মাছি কি পিঁপড়ে কিছুই ওর নজর এড়াত না। কারণ, রাত্রে ও মাচায় উঠে টিন পেটাত, দিনে ও লাঠি হাতে

সারা মাঠ ঘুরে বেড়াত। একবার ও লক্ষ্য করল ঝাঁকে ঝাঁকে বানর আসছে। ও ঠিক করল একে একে সব বানর মেরে ফেলবে। প্রথমে একটাকে হাতের কাছে পেয়ে যাওয়ায় লাঠি পিটিয়ে মেরে ফেলল। হঠাৎ একটা বানর মারায় ওর কেমন মজা লাগল। মরা বানর পিঠে চাপিয়ে মনিববাড়ি দেখাতে গেল।

মনিব তখন গড়গড়া টানছিল। লোকটাকে দেখতে পেয়ে বিকটভাবে হেসে উঠল। বলল, হারামজাদা জাত চাড়ালের কম্ম দেখ, ভাগ ভাগ। রেঁধে খা গে যা!

লোকটা তাতে বুদ্ধু হয়ে পালিয়ে এল। এসে সড়ক ধরে হাঁটতে লাগল। তখন মরা বানরের আঙুলগুলি পিঠের ওপর আঁচড়াচ্ছিল। লোকটা, খানিকদূর এগিয়ে এসে লক্ষ্য করল, ওর কুকুরটা কি ভাবে যেন টের পেয়ে পিছু নিয়েছে। কুকুরটা তখন ঘেউ ঘেউ করে ডাকছিল।

আরো খানিক এগিয়ে এসে লোকটা লক্ষ্য করল ওর মুখোমুখি একজন বন্ধু আসছে। বন্ধু বলল, সে কী হে, চলেছ কোথায় বাহন নিয়ে? বানরটা কি মারলে নাকি?

লোকটা বলল, মারলাম।

মারলে! জানো না জীব হত্যায় পাপ হয়।

জানি, তবু মারলাম। লোকটা না দাঁড়িয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে পিছনেই আসছিল। পথটা যেখানে হারিয়ে গেল সেখানে হাট। হাট তখন গমগম করছিল। মেলাই লোক, মেলাই জন। তার মধ্যে ও আর একজন বন্ধুকে দেখল। বন্ধুটি এগিয়ে এসে শুধোল সে কী হে, চলেছ কোথায় বাহন নিয়ে? বানরটা কি মারলে নাকি?

লোকটা বলল, মারলাম।

মারলে! বেশ বেশ। মানুষের ক্ষতি করে যারা তাদের মারলে পুণ্যি হয়।

লোকটা আবার না দাঁড়িয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল। কুকুরটা তেমনি ঘেউ ঘেউ করে পিছনেই আসছিল। হাটটা ফুরুলে আবার একটা

পথ, সেই পথে আরো খানিক এগিয়ে এসে একটা গ্রাম। সারা গ্রাম আম জাম জারুলে ঢাকা ছায়া-ছায়া ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। লোকটা খানিক জিরোবে বলে একটু বসল। মরা বানরের আঙুলগুলি পিঠের ওপর আঁচড় কাটায় পিঠটা কেমন জ্বালা-জ্বালা করছিল। এমন সময় আবার আর এক বন্ধু। সে কী হে, চলেছ কোথায় বাহন নিয়ে? বানরটা কি মারলে নাকি?

লোকটা বলল, মারলাম।

মারলে! ছি ছি, না মারলেই পারতে। মারতে হয়তো হাতী মারবে এসব মারা শোভা পায় না তোমার। তার চে এক কাজ কর না।

কি?

ফাঁদ পেতে যত খুশি ধরে ধরে চালান দাও।

দেব। লোকটা আবার উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল। কুকুরটা আবার পেছন পেছন আসতে লাগল। আম জাম জারুলে ঢাকা ছায়া-ছায়া ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা গ্রামটা পেরুলে মাঠ। ধানবনের মাঠ। সরু-সরু পেছল-পেছল আল। আল ধরে সাপের মতো এঁকে বেঁকে লোকটা একসময় অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে-হেঁটে নিজের ডেরায় এসে পৌঁছাল। তারপর, কি খেয়াল হল লম্বা একটা বাঁশের মাথায় বানরটাকে বেঁধে বাঁশের গোড়া ধানবনের মধ্যে পুঁতে রাখল।

আহুরি বলল, কি করছ? গন্ধ হবে না? পচা গন্ধে টিকতে পারবে?

লোকটা বলল, তামাক সাজ। ভাবখানা যেন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। যা ইচ্ছে তাই করতে পারার ক্ষমতা আছে।

কুকুরটা তখনও বাঁদর ঝোলানো বাঁশটার কাছে বসে। হাঁস দু'টো কোথায়? তামাকে দু'টো লম্বা-লম্বা টান দিয়ে লোকটা হাঁসের বাক্সের কাছে এসে থমকে পড়ল। একজোড়া ধবধবে ডিম দেখা যাচ্ছে। আহুরি, আহুরি, লোকটা চেঁচিয়ে জানান দিল, একজোড়া ধবধবে ডিম দেখা যাচ্ছে।

লোকটা তখন খুশিতে আটখানা। এত খুশি যে কি করবে ভেবে না পেয়ে ডিম দু'টো গামছায় বেঁধে ছুটতে ছুটতে মনিববাড়ি দিয়ে এল।

এমনিভাবে দিন আসে দিন যায়। রাত আসে রাত যায়। আঁধার যায়, আলো যায়। তা মেজাজ যদি ভাল, থাকে সবাই ভাল। মেজাজ

যদি খারাপ থাকে সবাই খারাপ। তাই আজ যে বন্ধু কাল সে শত্রু, কাল যে শত্রু পরশু সে বন্ধু। বন্ধুরা সব এমন হয়। কিন্তু হাঁস দু'টো কুকুরটা মেয়েমানুষটা রোজই বন্ধু রোজই শত্রু। আর মনিববাবু বন্ধুও না শত্রুও না। মনিব ওর জীবন। জল যেমন জীবন, বায়ু যেমন জীবন মনিব তেমনি জীবন। এ সব কথা সত্যি সত্যি ছড়িয়ে ছিটিয়ে লোকটা অনেকক্ষণ ধরে ভাবত। কিন্তু একদিন যায় দু'দিন যায়, তিনদিন যায়, লোকটার একদিন ব্যামো হল। ভীষণ ব্যামো। এমন ব্যামো যে লোকটা যেন আজ যায় কাল যায়। যায়-যায়। তাই, একদিন যায় দু'দিন যায় তিনদিন যায় কুকুরটা দাওয়া ছেড়ে নড়তে চায় না। কেঁউ কেঁউ করে সারাক্ষণ কাঁদে। জানায় ওর বড় ভাবনা হয়েছে। লোকটা যদি মরে যায় ও তখন কি করবে!

মেয়েমানুষটা সারাক্ষণ বিছানার পাশে বসে থাকে। একদৃষ্টে বোবার মতো তাকিয়ে থাকে, জানায় যে ওরও বড় ভাবনা হয়েছে। লোকটা যদি মরে যায় ওর তখন কি হবে! হাঁস দু'টো গা ছেড়ে ছেড়ে এদিক-ওদিক করে। কাঠের বাক্সটার কাছে এগিয়ে এসেও ঢুকতে চায় না। কোথায় যেন একটা বেচাল হয়েছে।

একদিন যায় দু'দিন যায় তিনদিন যায় মনিব একদিন পাইক পাঠাল। হ্যাঁ হে, পাইক বলল, আর যে বড় টিন পেটাও না রাত্রে?

লোকটা তখন প্রলাপ বকছিল, বলল, বাঁদরের চোখ দু'টো এখনো ঐ বাঁশের ডগায় ঝুলছে। আদুরি, ও দু'টোকে নিয়ে এসে কুকুরটাকে খেতে দে। বাঁদরের চোখ দু'টো এখনো···

আদুরি বলল, শোন কথা? বাঁদরটাকে কবেই তো বাপু চিল শকুনে খেয়ে গেছে।

পাইক বলল, শোন কথা! আমি যে বলছি টিন পেটাও না কেন, তা, কথা বুঝি আর কানে যায় না! বলতে বলতে ঘর ছেড়ে দাপাতে দাপাতে বাইরে এল।

কুকুরটা তখনও কেঁউ কেঁউ করে কাঁদছিল, হঠাৎ কেমন চেঁচিয়ে উঠল। দাপাতে-দাপাতে পাইক যখন চলে যাচ্ছিল তখন ওর নজরে পড়ল হাঁসের

বাক্সটা। বাক্সটাও খোঁচা দিয়ে উলটে দিয়ে গেল। আর অমনি তখন হাঁস দু'টো পড়িমিরি ধানক্ষেতের দিকে পালিয়ে গেল।

একদিন যায় দু'দিন যায় তিনদিন যায়, একদিন স্বয়ং মনিব এসেই হাজির। হ্যাঁ হে, মনিব বলল, আর যে বড় টিন পেটাস না রাত্রে?

লোকটা তখনও প্রলাপ বকছিল। বলল, একজোড়া হাঁস সোনার ডিম পারত। চেয়ে দেখ চেয়ে দেখ, লোকটা এমন আহাম্মক যে, চাকু দিয়ে হাঁসটার পেট চিরে ফেলেছে। চেয়ে দেখ চেয়ে দেখ....

আদুরি বলল, শোন কথা, সোনার হাঁস বুঝি ডিম পারে! মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে।

মনিব বলল, শোন কথা। হারামজাদা জাত চাড়ালটাই ডুবিয়ে মারল। লোকটার দিকে মুখ করে থুতু ছেটাতে ছেটাতে বাইরের দিকে চলে এল।

কুকুরটা তেমনি কেঁউ কেঁউ করে দাওয়ায় বসে কাঁদছিল। হঠাৎ কেমন চেঁচিয়ে উঠল। হাঁস দু'টো যেন সাড়া পেয়েছে আগেই, ধানবনের দিকে গা লুকাল।

একদিন যায় দু'দিন যায়, তিনদিন যায় লোকটা একদিন সুস্থ হল। উঠে বসল, হাঁটাচলা করল। ঘর ছেড়ে বাইরে এসে লোকটা দেখল আর সব ঠিকই আছে, কেবল ধানের শীষে পাক ধরেছে। সবুজ সবুজ দুধেধান হলুদ রঙে রাঙা হয়েছে। লোকটার ভারী হালকা হালকা লাগতে লাগল। ধানের শীষে যেমন ভাবে উদাস-উদাস বাতাস বইছিল তেমনি ভাবে উদাস উদাস, বুকটা যেন হালকা হালকা লাগছিল। আর সব ঠিকই আছে, হাঁসের বাক্স, হাঁস দু'টো, দাওয়ার ওপর বস্তাটা, কুকুরটা। আর সব ঠিকই আছে, এমন কি ওর মেয়েমানুষটাও। লোকটা তখন মেয়েমানুষটাকে শুধোল, আদুরি, হাঁস দু'টো কি ডিম দেয় না?

দেয়। যা দেয় মনিব বাড়ি দিয়ে আসি।

আবার খানিকক্ষণ বাদে লোকটা শুধোল, আদুরি, কুকুরটা আর পাহারা দেয় না?

দেয়। যা দেয় তোমাকেই, তাই তো দেখি।

আবার খানিক্ষণ বাদে লোকটার মনে একটা সন্দেহ এল। ইচ্ছে হল

শুধোয়, আহুরি, মনিবটা তোকে লোভ দেখায় না! বলে না যে—ভাবতে গিয়ে লোকটার কেমন খারাপ খারাপ লাগতে লাগল।

সেই রাত্রে মেয়েমানুষটাই একসময় ফিসফিস করে বলল, জানো, গা কেমন বিষ বিষ লাগে, গুলোয়। আর বেশি দিন বাঁচব না আমি, জান।

তাই শুনে লোকটা ভীষণ ভয় পেল। পাথরের মতো শক্ত হয়ে মেয়েমানুষটাকে আঁকড়ে রইল। এমনভাবে আঁকড়ে রইল যেন বোঝাতে চাইল, মনিবটার অনেক টাকা, অনেক বল। ও যদি চায় গোটা পৃথিবীকেই কিনতে পারে। তখন, আমার কি হবে। আমার দেখ, অল্প টাকা অল্প বল। আমার কি হবে। ও যদি চায়, হাঁস দু'টো, কুকুরটা মেয়েমানুষটা সব, সবাইকে কিনতে পারে। বল, আহুরি তুই বল, তাই বলে ও তোকেও কিনে নেবে!

আহুরি বলল, আজ তুমি পাহারা দেবে না?

লোকটা বলল, দেব। বলতে বলতে উঠে গেল ধানক্ষেত পাহারা দিতে।

তখন শিরশির করে বাতাস বইছিল, ধানবনের গোড়ায় গোড়ায় ব্যাঙ ডাকছিল, ধানপাতায় দোল খেয়ে ঝিঁঝি জ্বলছিল। তখন কাঠের বাক্সটার মধ্যে গায়ে গায়ে এক হয়ে হাঁস দু'টো ঝিম খেয়ে বসেছিল। ছায়া দেখে চমকে চমকে কুকুরটা এদিকে-ওদিকে তেড়ে যাচ্ছিল। তখন টাকড়ায় বিষম লাগা রাত্রিটা যেন ভীষণ একটা বোঝার মতো ঘাড়ে গর্দানে চেপে বসেছিল। লোকটা একপরতা টিন পেটাল। একপরতা জোনাকগুলোকে জ্বলতে দেখল, নিবতে দেখল। একপরতা কুকুরটাকে ছুটতে দেখল। তারপর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে যখন খুব উত্তেজনা এল তখন আবার টিন পিটিয়ে ও জানান দিল, জানান দিল, ও আছে। ও আছে, অর্থাৎ ওর ঐ রোগা লম্বা চেহারাটা, ওর ঐ ঘোলা-ঘোলা মরামাছের মতো চোখজোড়া, ওর গায়ের ঐ খুশকি-খুশকি চামড়ার খোলশটা, চিবুকের কাছে কাঁচা সুপুরি রঙের মতো কাটা একটুখানি দাগটা, আর ওর সারা গায়ের ঘাম-ঘাম রোগা-রোগা গন্ধটা।

একদিন যায় দু'দিন যায়, তিনদিন যায়, একদিন গায়ে পড়ে এক বন্ধু এসে উপদেশ দিল, জান হে, সন্দেহ করা পাপ। পাপ যেন আগুনের

মতো। দগ্ধে দগ্ধে পুড়িয়ে মারে। মন পোড়ে, দেহ পোড়ে, সুখ পোড়ে, জান?

লোকটা বলল, জানি।

জান, তবু কেন সন্দেহ কর?

কেন করি? জানি না।

একদিন যায় দু'দিন যায় তিনদিন যায় আবার একদিন গায়ে পড়ে আর এক বন্ধু এসে উপদেশ দিল, জান হে, ঈর্ষা বড় পাপ। পাপ যেন আগুনের মতো। দগ্ধে দগ্ধে পুড়িয়ে মারে। মন পোড়ে, দেহ পোড়ে, সুখ পোড়ে, জান?

লোকটা বলল, জানি।

জান, তবু কেন ঈর্ষা কর?

কেন করি? জানি না।

একদিন যায় দু'দিন যায় তিনদিন যায় আবার একদিন গায়ে পড়ে আরো এক বন্ধু এসে উপদেশ দিল, জান হে, ক্ষোভ বড় পাপ। পাপ যেন আগুনের মতো। দগ্ধে দগ্ধে পুড়িয়ে মারে। মন পোড়ে, দেহ পোড়ে, সুখ পোড়ে, জান?

লোকটা বলল, জানি।

জান, তবু কেন ক্ষোভ কর?

কেন করি? জানি না।

লোকটা সত্যি সত্যি জানত সন্দেহ, ক্ষোভ, ঈর্ষাই ওকে পুড়িয়ে মারছে। সন্দেহ, ক্ষোভ, ঈর্ষার মতো আরো অনেক, অনেক কিছু পুড়িয়ে মারছে। জানত বলে নিজের ওপর বড় ওর ঘেন্না হত। বড্ড ওর বিরক্তি হত। ইচ্ছে হত গলায় ফাঁস দিয়ে মরে যায়, কিম্বা রামদা দিয়ে কুচিয়ে কুচিয়ে কলজেটা ও কেটে ফেলে। যেন, তা হলেই সব আপদ চোকে। কিন্তু হায়রে, আপদ কি আর গায়ের ময়লা। অত সহজে যায়? যেমনভাবে ব্যামো, না চাইলেও ব্যামো হয়, তেমনভাবে আপদ, না চাইলেও আপদ আসে, আসবেই। লোকটা তাই ঝিমিয়ে পড়ে।

দেখতে দেখতে দুধেধান হলুদ হল, ডাটো হল। ধানের ভারে সারা বন নুয়ে পড়ল, শুয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে কাস্তে হাতে চাষীরা সব মাঠ-

ময় ভেঙে পড়ল। ধানের গুছি জাপটে ধরে প্রাণের সুখে গান ধরল। এমন যখন মাঠের হাল, লোকটা তখন বুঝল এবার ওর প্রয়োজন মিটবে। কারণ এবার মাঠের ধান, গোলায় উঠবে। এবার হয়ত মনিব ওকে ডেকে নিয়ে বলবে, এবার বাপু বিদেয় হ, বিদেয় হ।

তাই যদি যেতে হয়, হাঁস দু'টোকে ও সঙ্গে নেবে, কুকুরটাকে সঙ্গে নেবে, আর মেয়েমানুষটাকেও সঙ্গে নেবে। নিয়ে, অন্য কোথাও, অন্য কোনো মনিব খুঁজে, অন্য ভাবে, আবার কিছুদিন বাসা বাঁধবে। যেন, যা কিছু হোক ও তৈরী আছে। কারণ, হাঁস দু'টো এখনও যে ডিম পাড়ছে, কুকুরটা এখনো যে রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে, মেয়েমানুষটা এখনও যে ভাত রাঁধছে, চুল বাঁধছে, তামাক সাজছে। এক কথায় ও যখন উঠতে বলে তখন ওরা ওঠে, ও যখন বসতে বলে তখন ওরা বসে। এবং নিজের এই ধারণাগুলো যাচাই করে নেওয়ার জন্য সন্ধ্যেবেলায় ও মাঠের দিকে তাকিয়ে থেকে ডাকল, আঃ আঃ আঃ—আর অমনি খুট খুট করে হেঁটে এসে হাঁস দু'টো কাঠের বাক্সের মধ্যে উঠে বসল। গভীর রাতে মাচায় উঠবার আগে ও কুকুরটাকে খিস্তি করে বলল, থাকিস কোথায়, শালা শুয়রের বাচ্চা, এ্যা? কুকুরটা অমনি ঘড়ঘড় করে সোহাগ-সোহাগ ভাব দেখাল। আর, ভোর হলে মেয়েমানুষটাকে ও কাছে ডাকল, আহুরি, আহুরি? আহুরি এসে সামনে দাঁড়াতেই তামাক সাজ। তামাক সাজতেই জল দে। জল দিতেই, এখানে বস। বসতেই উঠে দাঁড়া। দাঁড়াতেই লোকটা একগাল তৃপ্তির হাসি হাসল। কারণ, যেমনটি ও চায় তেমনটিই আছে।

সবুজ বরণ ধানের মাঠ হলুদে-সবুজে বাহার খুলে বসেছিল। দিনের আলোয় আকাশের নিচে যেন জাজিম পেতে বসেছিল। চাঁদের আলোয় রাতদুপুরে যেন তাল-তাল সোনা ছড়িয়ে পড়েছিল। দেখতে দেখতে এমন মাঠ তছনছ হয়ে গেল। কাস্তে নিয়ে চাষারা যেন যুদ্ধ করে ধান কাটছে। লোকটা কেবল দেখল। এমন দিনে একজন এসে কু-মন্ত্র দিল, ওহে শুনছ, যা পার হাতিয়ে নাও, হাতিয়ে নাও।

পাপ হবে যে?

পাপ না করলে বাঁচে না কেউ, হাতিয়ে নাও, হাতিয়ে নাও।

এমন দিনে একজন এসে সু-মন্ত্র দিল, ওহে শুনছ, পরের ধন ওসব। মনে রেখ, মনে রেখ।

লোভ হয় যে?

লোভে পাপ, পাপে মরণ। মনে রেখ, মনে রেখ।

সেদিন রাতে আতুরি বলল, জান, মনিব বাড়ি গিয়েছিলাম।

কেন?

মনিব আমায় জোনাকি-রঙ নাকের ফুল দেবে বলেছিল।

কেন?

কেন কি, বকশিস গো বকশিস। বকশিস জান না। হঁ্যা গো, তুমি আমায় বকশিস দেবে? দাও তো, একটা চাই।

কেমন ভাবে বুকটা যেন চলকে উঠল। চোয়াল তু'টো চটচট করে চাক বাঁধল। হাতের সামনে কিছু একটা পেলে যেন এক্ষুনি তা মুঠ করে চেপে ধরে মেয়েমানুষটার চোখ তু'টো গেলে দেয়। জাহান্নামের জীব, জাহান্নামেই পাঠিয়ে দেয়। কে একজন ভেতরে বসে কু-মন্ত্র দিচ্ছে, পাপ না করলে বাঁচে না কেউ। কে একজন ভেতর থেকে সু-মন্ত্র দিচ্ছে, সাবধান সাবধান পাপ করলে মরতে হয়।

আতুরি বলল, দেবে?

লোকটা বলল, কি?

তোমার ঐ হাঁস তু'টো। মনিববাবু খেতে চায়।

এমন সময় লোকটা হঠাৎ মেয়েমানুষটার মুখ এমন ভাবে চেপে ধরল যে হাতের মুঠোয় চোয়ালটা যেন চিপসে গেল। এখন রাত্রি, তাই ও বুঝতে পারল না হাতটা যে চটচট করে ভিজে যাচ্ছে তা লালায় না রক্তে। ভেজা হাতটা ও মাটিতে মুছে গজগজ করে শুনিয়ে দিল, আমার ইচ্ছা হয় জ্যান্ত মেয়েমানুষের পেট চিরে দেখতে, কেমন ভাবে ওখানে রক্তে চর্বিতে বাচ্চাটা লুকিয়ে থাকে। আর তু'দিন যাক, তোর পেটটাই চিরব। বলতে বলতে টিন্ পিটিয়ে নিজেকে জানান দেবার জন্য উঠে গেল লোকটা মাচার দিকে।

সারাটা রাত মাচায় বসে লোকটা কেমন যেন নিথর হয়ে গিয়েছিল। বারকয়েক মুখের মধ্যে থুতু জমিয়ে বিজবিজ করে ফেনা কাটল, বার কয়েক সেই থুতু আকাশের দিকে তাক করে ছুঁড়ে মারল। ঝড়ো কাকলাস ধানক্ষেতের চেহারাটা এমন হল কবে! হায়রে, সারা মাঠ খা খা করছে। এত বাতাস কার জন্য গো, কার জন্যে। আহা, এই যে চাঁদের আলো, কার জন্যে গো কার জন্যে। ছিঁটে-ফোঁটা ধানের কনাটাও রেখে যায় নি ওরা। খা খা করছে, ধু ধু করছে। আহা গো, এমন সব পুষ্টু পুষ্টু ধানের চারা কবে ওসব বুড়িয়ে গেল কবে ওসব ফুরিয়ে গেল! লোকটা একবার পাগলের মতো হাসল। কারণ, এখন আর ওর মাচায় বসে রাত্রি জেগে টিন পেটাবার মানেই হয় না। তবু ও জানান দিচ্ছে, হায়রে, তবুও জানান দিল, ও আছে। ও আছে, অর্থাৎ ওর ঐ চোয়াড়ে লম্বা চেহারাটা, ওর ঐ ঘোলা-ঘোলা মরামাছের মতো চোখ জোড়া, ওর গায়ের ঐ খুশকি-খুশকি চামড়ার খোলশটা, চিবুকের কাছে কাঁচা সুপুরির রঙের মতো কাটা দাগটা, আর ওর সারা গায়ের ঘাম্ম-ঘাম চাষাড়ে-চাষাড়ে গন্ধটা।

লোকটা তারপর বসে বসে নিজেরই মাথার চুল ছিঁড়ল। আকাশের চাঁদটাকে সাক্ষী মেনে অনেক কথা বলতে চাইল। হাতের পাঞ্জা দু'টো বারে বারে মুঠ করল, খুলে ধরল। ঘোলাটে চোখে সারা মাঠ দেখতে দেখতে একসময় ওর মনে হল ও যেন একটা কুশ পুতুল। যে পুতুলটার মুখ, পুরনো হাঁড়ির মতো তুম্বো, ভীষণ কালো, কালো আর ঠুনকো। যে পুতুলটার কালো মুখে চুন বুলিয়ে চোখ মুখ দগদগে করে এঁকে নেওয়া। যে পুতুলটার গায়ে একটা আলখাল্লা চড়ানো। আলখাল্লার হাত দুটো লম্বা ভাবে ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে থাকে, নড়েও না চড়েও না। বাতাস পেলে কাঁপে, না পেলে কাঁপেও না। আলখাল্লার নিচে একটা মেরুদণ্ড। শুধু দণ্ড, মেদ নেই, মাংস নেই, ফুসফুস নেই, হৃদয় নেই, যে পুতুলটাকে কাক চড়ুই তাড়াবার জন্য দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। সোনার ফসল ফুরিয়ে যেতেও পুতুলটা অমনি দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটার তখন চোখের ডিম দুটো ঝাপসা হয়ে বাষ্প বেরিয়ে আসছিল। এমন সময় ও লক্ষ্য করল, কুকুরটা কেবল পরিত্রাহি চেঁচিয়ে

যাচ্ছে। হাঁসের বাক্সটা নিথর। বাক্সের ওপর গুটিকয় জোনাকি বসেছে। জোনাকগুলো জ্বলছে, নীল বর্ণ কুচি কুচি মুক্তোর মতো, জ্বলছে। একটানা ঝিনঝিন করে ঝিঁঝি ডাকছে। একটানা শিরশির করে বাতাস বইছে। একটানা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভেজা-ভেজা বরফ-চাঁদের আলো ঝরছে। ঝরতে ঝরতে একসময়, সব আলোই ফুরিয়ে গেল। তখন ভোর হল। সারা আকাশ আগুন লাগলে যেমন হয়, তেমনি ধারা রাঙা হল, ফরসা হল। লোকটা তখন মাচা থেকে নেমে এল। নেমে এসে প্রথমেই সে হাঁসের বাক্সটার দিকে এগোল। বাক্সের মধ্যে হাঁস দু'টো নড়াচড়া করছিল। বাক্সের গায়ে হাত না দিয়েও কেমন যেন অনুভব করল লোকটা। এক পলক কি যেন ও ভাবল, তারপর হাঁস দুটোর টুটি ধরে হাঁটতে লাগল।

আতুরির চোখে ঘুম ঘুম ঢল; ও কি? যাচ্ছ কোথায়?

মনিব বাড়ি।

কেন?

হাঁস দু'টোকে বিদেয় করতে।

বিদেয় করে ফিরে এসে লোকটা আবার ভাবতে লাগল, এবার থেকে আর কখনো এমনভাবে হাঁস পালবে না ও। হাঁস দু'টোকে না পাললে ঝরতি পড়তি আয়ের পথও বন্ধ হবে আজ থেকে। হাঁস দু'টোকে না পাললে দিন চালাতে কষ্ট হবে এখন থেকে। তা হোক্, ও দু'টোকে না পাললে কুকুরটাকেও দরকার নেই। ঠিক যেমনভাবে মাঠের ধান গোলায় ওঠায় লোকটারও আর দরকার নেই। ফলে, রাগটা ওর কুকুরটার ওপর ছড়িয়ে পড়ল। ডাকল, আতুরি? আতুরি?

আতুরি তখন নাড়ার আগুনে ভাত রাঁধছিল, ছুটতে ছুটতে এল, কী।

রামদা দে।

কেন? রামদা কেন, কি হবে?

কুকুরটাকে জবাই করব। বাঞ্চোৎটা অত চেঁচায় কেন, এ্যা?

সত্যিই হয়তো কুকুরটাকে জবাই করে ফেলত লোকটা। আতুরি কেমন কৌশল করে জন্তুটাকে অনেক দূরে তাড়িয়ে এল। ফলে লোকটা আবার ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ল।

ভাল কথা, হাঁস দু'টোকে বিদেয় করায়, লোকটার এখন কেবল মাত্র কুকুরটা আর মেয়েমানুষটাই রইল। কুকুরটা কেমন মনমরা। লোকটার যখন ব্যামো ছিল, তখন যেমন কেঁউ কেঁউ করে কাঁদত এখনও তেমন কেঁউ কেঁউ করে কাঁদে। কিন্তু মেয়েমানুষটার কথা আলাদা। তখন যেমন চুল বাঁধত, ভাত রাঁধত, গা ধুত, আবার কদাচিৎ আদুরে-আদুরে ভাব করে লোকটার সঙ্গে কথা কইত, এখনও তেমনি চুল বাঁধে, গা ধোয়, ভাত রাঁধে, আবার কদাচিৎ আদুরে আদুরে ভাব করে লোকটার সঙ্গে কথা কয়। বলে, জান, গা কেমন গুলায়, বিষ বিষ লাগে।

লোকটা বলে, তাহলে চল অন্য কোথাও পালিয়ে যাই।

গিয়ে।

নতুন করে ঘর বাঁধি।

বেঁধে।

নতুনভাবে সুখ খুঁজি।

খুঁজে।

তুই বাঁচবি, আমি বাঁচব। তুই আমি দু'জনেই শুধু ভোগ করব। তুই আমি দু'জনেই, শুধু দু'জনেই। তখন সব দুঃখ ঘুচবে। তখন সব জ্বালা মিটবে।

এ সব কথা ভাবতে ভাবতে একদিন গেল, দু'দিন গেল, তিনদিন গেল। তৃতীয় দিন লোকটা চেঁচিয়ে উঠল! আদুরি। আদুরি। আয় আয় দেখে যা, কুকুরটা কেমন ফাঁদে পড়েছে।

আদুরি দেখল বানর ধরার ফাঁদের মধ্যে কুকুরটা কেমন আটকা পড়ে চিতিয়ে আছে।

লোকটা বলল, দেখত, ওটা মরেছে না বেঁচে আছে?

মরেছে।

মরেছে? যাক, আপদ গেল।

একদিন গেল দু'দিন গেল তিনদিন গেল। এমন সময় লোকটার সেই মনিববাবু, একদিন ওকে ডেকে পাঠালো। লোকটা এল।

মনিব বলল, শুনলাম, কুকুরটাকে নাকি তাড়িয়ে দিয়েছিস?

লোকটা বলল, দিয়েছি।

দিয়েছিস। বেশ বেশ। কুকুর টুকুর পোষা তোর শোভা পায় না। বেশ করেছিস।

লোকটা তখন মাথা নিচু করে ফিরে এল। এসে, দাওয়ার ওপর তখনও সেই বস্তাটাকে পাতা দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছিল লোকটা তাই হুকুম করল, আহুরি, তামাক সাজ।

একদিন গেল দু'দিন গেল তিনদিন গেল। এমন সময় লোকটার সেই মনিববাবু আর একদিন ওকে ডেকে পাঠালো।

লোকটা এল।

মনিববাবু বলল, তা যাই বলিস, হাঁসের মাংস কিন্তু তোফা খেয়েছি। বেশ পুষেছিলি, বেশ।

লোকটা তখন মাথা নিচু করে ফিরে এল। ঘরের কোণে কাঠের বাক্সটার কাছে এসে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তখন ছিল ভর দুপুর, লোকটা তাই হুকুম করল আহুরি ভাত বাড়।

একদিন গেল, দু'দিন গেল, তিনদিন গেল। এমন সময় লোকটার সেই মনিববাবু, আবার একদিন ওকে ডেকে পাঠালো।

লোকটা এল।

মনিব বলল, মেয়েমানুষটাকে কি করবি? তার চে বরং আমায় দে। এখানে থাক। দিবি?

লোকটা বলল, দেব। বলতে বলতে মাথা নিচু করে খানিকটা দূর এগোল। এগিয়ে পড়িমরি ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এল। বাড়ির দাওয়ার পৌঁছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকল, আহুরি? আহুরি?

আহুরি তখন পায়ের নখে রঙ মাখছিল, কী? কেন?

লোকটা বলল, চল, এখনি আমরা পালিয়ে যাই।

কোথায়?

যেদিক ইচ্ছে সেদিক।

সারা মাঠ তখন খা-খা করছে, ধু-ধু করছে। তপ্ত তপ্ত বাতাস বইছে। এত বাতাস কার জন্যে গো, কার জন্যে। ছিঁটেফোঁটা ধানের কণাটাও

রেখে যায়নি ওরা। খা খা করছে, ধু ধু করছে। আহা, কার জন্যে গো, কার জন্যে। লোকটা তখন আহুরির হাত শক্ত করে চেপে ধরল। বলল, চল চল। এখানে নয়, এখানে নয়, অন্য কোথাও। চল, চল, থামিস না। এখানে নয় এখানে নয়, অন্য কোথাও। চল, চল।

আহুরি বলল, পারছি না যে।

লোকটা বলল, চল চল, এখানে নয় এখানে নয় অন্য কোথাও।

একদিন গেল, ছু'দিন গেল, তিনদিন গেল। একমাস গেল ছু'মাস গেল। শীত গেল, বসন্ত গেল, গ্রীষ্ম গেল। একদিন, সারা আকাশ ডিমিডিমি, মেঘ নামল। বর্ষা এল। অঝোর ক্ষ্যাপা বাতাস বইল, বর্ষা এল। ঝিলিক দিয়ে বাজ পড়ল। বজ্রাঘাতে সুপুরি গাছ কুঁকড়ে এল। ভিজতে ভিজতে জাত চাষারা মাঠে নামল। এমন বর্ষা, এমন বর্ষা! মনের মধ্যে ময়ুর নাচছে। এমন বর্ষা, এমন বর্ষা! এ বর্ষায়, লোকালয় থেকে অনেক দূরে, বহুকালের পুরানো ইট ঝুরো ঝুরো এক মন্দিরের মাঝে রাত গভীরে একদিন প্রদীপ জ্বলল। গা ছমছম দত্যি দানো পাশেই আছে। ফিসফিস করে তিনটে লোক তাই কথা বলছে।

দাই বলল, আহা আহা, দেখ দেখ, মুখখানা যেন বাপের মতো।

আহুরি বলল, কিন্তু গায়ের রঙটা মনিবের চেয়েও ফর্সা।

লোকটা বলল, তাই না ওকে চিনতে পারলাম। কে জানে আমার মতোই ভাগ্য কিনা।

বাইরে তখন অঝোর হয়ে বৃষ্টি ঝরছে। গা ছমছম দত্যিদানো পাশেই আছে। কে জানে এসব ওরা শুনল কিনা! তাই বলছিলাম, একটা লোক কুকুর ও একটা মেয়েমানুষ পুষত। কিন্তু যে কথা বলি নি সে কথা কে না জানে, লোকটাকে পুষত অনেকে, অনেক কিছুতে।

# রাখাল কড়াই

**শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়**

চকবেড়ের মোড় থেকে বাস চন্দনেশ্বরের বাজারের দিকে ঘুরে গেল। ভাঙড় যাবে। চারদিকে ধানক্ষেত। তার ভেতর রোগা পিচরাস্তা বেয়ে চার চাকার রাজহাঁস ছুটে যাচ্ছে। ক্ষীরোদ পাকড়াশি বাস রাস্তা থেকে নেমে খাল পাড়ে উঠে হন হন করে হাঁটা ধরল। হাতে পাকানো বাসের টিকিট। এখন বিদ্যেধরীর বাদা মাড়িয়ে গরাণবেড়ে পৌঁছে দুপুরের আগেই লোকজন ডাকতে হবে।

খবর যতদূর, জিনিস নাকি সরেস—ঘরে রেখে রস মেরে নিলে পিঁড়ি চাই পিঁড়ি, জানলা দরজা কপাট সব হবে। বাদার গাছ, চার মানুষেও বেড় পায় না—হোক না তেঁতুল। সাল সেগুনের কারবারে কে দাঁড়াবে? বৌবাজার, শেয়ালদার ক'খানা বাছাই ঘর বাদে সব দোকানই জাম-জামরুল-তেঁতুলে ছেয়ে গেছে। ভাল পালিশের চেকনাইয়ে কত মিটসেফ, আলনা, আলমারি, ইজিচেয়ার দিব্যি বাজারে চলে যাচ্ছে। এই ডামাডোলে ক্ষীরোদ এমন সরেস তেঁতুল কাঠের খোঁজ পেয়ে লোভ সামলাতে পারেনি। লোকজনের ভরসা না করে নিজেই বেরিয়ে পড়েছে। শ্রীমানি মার্কেটের ধারে ধারে ক'ঘর কবিরাজের দোকান। নানান্ জায়গার লোক শেকড়বাকড়, লতা-পাতা বেচতে আসে। হরনাথ তর্কভূষণ বৃহৎ গুগ্‌গুল ও চ্যবনপ্রাশের বয়ম রাখবে বলে গত শ্রাবণে জাব্দা মত পাঁচ তাকের এক আলমারি নিয়েছিল। পরশু সেই টাকার তাগাদায় গিয়ে এই গাছের সন্ধান।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ওপর বাঁপকেলে দোকান। তর্কভূষণ ইলেকট্রিকের ধার ধারে না। হেরিকেনের সামনে বাঁদুরে টুপি কম্ফটার বালাপোষ চাপিয়ে দশাসই লাস একেবারে সাক্ষাৎ যম সেজে বসে। চার কিস্তিতে আলমারির দাম শোধ হওয়ার কথা—দশ বারেও অর্ধেক উঠিয়ে আনতে

পারেনি ক্ষীরোদ। শিষ উঠে হেরিকেন কেবল কালি ওগলাচ্ছে। কম্ফটারের আলগা গেরোর ভেতর দিয়ে এক খাবলা পাকা দাড়ির সাদা ছোপ। আধ ঘণ্টা বসেও টাকার কথাটা পাড়তে পারেনি। পা নামাতেই মেঝের ড্যাম্প কোমর অবধি উঠে এসেছিল পরশু। ভাল জ্বালা! এই ড্যাম্পের হাত থেকে ভাল ভাল বটিকা, পাঁচন বাঁচানোর জন্যেই হরনাথ হাত ধরে আলমারি চেয়েছিল একটা। এখন টাকার কথা তুললেই বলে, শীতটা ভাল করে পাকুক—শ্লেষা ধাতের সব রুগী এই তর্কভূষণের দোরে এসে লাইন দেবে। তখন নাকি আলমারির দাম শুধে আগাম সুদ্ধ চার পেয়ার চেয়ারের অর্ডার দেবে হরনাথ।

আগের অবস্থা থাকলে ক্ষীরোদ দু'খানা চেয়ার অমনি করে দিত কবিরাজকে। বুড়ো আর বেশীদিন নেই। ঠিক তখনই ফুটপাত থেকে মুসকো মত একটা লোক সোজা হেরিকেনের সামনে উঠে এসেছিল। গায়ে জড়ানো কাপড়ের খুঁট টেবিলে আলগা করে দিল লোকটা। দেড়পো আধসের ট্যাংরার চেয়েও লম্বা লম্বা তেঁতুল, 'এনেছি—এ কটার বেশি হল না—'

হাত পাঁচেক লম্বা, মাথার চুল অনেকটাই শাদা, কুঁজো হয়ে দাঁড়ানোয় পেটের খোঁদলে দিব্যি একটা ধামা বসিয়ে দেওয়া যায়।

তর্কভূষণ টুপির ভেতর থেকেই বলল, 'এর চেয়ে বড় পেলে না?'

'থাকবে না কেন? পাবার যো আছে—গাছতলায় পড়তেই বেদেদের শোর এসে চেঁচে পুঁছে খেয়ে যাবে—'

একটা তেঁতুল হেরিকেনের সামনে তুলে ধরে কবিরাজ গন্ধ নিল নাকে, 'বাড়ন কমে গেছে বোধহয়—'

'তোমার বাপের আমল থেকে দে যাচ্ছি—কতকেলে গাছ, এবারে ছোট হয়ে আসছে।'

ক্ষীরোদ আর থাকতে পারেনি, 'কত কালের গাছ?'

'তা ধরুণ আমাদের সাত পুরুষ ওর ডালে পুড়েছে—এখন জুড়ে দেখুন।'

মনে মনে হিসেব করতে যাচ্ছিল ক্ষীরোদ। লোকটা সব গুলিয়ে দিল, 'এ তেঁতুল তো খেতি পারিনে আমরা—বিষ! একবার

খেলিই জ্বর—তারপর ভুল বকে কাল ঘুম—একদম ঢলে পড়তি হবেনে।'

হরনাথ একটা তেঁতুল ভেঙে তখনও গন্ধ শুঁকছে।

ক্ষীরোদের মুখ দেখে কী দয়া হল লোকটার। বলল, 'এ আপনার জঙ্গুলে তেঁতুল। ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার বাপ জঙ্গল হাসিল করে গরাণবেড়ের মুলুক বসায়—সেই ইস্তক গাছটা আছে। কী শোভা ছিল আগে—ছোটবেলায় গা ভরে এমন ঝুলে থাকত—'

'না গায়েন, রস কষে গেছে—এ তেঁতুলে আমার হবে না। ও তুমি নিয়ে যাও—'

লোকটা হেরিকেন বরাবর সিধে দাঁড়িয়ে গেল, 'তা হবে না কবিরাজ। কত আজে বাজে লতা পাতা কিনছ দিনভর—আর গাছের এমন আদত্ ফল নে ফিরে যেতি হবে?

'দরকার না থাকলে যেতে হবে।'

'এতটা পথ ভেঙে এলুম—'

'সে তুমি ফি'বারই বল। দরকার না থাকলে কাহাতক কিনি বলতো গায়েন? এমন নয় যে, ঘরে রেখে টক রেঁধে খাব!'

'পোকায় এবার ধান পাট সব শুকিয়ে পুড়িয়ে জেরবার করেছে। নয়ত আসতুম না—নাও রেখে দাও, খরার দিন কাজে দেবে—'

লোকটা নিজে নিজেই সামনে আলমারির খোলা তাকে একটা করে তেঁতুল তুলে সাজিয়ে রাখছিল।

'নোংরা করো না। ঝামেলা ভাল লাগে না গায়েন—' হরনাথ উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার চেয়ারে বসল। গায়েন কাপড়ের খুঁটে তেঁতুল তুলে নিয়ে ফুটপাথে নেমে গেল।

ভীষণ শীত পড়েছে, মুলোর দর এখনও নামছে না—এইসব ধানাই পানাই বলে টাকার কথা না পেড়েই কোন গতিকে ক্ষীরোদ রাস্তায় নেমে পড়ল। তেঁতুল নিয়ে হু' হুটো হুমদো বুড়ো যা করছিল, চোখে দেখা যায় না। ফুটপাথের তেলেভাজা দোকানীর তোলা উনুনের ধোঁয়া ফুঁড়ে শাদা রঙের লম্বাই চওড়াই গায়েন হুস হাস এগোচ্ছে। পরনের

কাপড়ের খানিকটা গায়ে। ক্ষীরোদ একরকম দৌড়েই ধরে ফেলল, 'কতদুর যাওয়া হবে ?'

রাস টেনে দাঁড়াল লোকটা, 'কোথায় দেখিচি বলুন তো ?'

'কবিরাজের দোকানে—এই মাত্তর !'

তুই থাবা দিয়ে ক্ষীরোদের হাত ধরল। জানলার রডের পারা আঙুলগুলো আর একটু লম্বা হলে তার কনুই ধরে ফেলত।

'বুড়োর বাপ থাকতে তেঁতুল, অর্জুন ছাল কত কি দে আসতুম—' একটু থেমে বলল, 'আগে কত রুগী বসে থাকত—হরনাথই বা করবে কি।'

ক্ষীরোদের হাত ছেড়ে দিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। ক্ষীরোদ দৌড়ুতে লাগল। 'ন'টা আটান্ন না ধরলে বাস পাব নি। এত আঁধার এখন আর দু' কোশ একা হাঁটতি ভাল লাগে না।'

ক্ষীরোদ আর ভূমিকা করার সময় পেলে না, 'অনেকদিনের গাছ—'

দমকে বেরিয়ে যাবার আগে গায়েন আবার থামল, 'কোন গাছ ?'

ফুটপাথে কথা বলা যায় না। লোকজন বন্ধ নেই কোন সময়, 'তাই তো বলছিলেন গায়েন মশায়—সাতপুরুষের—'

একদম থেমে গেল গায়েন, 'ওঃ! আমাগে গড়াণবেড়ের—সে মশায় বড় অগড়ের গাছ—তার অগড়ের কথা কত বলব—'

'যদি বলেন তো একবার দেখে আসি—'

'যাবেন ? গড়াণবেড়ে যাবেন ?'

'খুব ! সকাল সকাল গিয়ে ঘুরে আসব। কালই সকালে—'

'কাল নয়—আট গাড়ি খড় নে খালিশপুর যেতি হবে—পরশু আসুন—ভোরের ট্রেনে চড়ে বাস্‌লিডেঙ্গা নাববেন, চাকবেড়ের মোড়ে আমায় পাবেন—না দেখলি হাঁক পাড়বেন নীলাম্বর গায়েন বলে—

পরশু আর কথা বলতে পারেনি গায়েন। না ছুটলে ন'টা আটান্নো মিস্ হয়ে যেতো।

সে রাতেই গোলায় ফিরে ক্ষীরোদ তিনখানা বড় করাত ভাড়া নিয়েছে। গরাণবেড়ের লোকজন লাগিয়ে তিনদিনে কুড়োলে কুড়োলে পুরো গাছটা খানকয়েক গরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিতে হবে। বাস্‌লিডাঙ্গা থেকে রেলে

বুক করে দিলে পরদিনই চিৎপুর ইয়ার্ডে মাল ডেলিভারি। তারপর কয়েক ক্ষেপে লরিতে পুরো গাছটা গোলায়। তখন ভাড়ার করাতে চেরাই, প্লেন পালিশ। অতকেলে গাছ—মোদ্দা কত হাজার সি এফটিতে দাঁড়াবে মনে মনে হিসেব কষতে গিয়ে সব অঙ্ক গুলিয়ে গেছে। এসব কাগজ-কলম ছাড়া জুৎ হয় না। হাঁক দিতে হল না—বরং কানের কাছে গিয়ে আস্তে ডাক দিল ক্ষীরোদ, '—গায়েন মশাই, ও নীলাম্বর গায়েন—'

একটু নড়ে চড়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। খালপাড় থেকেই দেখতে পেয়েছে ক্ষীরোদ। পুকুরপাড়ে তুলে দেওয়া শুকনো কচুরিপানার ডাই জুড়ে মা সুদ্ধ পাঁচ-ছ'টা কুকুরছানা রোদ পোহাচ্ছে। তাদেরই দু'টোকে কোলে নিয়ে গায়েন ঝিম মেরে বসে।

'এসে গেছেন। ভাবলুম বেলাবেলি বেইরি আসতে দেরি হবে আপনার, তাই অঘোরের ঘরে বসতিই এই কাণ্ড—।' ভগ্ ভগ্ করে গন্ধ আসছে। সারা মুখে জোর গোটা আটেক দাঁত। তার ভেতর দিয়েই হেসে বলল গায়েন, 'অঘোর বেটে মুকুজ্যেদের চর-হাসিল, দশ বিঘে খালি জমি কিনল। ওদের হয়ে অনেক খুনখারাবি করেছি—মুকুজ্যেরা তাই আমাকে দেখেই তিন হাজারের ভেতর সবটা জায়গা অঘোরকে লিখে দিলে। বেটে অঘোর সকালবেলাই তাই এসব ছাইপাশ গিলিয়ে দিলে—'

আল ধরে ধরে গায়েন এগোচ্ছে—ক্ষীরোদ খানিক দৌড়ে তাকে ধরল। দুই ছেলে নিয়ে এক চাষী পান্তা পেড়ে বসেছে। একটা উঁচু ঢিবিতে পাল্লা খাটিয়ে মাঠের ধান মাঠেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সেকথা বলতে গায়েন তিরিক্ষি হয়ে উঠল, 'লিভির ভয়ে পিচ রাস্তায় ধান নে যাবার পথ নেই—চৌকি বসেছে—'

খানিক জায়গা জুড়ে ধানগাছ সব খাক্। এ সব জায়গায় বর্ষার মুখে মুখে বিষপোকার ঝাঁক উড়ে গেছে—ধান দূরে থাক, ভাল খড়ও পাওয়া যাবে না।'

পথ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে গায়েন নিচু হয়ে ঘাসের চেয়েও সবুজ খুদে খুদে বরবটি তুলে ক্ষীরোদের হাতে দিল, 'ভেঙ্গে মুখে দিন—রাখাল কড়াই,

বয়েসকালে গরু চরাতে এসে ক্ষিধের চোটে এসব কত খেয়েছি—শুকিয়ে নিলি ভাল ডাল হয়—'

'গরু ছিল বুঝি—'

'হেলে গরুই বেশি—একাই বিঘেটাক দিন ভরে চষে ফেলেছি। সন্ধ্যেবেলা চরানির মাঠ ঢেকে রেখে দিতুম—রাত থাকতি জোচ্ছনায় সেখানে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতুম, ভোর হলিই হালে জুতে—'

'সাঁপটাপ—'

'কোথায়? আজকাল আর দেখিনে—'

ক্ষীরোদ কিন্তু সাবধানে পা ফেলে এগোতে লাগল। এমন দশ বিশ হাজার বিঘের মাঠে যে কোন জায়গা থেকেই সাপ উঠে আসতে পারে।

'আছে দু' একটা—খুব রাত না হলি বেরোয় না। ভয়ানক বিষধর। তবে, আগে অনেক ছেল। সত্তর আশিটে কেউটে আমিই সাবাড় করিছি—'

'লাঠি দিয়ে—'

'লাঠি কোথায়! এই হাত দে—' গায়েন দাঁড়িয়ে গেল।

আর কত দূর গরাণবেড়ে। অনেকক্ষণ বসতবাড়ির পরিষ্কার ঢিবি জায়গায় দাঁড়ানো হয়নি। নিশ্চয় সেখানে সাপ থাকে না।

'এখন যেখানে দাঁড়িয়ে—তার মাথায় অন্তত ষাট হাত জল ছেল—বিদ্যেধরীর জল, নৌকো এ জায়গায় এলি পয়সা ছুঁড়ে দিতুম—'

'এখানে? নদী?'

'এ জায়গা তো মধ্যিখান—তিন মাইল চওড়া বুক ছেল, আমিই চাল বাঝাই দে ধোসারহাট ঘুরে চেতলার আঢ্যিদের গোলায় কালীগঙ্গা ধরে নৌকো পৌঁছে দিতুম। ওই যে বাবলার ঝাড়—রশি দশেক হবে, ওসব গাছ ত বছর সাতের—নদী ফুরে আসার মুখি পাখিদের কাণ্ড।'

ক্ষীরোদের আর কিছু বলতে হল না অনেকক্ষণ। নীলাম্বর আগে আগে হাঁটছে। পেছনে ক্ষীরোদ, সামনে কেউ নেই। সেই ফাঁকার দিকে তাকিয়ে নীলাম্বর কথা বলছে। উলটো দিক থেকে বাতাস এসে তার কিছু শব্দ তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে। ক্ষীরোদ খানিকটা শুনতে পেল—তাকেও পথ দেখে পা চালাতে হচ্ছে।

'বিত্তেধরীর বুক জেগে উঠতি দু'পাশে লাঠালাঠি শুরু হয়ে গেল। যার জমির লাগোয়া চর ওঠে সেই রাজা—দুশো-পাঁচশো বিঘে হামেশাই অনেকের ক্ষেতের গা দিয়ে জেগে গেল। কিন্তু দখলে রাখা চাই। আর লাঠালাঠি! এখানটায় থেমে গায়েন দু'হাতে তালি দিয়ে হেসে উঠল।

ক্ষীরোদ মানে না বুঝেও সঙ্গে সঙ্গে হাসল। গাছটা নীলাম্বরদের।

'আমি তখন বড় গুণ্ডো। বুকে বুকে খাড়াই গুতো মেরে মাল খেলি—যার লাগে তার চড়চড় করে আওয়াজ হয়—আমি দাঁড়াইনে, ফেড়ে বেইরে যাই। মুকুজ্যেদের বড় তরফ ডেকে নে বললে, নারাণপুরের কাছে পাঁচ হাজার বিঘের চরটা দখল করে দিলি একশো বিঘে জায়গা লিখে দেবে—

'তা দেছেলে—হোসেনপুরের মোড়লদের বড় ছেলেটাকে কেটে ফেললাম। জোয়ান বয়েস, রক্তের রঙ কী—জমি দখলে এমন কত হত—' গায়েন থেমে থেকে মাঠের মাঝখানে এক জায়গায় আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, 'ওই যে রূপশাল ধান দেখিছেন ওখানটায়—ঠিক ওই খাক্ মত জায়গাটায় খুনটো করি—'

ধান আছে—ভেতরের দুধ পোকার বিষে শুকিয়ে খাক্। এতক্ষণ দু'জনে গরুর গাড়ির লিক্ ধরে এগোচ্ছিল। এবারে গায়েনের সঙ্গে মাঠে নামল ক্ষীরোদ।

'খুনটা হয়ে যাওয়ার পর মন মুষড়ে গেল—কিন্তু তখন ছেলেরা ছোট, আমার ফাঁসি হলে ওদের দেখতো কে? মাঠের মধ্যি বসেই মোড়লদের, ছেলেটাকে ল্যাজা দে এতটুকুন টুকরো টুকরো করে চৌদিক ছড়িয়ে দেলাম—আর কী শকুন! তিন দিনের ভেতর—সব সাফ!

তারপর একশো বিঘে নে কি করব? আর কি মাটি! ধান ছড়িয়ে দি তো ধান বেরোয়—এই তার গোছ—কিন্তু মুসকিল দেখা দেল সাপ নে। যেখানে কোপাও নরম মাটি পেয়ে সাতদিনের ভেতর গোখরো তার ছানা পোনা নে হাজির। গোটা কয়েক মারার পর আমাকে দেখলি ওরা গর্তে গিয়ে লুকোতো। আমি লেজ ধরে টানতুম—উল্টো টানে গায়ের মাংস খাবলা খাবলা উঠি যেত। সে অবস্থায় মাথার ওপর পাক দে ছুঁড়ে দিতুম—তারপর বাচ্চারাই পিটে মারত।'

'গরাণবেড়ে আর কতদূর ?'

'এসে গিছি।'

নদীর বুকের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আগেকার পাড়ে এসে উঠতে আরও আধ ঘণ্টা লাগল। সেখানেই মার খাওয়া নদীটাকে পাওয়া গেল। খানা কেটে দেওয়া ড্রেনের চেয়েও সরু—জলের ছিটে ফোঁটাও নেই, দু'ধারে কিছু বুনো ফুল ফোটে।

'এই নদী গিয়েই আমাদের সব্বনাশের শুরু। নদীও গেল—মাছ গেল, ব্যবসা গেল—'

এত গাছ, আড়াল আবডাল নেই—শুধু মাঠ, হামেশাই দশ বিশ বিঘের দিঘি—তাতে পলক পড়ে না এমন শালুকের পুরু চাদর, বাতাস একটু থামতেই শুকনো বকুলের ভারি গন্ধ। ক্ষীরোদ একটিপ নস্যি নিয়ে ফেলল।

'দেখতি পাচ্ছেন ?'

দক্ষিণে তাকিয়ে ক্ষীরোদ থমকে দাঁড়াল। আকাশের সবখানি জুড়ে সবুজ একটা মাথা উঠে গেছে। পাতার চেহারা অন্য তেঁতুলের চেয়ে কিছু আলাদা। এক একখানা ডালে শেয়ালদার আধখানা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে যাবে। এ কেটে নিয়ে গরুর গাড়িতে চাপাতে কম করেও মাস খানেক চলে যাবে।

'পিঁপড়ে হয়নি গাছে ? পোকা ?'

'নালসের ডিম আছে ঝুড়ি ঝুড়ি। পোকামাকড় নেই একদম। একটুও ঘুণ ধরেনি—'

গাছের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্ষীরোদ নীলাম্বরের সঙ্গে এক উঠোন লোকের মধ্যে এসে পড়ল। জনা ষোল ধান ঝাড়ছে। ইঁটের চেয়েও কঠিন মাটির দাওয়ায় এক তে-মাথা বুড়োর পাশে খেজুর পাতার চ্যাটাইতে বসতে হল। পরামাণিক বুড়োর গালে ফটকিরি বুলিয়ে ক্ষীরোদের থুতনী ধরে ফেলল।

'কামিয়ে নিন্—আপনারা শহরগঞ্জের মানুষ—'নীলাম্বর নিজেই পরামাণিকের বাক্স এগিয়ে দিল।

গাল বাড়িয়ে দিয়ে ক্ষীরোদ সামনেই আবার তেঁতুলগাছটা দেখতে পেল। গোড়ায় একটা ভাঙ্গা টিউবওয়েল।

'জল ওঠে না?'

'অনেক টাকা দে বসাই। দু'বছর না ঘুরতি বালি ঢুকে বন্ধ হয়ে গেল—'

'কত ফুট?'

'সাতশো সাড়ে সাতশো—জল এখানে অনেক নীচে—' সেই বুঁড়ো এব লাফে মাটিতে নেমে বলল, 'সোঁদরবনের মাটি তো—'

'তাই বুঝি।'

'লোলাম্বর তখন ছোট। ওর বাপ আর আমি দেখিছি—আমাদের খুড়ো মশাই লাঙল টানতে পারতেন না। লাঙ্গলের ফলা মাটিতে ঢোকেই না। ঢুকলিও গুচ্ছের শেকড়বাকড় আটকে যায়—'

'কী রকম?'

'তল্লাট ভরে তো শুধু গাছই ছেল। খুড়োমশাইর বাপ কত গাছ সাবাড় করে লোকজন বসায়। ওই লাউ মাচার নীচি রোজ সন্ধ্যেবেল বাঘ এসে বসি থাকত। পুকুর দেখিছেন—ওর ভিতর থিকি ওই ঘরের সামনে গাছের গুঁড়ি বেইরেছে—আঁধারের চেয়েও কালো।'

'বাঘ লোক খেত না?'

'খেত। তবে আমাদের কাউকি খায়নি। খুড়োমশায়ের বাপের জন্যি—'

এক গাল কামানো হয়ে গেছে ক্ষীরোদের। এমন সময় গাঁয়ের চৌকিদার এল। খালি গায়ে লুঙ্গির ওপর পেতলের তকমা বেলটে ঝুলছে। চেঁচিয়ে বলে গেল, দশদিনের ভেতর 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' শ্রেণীর রেশন কার্ডের জন্য নাম লেখাতে হবে।

নীলাম্বর বুড়োকে দেখিয়ে বলল, 'খুড়ো মশায়ের বিয়ের পর রেল লাইন বসিছে ইদিকে। ওনাদের খুড়োর বাপ বড় তেজি ছেলেন। বাঘ টাঘ তারি সমঝে চলত—'

ক্ষীরোদ পরামাণিকের হাত থেকে মুখখানা বাইরে এনে নীলাম্বরের খুড়োর দিকে তাকাল। বুড়ো খুড়ো এবারে সব ভেঙ্গে বলল, 'আমাদের খুড়ো মশায়ের বাপের লেজ ছেল—'

নীলাম্বর বলল, 'হ্যাঁ, সত্যি ছেল। তিনি এ গাছ থিকি ও গাছে লাফাতি পারতেন—নিজিরই শোরের খোয়াড় ছেল। পাকাবাড়ির মেঝেয় চড় মেরে দাওয়া ফাটিয়ে দেতেন। শেষ বয়সে দাঁত পড়ে যাওয়ায় কড়া চাপানোই থাকত। আধপোড়া শোরের মাংস গিলি গিলি খেতেন!

—লাউ মাচার নীচে একবার এক বাঘ এসি ওনার হাতে প্রাণটা দেলে।' এক মুগুরের ঘায়ে বাঘের মাথা ফাঁক—'

'কতদিন বেঁচে ছিলেন—'

'লোকে বলে দু'শো বছর—তবে অত নয়' –একটু থেমে নীলাম্বর বলল, 'তিনি কবে মরলেন কেউ তা দেখেনি।'

'মানে?'

'শেষ বয়সে নাকি একা একাই করাতি নদী পার হয়ে সোঁদরবনের দিকে হেঁটে চলে গেছেন—আর ফেরেননি।'

নীলাম্বরের খুড়ো বলল, 'আমরা তখন ছোট। লোলাম্বরের বাপ ওই তেঁতুল গাছের একখানা বড় ডাল কেটে গুছিয়ে রেখিছে। খুড়ো মশায়ের বাপের শরীরটা হেলে গেছে কিছুকাল। মরলিই লাস চিতেয় দিতে হবে। ছেলে পেলে মাগ কবে কাবার হয়ে গেছে। মুয়ে আগুন দেবার জন্যি আমরা নাতিরা টিঁকে আছি—একদিন সকালে উঠি দেখি আর নেই। দুপুরের দিকি দূর গাঁয়ের রাখালরা খবরটা দেলে, পোড়ো গায়েনকে তারা ডোঙ্গায় চাপি সোঁদরবনের খাল ধরি এগুতে দেখিছে—সেই শেষ খবর।'

একটা ডাব কেটে নীলাম্বর ক্ষীরোদের হাতে তুলে দিল, 'এই আমাগে অগড়ের তেঁতুলগাছ। খুড়ো মশায়দের খুড়োর বাপ ছাড়া সবাই ও গাছের ডালে পুড়িছে। আমার মেজদি পুড়িছে, শৈলাদি পুড়িছে—আজকাল পাখিরা আর বসে না, আগে ঝাঁক ধরে ওই তেঁতুল ঠুকরে তলায় ঢলে পড়ি থাকত।'

যাকে নিয়ে এত কথা, ক্ষীরোদ দেখল, এমন বাতাসে মগডালে তার কিছু পাতা শুধু কাঁপছে। ঘন সবুজের মাঝে মাঝে পুরনো কালো গা থম্ মেরে দাঁড়িয়ে। ধানকাটা মাঠে নীলাম্বরের বড় ছেলে লাঙ্গল দিচ্ছে। কড়াই বুনবে। দূর রাস্তা দিয়ে বাস যাচ্ছে, গাছপালা বলে দেখা গেল না,

ক্ষীরোদ শব্দ শুনতে পেয়ে উঠে দাঁড়াল, 'এমন অমঙ্গুলে গাছ রেখে কি করবে গায়েন—যদি দিতে, নিয়ে যেতাম'—কথাটা গোড়াতেই এর চেয়ে আর খোলসা করে বলা যায় না।

'এত বড় গাছ কি প্রকারে নেবেন'—কিছু অবাক হয়েছে নীলাম্বর খুড়ো, 'আমার এই বয়সে কত ঝড় দেখলাম ওকে নিতে এল—নড়াতিই পারলো না।'

'লোকজন এসে নিয়ে যাবে। দশটা কুড়োল লাগালেই ভাগে ভাগে মাটিতে শুয়ে পড়বে। নায্য দর যা তাই দেব।'

'আপনি কেটে নে যাবেন ?' খুড়োর মাঝখান থেকেই নীলাম্বর জানতে চাইল, 'দর কী রকম—'

'বাজার যা তাই—একটা পয়সাও ঠকাবো না। তবে গাছও কতকালের দেখতে হবে—ওতে কি আর কিছু আছে !' এ কথাটা একেবারে মিথ্যে—কেননা, অমন কাঠে কিছু না থাকলে কোথায় আছে—তাই ক্ষীরোদের গলা একটু কেঁপে গেল।

'আপনার কী কাজে লাগবে ?'

'বিশেষ কোন কাজে নয়—তবে, আপত্তি না থাকলে চেরাই করে নিমতলার গোলায় পাঠিয়ে দিতাম'—ক্ষীরোদের চোখের সামনে এখন দশ হাজার ইজিচেয়ার, পঞ্চাশ হাজার পিলসুজ, এক লক্ষ পিঁড়ি নাচছে।

নীলাম্বর গাছটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পরামাণিক উঠোন পেরিয়ে গেল। বুড়ো খুড়ো বলল, 'লোলাম্বর হয়নি। বিদ্যেধরীর বুক বেয়ে আমাদের খুড়ো মশায়ের বাপ কোণাকুণি পাড়ি দেতেন রেতের বেলা—তখন জোচ্ছনায় এ গাছের পেল্লয় ভরি আঁধারের দিকে চেয়ে পাড়ে ফিরি আসতেন।'

হাতের একখানা পাকানো কাগজ কথা বলতে বলতে সোজা করে ধরল, 'এই যে চৌকো ঘর দেখিছেন—এগুলো বাড়ি, এই যে রেখার মাথায় চিকে দেওয়া ছবি—এ হল বৃক্ষ—এই আমাদের তেঁতুলগাছ—'

'সেটেলমেণ্ট ম্যাপ ?'

'উনত্রিশ সনের—তখনকার সেটেলমেণ্ট সাহেবের সই দেখিছেন

নীচি,' বলতে বলতে খুড়ো ধান কাটা মাঠে শুকনো বাবলার ঝাড়টা আঙুল দিয়ে দেখাল, 'সোত্ কম বলে ওইখেনটায় সাহেবের বোট বাঁধা থাকতো—তিনিই আমাগে খুড়ো মশায়ের বাপের ছবি তোলেন। কত টাকা দিতি চাইল সাহেব—পোড়ো গায়েন তবু তার লেজ দেখায়নি—'

'এমনিতে পোড়ো গায়েন রাতবিরেতে রাস্তা পার হত হেসে খেলে—দিনি দিনি কিন্তু রোদ বাড়লিই কানা, ছায়া বেছে নে বসি পড়ত ওই তেঁতুল তলায় পিঁপড়ে কামড়ালি ধরতি পারত না। ঝাঁক ধরি কামড়ালি তবে উঠে গে তেঁতুল গাছে গা ঘষত—তখন শুকনো ছালবাকল খসি পড়ত। বৃক্ষের আচুল জায়গায় কী মোলায়েম করে হাত বুলে দেত পোড়ো গায়েন তখন।'

ম্যাপখানা মেলে ধরল ক্ষীরোদের চোখের সামনে, 'কেমন চওড়া নদী ছেল দেখিছেন', বুড়ো ম্যাপের ওপরে একটা চ্যাটালো ড্রেনের গা দিয়ে আঙুল টেনে আনল। ক্ষীরোদ ধানকাটা মাঠে তাকিয়ে ফেলেছে। ঢলা রোদের আলো কাৎ হয়ে পড়ে। ন্যাড়া মাঠের এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে গরুর ছোট ছোট ছায়া। তার ভেতর দিয়ে নীলাম্বর হেঁটে আসছে। পেছনে জনা পাঁচেক লোক ; তাদের দু'জনের কাঁধে দু'টো কুড়োল।

বুড়ো বলছিল, 'এই পেল্লয় নদী সাঁতরে পোড়ো গায়েন পান্তার সঙ্গে ওই তেঁতুল জল খেয়ি ঘুম লাগাতো। বেলাবেলি উঠতি চরের মাটিতে গর্ত করে ধান গুঁজে দেত, তখন ত আর লাঙ্গল চলতো না। দু' হাত শেকড়বাকড়—'

লোকজন সুদ্ধ নীলাম্বরকে ঢুকতে দেখে বুড়োর কথা কেঁপে গেল—

'ও তুমি দর ঠিক করে ফেল ক্ষীরোদবাবু—এ গাছ আমরা রাখব না—'

নীলাম্বরকে থামিয়ে দিল বুড়ো, 'বেচে-দিবি ? আমায় পোড়াবি কি দিয়ে—'

'সে আরও গাছ আছে। বাবলাগুলো কি হবে ?'

'তা' বলে পোড়ো গায়েনের তেঁতুলতলা থাকবে না—অমন ছায়া রোদ এসে হাট করে দেবে ?'

'তা দিক্ খুড়ো। এবার তো ধানের হালচাল দেখি মাথা ঘোরে। শ্রাবণ ভাদ্রে টান ধরলি এতগুলো পেট তো আর তেঁতুল গিলে চলবে না—এবার দাঁড়ানো লোকগুলোকে ধমকালো নীলাম্বর, 'নে নে তোরা হাত লাগা—কোথায় কোপাবে দেখে দাও—'।

'দর ঠিক হোক্।'

'বেশি কথা কয়ে কাজ কি? না হোক্ তিনশো বছরের গাছ'হবে—তিনশোটা টাকা দিয়ো—'

এতক্ষণে খুড়োর মুখে কথা এল, 'আমার ভাগ আমি বেচবো না—'

'বাগড়া দিয়ো না খুড়ো—আটকুড়ো লোক তুমি, আমরাই তোমাকে দেখব—এতকাল দেখিনি?'

নীলাম্বরের কথায় কান দিল না, 'আমার স' পাঁচ অংশ—ও আমি বেচব না।'

নীলাম্বর গোঁজ খেয়ে দাঁড়ালো। পেটের খোঁদল বাতাসে ভরে গেছে। মাঠময় গরু ফিরছে—শুকনো ধুলোয় মাটির ওপরের আধ হাত ধোঁয়া হয়ে গেছে। নীলাম্বরের বড় ছেলের বৌ হবে, একগলা ঘোমটা দিয়ে ক্ষীরোদের জন্যে ভাতের থালা নিয়ে দাঁড়ানো।

'তোমার অংশের গুষ্টি মারি। এ সোঁদরবনের গাছ—যে নেয় তার। নে নে তোরা হাত লাগা এইবেলা—।' এবার কিন্তু পাঁচজন নয়—লোক-গুলোর মোটে একজন কুড়োল কাঁধে উঠে দাঁড়ালো।

'পোড়ো গায়েন ফিরে এলি কি দেখাবি লোলাম্বর?' গলা ঘড়ঘড় হয়ে উঠতে একদলা কাশি ফেলে দিল খুড়ো।

'তিনখানা একশো টাকার নোট? তোমার পোড়ো গায়েন আর ফিরবে নি!' কী খেয়াল হতে নীলাম্বর হেসে উঠল, 'কোন পথ দে আসবে শুনি? আড়াইশো তিনশো বছরের বুড়ো তো হেঁটে আসতে পারবে নি। নৌকোয় আসবে করাতি, বিদ্যেধরীর বুক শুকিয়ে কাঠ!'

এ সব কথার ভেতর দিয়ে বুড়ো শুধু বলল, 'ঠিক ফিরে আসবে রে। সে বেলা ছুষিসনে।'

কথাটায় কী ছিল। তেঁতুল গাছটার সামনেই জুৎসই একখানা হাওয়া

চৌদিকের অনেকটা ধুলো হুস্ করে শূন্যে তুলে দিয়েই ফেলে দিল। সংগে সংগে কয়েকটা বড় তেঁতুল শব্দ করে তলায় পড়ল। দাঁড়ানো লোকটা কাঁধ থেকে কুড়োল নামিয়ে ফেলেছে। সবার সঙ্গে ক্ষীরোদও গাছতলায় তাকালো। পরিস্কার জায়গাটুকুর ওপর খানিক ঢলা-রোদ চৌকো হয়ে পড়ে। তার বাইরেরটা পাতলা অন্ধকার। সেখানে গাছটা দাঁড়ানো। এতগুলো লোকের সামনে গুঁড়ি থেকে একটা কালো জিনিস নেমে এল—রোদে পড়তেই সবার আগে নীলাম্বর হেসে উঠল, 'খড়িচোচ্!'

বেশ লম্বা। সাপটা তেঁতুলগুলোর ওপর দিয়ে—রোদের বাইরে নেমে এল। অবেলায় আর ভাত খেতে পারল না ক্ষীরোদ। থালা ঘেঁটে ঠেসে জল খেয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আঁচানোর জন্যেই পুকুরে যাচ্ছিল। এমন সময় নীলাম্বর বলল, 'মেয়েরা মাছ ধুতে পুকুরে নামলিই ছ'টো এসে জ্বালাত রোজ। একটাকে কোঁচে গেঁথি ফেলিছি।—এইটে তাহলে গাছে উঠে বসেছেল।'

উঠোনের কোণে দাঁড়িয়ে মুখ ধুয়ে নিল ক্ষীরোদ। খুড়ো-ভাইপোর এখন যা অবস্থা তাতে গাছের দর নিয়ে একটু চাপ দিলেই নীলাম্বর আড়াইশো কী স'তুশোর রফা করে নিত। যোগাড়যন্তর করে ডেকে আনা পাঁচ পাঁচটা লোক কুড়োলসুদ্ধ উঠোন ছেড়ে মাঠে নেমেছে। ক্যাচকোচ করতে করতে ধানবোঝাই একটা গো-গাড়ি এসে হাজির হল। সামনের গোয়ালে বোরা ধোঁয়া দিচ্ছে, মশার ঝাঁক সেখান থেকে বেরিয়ে উঠোনের মাথায় এক জায়গায় চাক বেঁধে উড়তে আরম্ভ করেছে। আজ আর গাছ কাটার কথা ভাবাই যায় না। ক্ষীরোদ ধুলো ঝেড়ে পাম্পস্যুতে পা গলালো। সন্ধ্যের আগের বাতাসে গেয়োবনের নরম ডাল পালা মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। ধান মাড়ানোর বলদটার পাঁক খাওয়া থামেনি—খুঁটি আলগা দেখে নীলাম্বর উঠে গিয়ে এঁটে দিল।

'এখন যাবেন কি? আমরা পোড়ো গায়েনের বাড়ির লোক, জেনেশুনে আপনাকে ছাড়তি পারিনে—' বলতে বলতে নীলাম্বরের কাকা এগিয়ে এল। কালচে অন্ধকারে বুড়ো উঠোনে—ওপারের দাওয়ায়

ক্ষীরোদ। খুড়ো প্রায় লুফে ধরে ফেলল তাকে। জামার নীচের ফতুয়ার ঘড়ি-পকেটে সাড়ে তিনশো টাকা গজ গজ করছে। খুড়োর মুখ দেখে ভাল বোধ হল না ক্ষীরোদের। এই গাছ, পোড়ো গায়েনের ফেলে যাওয়া বিদ্যেধরীর শুকনো বাদা, চাকা খোলা গরুর গাড়ির ধড়—এখান থেকে বৌববাজার-শেয়ালদার কাঠগোলায় কোনদিন ফেরা যাবে না আর। খানিক আগে তবু কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর দূর রাস্তায় বাসের হর্ন, ঘড় ঘড় আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। এইমাত্র পোড়ো গায়েন এক চড়ে সব শব্দ বন্ধ করে দিয়েছে। বাদার মাথায় পোকায় কাটা আধখানা চাঁদ উঠতেই নীলাম্বর তার খুড়োকে বোঝানো ছেড়ে দিল। এতক্ষণ কত রকমে পথে আনার চেষ্টা চলছিল ক্ষীরোদের সামনে। তিনশো টাকার মধ্যে কী বাবদ কত যাবে তার ফিরিস্তিও দিচ্ছিল নীলাম্বর। খুড়ো উল্টো দাওয়ায় ভোম্ মেরে বসে। হ্যাঁ না কিছুই বলে না। ধরা-জ্যোৎস্নায় ক্ষীরোদ শুধু পাঁচ হাত ছায়াটাকে উঠোনময় চক্কর খেতে দেখল। এতক্ষণে বাদার গর্ত থেকে লাল কাঁকড়ার কোটি ছানা বাইরের ঠাণ্ডায় উঠে এসেছে।

'তবে খুড়ো খতেন দেখাও—কার কত অংশ বুঝে নেব।'

খুড়ো দাওয়া ছেড়ে রাগে রাগে উঁচু ঘরটায় ঢুকলো, 'লম্ফ নে এসে দেখে যা—মালিক খতেনে আমার স'পাঁচ আনা অংশ—তোর বোন শৈলর ছেলেপেলেরা ভাগ বসালি ও গাছে তোর দু'আনাই নেই—'

গুলতিতে টান দিলেও এত জোরে গুরুল ছুটে যায় না। নীলাম্বর মাথায় ঠোক্কর খেতে খেতে অন্ধকার ঘরে ঢুকে গেল। তারপর খুড়োর কয়েকটা কথা বাইরের দাওয়া অব্দি পৌঁছে শুধু একটা লম্বা চীৎকার হয়ে গেল শেষে। তাও বেশিক্ষণ থাকল না। মেহগনির প্রথম পালিশেও গন্ধ উঠেই এমন উবে যায়। খুব ভারি নিঃশ্বাসে ঘরের অন্ধকার মাড়াই হচ্ছে প্রায়। কয়লা খেগো পুরনো লোকাল ইঞ্জিনটা ভোরের ট্রেন টেনে বাসুলিডাঙ্গা এসে মাড়ি, দাঁত সব টলে ফেলে নীল ধোঁয়াটে নিঃশ্বাস ফেলছিল আজ সকালে।

পাম্পসু ক্ষীরোদের পায়েই ছিল। নদীর ফেলে যাওয়া মাটি। শেষবারের মত জল চুয়ে নিয়ে পাথর হয়ে আছে। জুতো জোড়া বগলে হয়েছে অনেকক্ষণ। পায়ের নীচে কড়া ফেড়ে যাচ্ছে—তবু না

দৌড়ে নিস্তার নেই। রশি দশেক দূরের বাবলার ঝাড়টা পেরোবার সময় এমন একটানা মাঠে এক পোচড়া ভুষোকালির চেয়ে বেশি কিছু লাগল না তার। ওই জায়গাটায় সেটেলমেণ্ট সাহেবের বোট বাঁধা থাকত। ফাঁকা দেখে চাঁদ অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে। দৌড়োনের ঝোঁকে একবার নীলাম্বরের গলা হাঁকড়ানি পেছু-ডাক ছুটে আসছে বুঝতে পেরেছিল। ল্যাজা দিয়ে পুরো একটা মানুষ সাইজে আনে কী করে। এখন দেখে শুনে পথ ঠিক করে নিতে হবে। ওই তো রূপশাল ধানের মাঠ। বোধহয় তাই। সবই একরকম লাগছে। উপরে তাকাতে ক্ষীরোদ চাঁদের কিছু উনিশবিশ বুঝতে পারল না। পোকা এবার ধানের দফা শেষ করেছে। বর্ষার মুখে মুখে আরও কম টাকা নিয়ে নীলাম্বরের উঠোনে এসে দাঁড়ালে ভাইপো সুদ্ধ বুড়ো খুড়ো আজ এই সন্ধ্যের পরেও টিকে থাকলে কাঁধে কুড়োল নেবে ঠিক। মগডালের রসালো কাঠে-হলুদ রঙের পিঁড়ি বানিয়ে ক্ষীরোদ তখন রথের মেলা ছয়লাপ করে ছাড়বে।

হঠাৎ মাঠ নাবি নিতে থমকে দাঁড়াল। এ যে নেবেই যাচ্ছে। বাদা জুড়ে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠল, বিদ্যেধরী শুকোতে শুকোতে করাতি মুছে গেছে। বর্ষার জল দাঁড়ালে বেরোতে চায় না। সেই বাদা ডিঙ্গিয়ে পোড়ো গায়েনকে নাকি ফিরতে দেখেছে নীলাম্বরের বড় ছেলে। যত্ত তেড়েল গেঁজেল।

উল্টে পড়ল ক্ষীরোদ! পা ঠিক জায়গায় রাখতে পারেনি। পাম্পসু কুড়িয়ে উঠতে গিয়ে বসে পড়ল। করাতি-বিদ্যেধরীর শুকনো জল হু হু করে ফিরে আসছে। রূপো রঙের। পড়ি মরি উঠতে গেল। হাঁটুর কল কব্জায় জং ধরে আছে কতদিন। পাম্পসু পড়ে গেল হাত থেকে। হামা টানার কায়দায় বুক ভরে দম নিয়ে ছিটকে বেরোবার চেষ্টা করল ক্ষীরোদ। দৌড় ত দূরের কথা—দাঁড়ানোর মত এমন চেনা জিনিসটাই কিছুতে হল না। হচ্ছে না। হাঁটুই খোলে না। যখন এখানে এভাবে থাকতেই হবে—তখন আর পাম্পসু খুঁজে লাভ নেই বুঝে যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই ক্ষীরোদ একটুও না নড়ে বসে গেল। কোথাও অন্ধকারের ছিটেফোঁটাও নেই। বাদা ভর্তি জ্যোৎস্না। ডোঙায় চড়ে পোড়ো গায়েন ইচ্ছে করলেই ফিরতে পারে এখন।

# ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন

**মতি নন্দী**

মাঘের দুপুরে, যদি, তকতকে ঘাসে পা দিয়েই মৃদু তাপ লাগে, পোড়া পেট্রোলের গন্ধ আসে, একটি কি দুটি লোক বিরাট মাঠটা একাকী পার হতে থাকে, উপুর হয়ে পুকুর ধারে কেউ ঘুমোয় এবং হঠাৎ শঙ্খচিলের ডাক শোনা যায়—তখন ইচ্ছা করে 'এবার একটু বসা যাক।' বিনোদ গড়ের মাঠের দিকে মুখ করা বেঞ্চটা দেখিয়ে বলল।

'হ্যাঁ অনেক হেঁটেছি।' বলেই কমলা আগে গিয়ে বসল। সিঁথিতে কপালে, দগদগে তেল-সিঁদুর। খোকা এবার স্কুল ফাইনাল দেবে। তার জন্য কালীঘাটে পুজো দিতে কলকাতায় আসা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকেই যাদুঘর পর্যন্ত সবাই হেঁটে গেছে। এবার মনুমেণ্ট দেখার কথা। সীতা আঙুল দিয়ে পীতু-নীতুকে তা দেখিয়ে দিল 'ওই যে।'

একজন ফিসফিস করে বলল, 'আমরা ওর কাছে যাবনা?'

'এখান থেকেই তো দেখা যাচ্ছে।'

ওরা দুজন আর কথা বলে নি। মুখ ফিরিয়ে বসে রাস্তায় গাড়ি চলাচল দেখতে লাগল। কিছুদূরে গাছের ছায়ায় একজোড়া ছেলে-মেয়ে গল্প করছে আর মেয়েটি খুব হাসছে। সীতা তাদের দিকে মুখ করে বসল। কমলা ঠেস দিয়ে মুখটা আকাশমুখো করে চোখ বন্ধ করে রইল। তার সারা অঙ্গে ক্লান্তি। খোকা একটু অধৈর্য হয়েই বলল, 'কতক্ষণ বসবে?'

বিনোদ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাবোই বা কোথায়?'

খোকা উঠে দাঁড়াল। পকেটে হাত ভরে কয়েক পা এগিয়ে একটা ভাঁড়কে লাথি মারল। সেটা ভেঙে যেতে আর কোনো কাজ না পেয়ে মাঠের মধ্যে এগিয়ে গেল।

খোকার থুতনিতে কেশ দেখা দিয়েছে, কণ্ঠস্বরে কর্কশতা এসেছে। দুই পায়ে ঘনরোম। বাহুর পেশী আকৃতি নিচ্ছে। এবার প্রথম একটা বড়ো

পরীক্ষায় বসবে। এখন ও কি রকম বোধ করছে, সেইটা জানতে বিনোদের সাধ হল। তাই সেও উঠে পায়চারী করতে করতে খোকার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

'তোর মা বড্ড হাঁপিয়ে পড়েছে, একটু জিরোক। তুই বোসনা, সকাল থেকে তো বোসতে দেখলুম না।'

খোকা কথাটা গায়ে মাখলো না। দূরে রাস্তার ওপারে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে, একদল মেয়েপুরুষ, বিনোদের মনে হল তারা বেহারী, এমন ভাবে বাসে উঠল যেন স্টেশনে এক মিনিটের জন্য থামা ট্রেনে উঠছে। বাস ছাড়ার পর দেখা গেল একজন চেঁচিয়ে বাসের পিছনে ছুটতে শুরু করছে। বিনোদের ভারি হাসি পেল।

'খোকা দেখলি না, একটা ব্যাপার।'

ঘটনাটা বিনোদ বলল। খোকা প্রয়োজনমতে হেসে খেলার দিকে মুখ ফেরাল। বিনোদও সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শ্রান্ত বোধ করতে শুরু করল। তার ইচ্ছে হল ঘাসে পা ছড়িয়ে বসতে।

'কলকাতাতেই খেলার সুবিধে, কত ক্লাব।' খোকা স্বগতোক্তির মতো করে বললেও বিনোদ জবাব দিল, 'আমাদের ছেলে বেলায় এত কিছু ছিল না। ঘোষেদের মস্ত উঠোন ছিল, সেখানে ব্যাডমিণ্টন থেকে শুরু করে সব খেলা হত। পাড়ার বাইরে যাওয়ার দরকারই হত না।'

খোকা শুনছিল, হঠাৎ খেলার মাঠ থেকে চীৎকার উঠল। একজন আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছে। আউটের পদ্ধতিটা দেখতে পায় নি তাই বিরক্ত হয়ে খোকা বলল, 'তুমি বরং ওদের কাছে গিয়ে বোসো।'

বিনোদ অপ্রতিভ বোধ করল। কথা না বলে গুটিগুটি ফিরে এল।

পীতু ফিসফিস করে সীতাকে জিজ্ঞাসা করল, 'দিদি, এবার আমরা কি দেখতে যাব?'

'চিড়িয়াখানা?' নীতু বলল।

'জানি না, বাবাকে জিগ্যেস কর।' সীতার হাই উঠছে। ছেলেমেয়ে দুটো খালি কথাই বলে যাচ্ছে। দেখে দেখে আর দেখতে ভাল লাগছে না।

'চিড়িয়াখানা আরো সকালে যেতে হয়।' বিনোদ উত্তরটা দিয়ে দিল।

কিন্তু ছেলেছুটির মুখ দেখে তার মায়া হল। বলল. 'অন্য কোথাও অবশ্য যাওয়া যায়।'

'সিনেমা?' সীতা চট্ করে বলল।

'এখন শো আরম্ভ হয়ে গেছে। তাছাড়া এখানে ইংরিজি বই দেখায়।'

বিনোদ মুখ ফিরিয়ে নিল, যাতে সীতা প্রসঙ্গটা টানতে না পারে। খোকাকে দেখতে পেল সে। একটা ঢিল কুড়িয়ে সামনে জোরে ছুঁড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে এদিকেই তাকাল। ও যেন প্রস্তুত ঘোড়ার মত ছটফট করছে। শুধু গন্তব্যটা জানতে পারলেই হয়।

পীতু ফিসফিস করে বলল, 'আমরা কি এবার বাড়ি ফিরব?'

বিনোদ উঠে দাঁড়াল।

'চল্, একটা জিনিস দেখাব।'

ওরা তাকাল।

'আমাদের বাড়ি দেখাব, খোকাকে ডাক।'

কমলা কথা বলে নি এতক্ষণ। এবার বলল, 'কোন্ বাড়ি? যেটা ছিল?'

কথা না বলে বিনোদ বাস স্টপের দিকে এগিয়ে গেল।

'ও-ছাই দেখে কি লাভ। তার চেয়ে আর-একটু বসে থাকলেই হোত।'

গজগজ করে কমলা উঠে দাঁড়াল। পীতু ছুটে গেছে খোকাকে ডাকতে। সীতা বলল, 'সেদিন মেট্রোয় সিনেমা দেখে গেছে বি-ডি-ও'র বড়ো মেয়ে।' বাস স্টপে দাঁড়িয়ে খোকা বলল, 'এসব ক্লাবে আমিও খেলতে পারি।'

বাসে ওঠা পর্যন্ত বিনোদ কারুর দিকে তাকাল না। এখনো অফিস ছুটির ভীড় আসে নি। বিনোদ বাসে জানালার ধারে বসল। ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বাসটা চলেছে। ঢুলুনি লাগছে। সে যে কত ক্লান্ত এইবার টের পেল। আরাম পাবার জন্য চোখ বুঁজল। মাঝে মাঝে খুলে দেখে একটা ছুটো গাছ, একটু ঘাস-মাটি, জমাট বাঁধা-ধূসর বাড়ি। কানে বাজছে বাসের ঘন্টি, এঞ্জিনের শব্দ আর অনবরত প্রবল এক সাঁইসাঁই ধ্বনি। বিনোদ ভিতরে ভিতরে ভার বোধ করতে শুরু করল, যেন দমে যাচ্ছে।

'জানলা দিয়ে মুখ বার কোরো না, পীতু নীতু।'

কমলার গলা শোনা গেল। চোখ খুলে বিনোদ দেখল সামনের লোকটি ঘাড় হেঁট করে কি যেন পড়ছে। পাশেরজন জর্দা-পান চিবোতে চিবোতে শূন্য চোখে সামনে তাকিয়ে। ব্যস্ত হয়ে একজন উঠে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আর-একজন সেখানে বসল। বাইরে ট্র্যাফিকের লাল আলোটা জ্বলজ্বল করছে। স্থির বাসটার গোটাদেহ এঞ্জিনের ধ্বকধ্বকানির সঙ্গে কাঁপছে। বিনোদের মনে হল, সপরিবারে কোথায় চেঞ্জে চলেছে। স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে। যাত্রীদের ওঠা-নামা চলেছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়াতেই কয়লার গুঁড়ো চোখে পড়ল। মা বললেন, 'বারণ করেছিলুম জানলা দিয়ে মুখ বার করিস না। আঁচলটাকে সলতের মতো পাকিয়ে চোখের মধ্যে অনেক খুঁজলেন, ফুঁ দিলেন। শেষে কাপড় দলা করে মুখে চেপে ভাপ দিয়ে চোখে চেপে ধরলেন। মা জর্দা খেতেন। গন্ধটা তখন সুন্দর লাগছিল!

'তোর মেজোকাকার চোখে একবার কয়লার গুঁড়ো পড়ে, সেকি কাণ্ড।' এই বলে জানলার কাঁচ নামিয়ে দিয়ে মা হেসে বললেন, 'আর ভয় নেই।' তারপর একটা পান মুখে দিয়ে পাশে বসলেন। আমরা দুজনে একই জানলা দিয়ে দৃশ্য দেখতে লাগলাম। পিচ ফেলার জন্য মা একবার কাঁচটা তুলেছিলেন। বাবা চুরুট মুখে একটা ইংরিজি বই কখন থেকে পড়েই চলেছেন। মা ফিসফিস করে বললেন, নন্তু, তোর বাবাকে বলনা, বই রেখে এখানে এসে বসতে।' বাবাকে বলতেই হেসে কেমন করে যেন মার দিকে তাকালেন। মা ঘোমটা বাড়িয়ে চোখ সরিয়ে নিলেন। তারপর তিনজনে সেই কাঁচতোলা জানলাটি দিয়ে বাইরের গাছ, চাষী, কুঁড়েঘর, মেঠোপথ আর পথিকদের দেখতে লাগলাম। এইভাবেই একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম মা'র কোলে। অন্ধকারে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে স্টেশনে নামলাম। ওয়েটিং রুমে মা মাথা মুছিয়ে দিয়ে চা খেতে চাইলেন। বাবা বাইরে বেরিয়ে চা আনলেন। আমিও খেলাম। বাবা বললেন, 'নন্তু, আর-একটা জিনিস দেখাব, কখনো দেখিস নি।'

প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এলেন। কি অন্ধকার চারিদিক। বাবার চশমার কাঁচে

বৃষ্টির জল লেগেছে। স্টেশনের ফিকে আলোয় তা জ্বলজ্বল করে উঠল।

'তাকা সামনে।'

তাকালাম, গাঢ় অন্ধকার চোখের সামনে ওৎ পেতে। তাকিয়ে তাকিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেলাম।

'এবার উপর দিকে চোখ তোল্।'

তাই করলাম। চোখ তুলতেই হঠাৎ ঠকঠক করে কেঁপে গেলাম। সেই অন্ধকার এক জায়গায় শেষ হয়ে গেছে। সুতোর মতো আঁকা-বাঁকা ঘোলাটে আকাশ, সেই অন্ধকারের মাথায় চর ফেলেছে। অন্ধকারটা মনে হল ভেঙে পড়বে বুঝি। বাবা আঙুল তুলে বললেন, 'ওটা হচ্ছে পাহাড়। ওখানে ঝর্ণা আছে। আমরা একদিন দেখতে যাব।' গানের সুরের মতো করে বাবা কথা বলেছিলেন।

অবাক হয়ে ছেলেমেয়েরা তাকাল। আঙুল তুলে বিনোদ বলল, 'ওইটেই ছিল আমাদের বাড়ি।'

'কে আছে ওখানে?' নীতু জিজ্ঞাসা করল।

'লোকেরা থাকে।' সীতা বুঝিয়ে দিল। লোহার গেটের একটিমাত্র পাল্লা। দুপাশের আমগাছ দুটি ন্যাড়া। ফুলবাগানটায় পুরনো ড্রাম স্তূপ হয়ে রয়েছে। দোতলার বারান্দায় কাঠের পার্টিশান। রেলিঙে নানান ধরণের কাপড় শুকোচ্ছে। বাড়িটায় বহু বছর কলি হয় নি, কিন্তু দাগরাজি দেখা যাচ্ছে। ভাঙা পাইপ দিয়ে তিনতলা থেকে ছড়ছড় করে জল পড়ল। দোতলার কার্নিশে একটা বেড়াল মাথা বাঁকিয়ে কি চিবোচ্ছে, সম্ভবত চড়াই। সদর দরজা খোলা রয়েছে। রাস্তা থেকেই দেখা যায়, অনেকগুলি মেয়েমানুষ, বাসনমাজা, কাপড়-কাচার কাজ করছে। উঠোনে আগে জলের কল ছিল না। দোতলায় হঠাৎ চীৎকার করে কে খিস্তি করল।

'দোতলার ওই বারান্দার পেছনেই হলঘর। বাবা বসতেন।'

'বসে কি করত?' পীতু জানতে চাইল।

'গান হত, রিহার্সাল হত, পাড়ার পুজোর মিটিং হত। একতলার ওই ঘরটা ছিল মেজোকাকার সেরেস্তা। ছোটোকাকা মারা যেতে ওর বৈঠকখানাটা মেজোকাকা নেয়। তখন খুব মক্কেল হয়ে গেছে।'

বাড়ি থেকে একটা লোক ওদের লক্ষ্য করছিল। বিনোদ আঙুল দিয়ে নির্দিষ্ট করে দেখাচ্ছিল। তার দিকে আঙুল তুলতে দেখে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করল, 'কাকে খুঁজছেন?'

বলার ভঙ্গিতে বিনোদ হকচকাল। হঠাৎ পীতুই বলে ফেলল, 'আমাদের বাড়ি দেখতে এসেছি।'

ভ্রূ কুঁচকে লোকটি সপরিবার বিনোদকে দেখল। চোখেমুখে বিস্ময় ও অস্বস্তি ফোটাল। কিন্তু যখন বিনোদ বলল, 'এটা এককালে আমাদেরই বাড়ি ছিল', লোকটি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

'বেচে দিয়েছেন!'

বিনোদ ঘাড় নাড়ল।

'বেচবার আর লোক পেলেন না। খোঁয়াড় মশাই খোঁয়াড়। জানোয়ার হয়ে বাস করছি। এদিকে ভাড়া নেয় সত্তর টাকা করে।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে লোকটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। বিনোদ রেগে গেল। 'বেলে পাথরের উঠোন আর সিঁড়ি, মার্বেল পাথরের হলঘর, কত বড়ো বড়ো জানলা দেখেছিস, দক্ষিণমুখো?' খোকার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'এই বাড়িকে বলে কিনা খোঁয়াড়! এ রকম বাড়িতে বাস করছে ব্যাটার বাবার ভাগ্যি।'

কমলার দিকে সে তাকাল। আশ্চর্য, পিছন ফিরে কি যেন দেখছে। ধমকের মতো করে বিনোদ বলল, 'এদিকে দেখনা, ওই যে তিনতলায় খড়খড়ির জানলা, ওটা ঠাকুরঘর। ওর পিছনে ছাদ, দুটো ব্যাডমিণ্টন কোর্ট হয়ে যায়।'

এক বুড়ো কাশতে কাশতে জানলাটায় এসে দাঁড়াল। কমলা মুখ ফিরিয়ে নিল। নিচু স্বরে সীতাকে বলল, 'সকাল থেকেই ধকল চলেছে, আয় রকটায় বসি।'

'এভাবে, এখানে বোসো না।' বিনোদের কথায় কমলা তাড়াতাড়ি পা নামিয়ে নিল। কিন্তু উঠল না। এক বৃদ্ধ তখন যাচ্ছিল। বিনোদকে দেখে ইতস্তত করে কাছে এগিয়ে এল।

'হরিকা, আমি বিনোদ, নন্থ।'

'চিনতেই পাচ্ছিলুম না, চোখে তো আর ভাল দেখি না, তা তুমি যে বুড়িয়ে গেছ।'

'বয়স তো হচ্ছে।' বিনোদ হেসে বলল।

ফোকলা মুখে বুড়ো হাসল। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'একটা লোক ছিলেন বটে তোমার বাবা। কি অন্তঃকরণ! সারাজীবন শুধু দিয়েই গেলেন। একফোঁটা সাহায্যও কারুর কাছ থেকে নিলেন না। ভায়েদের মানুষ করলেন, তারা গাড়ি বাড়ি করল, আর তিনি?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ো চুপ করল। বুকটা ফুলে উঠে টসটস করছে বিনোদের। খোকার দিকে তাকাল। শুনে নিক্, হরিকাকে তো আর সে বলতে শিখিয়ে দেয় নি।

'এইটি আমার বড়োছেলে, এবার স্কুল ফাইনাল দেবে।'

বিনোদ আশা করেছিল খোকা প্রণাম করবে। হরিকা হাজার হোক ব্রাহ্মণ। কিন্তু খোকা ওর চোখ ইশারা অগ্রাহ্য করল।

'বেশ বেশ, বংশের মুখোজ্জ্বল কর বাবা। আমার ছোটো নাতি গতবার আই-এস-সি পাশ করল। তোমার মেজোকাকার ছেলে ঘুনুকে ধরে কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছি। লোক ভাল। পাড়ার সক্কলের কথা জিগ্যেস করল। তোমাদের কথাও। যাও না বলে দুঃখু করল।'

'বাবা কখনো কারো কাছে হাত পাতেন নি। সেই রক্ত আমার গায়েও তো আছে।'

'তা বটে, তা বটে।'

সীতা এসে বিনোদকে ফিসফিস করে বলল, 'মা বলছে, কখন ফিরবে?'

ফেরার সময় কমলা বলল, 'তোমার হরিকা রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথা বলল, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসাতে তো পারত।'

'অবস্থা তেমন ভাল নয়, নইলে কি আর বলত না। ওর বড়ো মেয়ের বিয়েতে সেকি কাণ্ড! পালঙ্ক দেওয়ার কথা ছিল, দিতে পারে নি। বরকে তো সভা থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল বরের বাপ। কান্নাকাটি পড়ে গেল। বাবা তখন জামিন থেকে নিজে দাঁড়িয়ে বিয়ে দেওয়ালেন। পরদিনই বরের বাপের হাতে চারশো টাকা গুণে গুণে দিলেন। বুঝে ছাখ, সে আমলের

চারশো টাকা মানে আজকের দেড় হাজার টাকা।'

এতক্ষণ পর খোকা মুখ খুলল, 'দিয়ে কি লাভটা হোল!'

শোনামাত্রই ঝিমঝিম করে উঠল বিনোদের মাথা। চুপ করে রইল সে। কিছুক্ষণ পরেই নিজেকে শুনিয়ে একবার শুধু বলল, 'ঘুনু আর আমি একই ক্লাশে পড়তুম।'

কেউ শোনার জন্য আগ্রহ দেখাল না। নীতু মার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠাণ্ডা লাগছে বলে পীতু কুঁকড়ে বসে। কিন্তু বাবার কাছে গল্প শোনার জন্য জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে। বিনোদ আর কথা বলে নি। স্টেশন থেকে রেললাইন ধরে প্রায় আধমাইল গিয়ে লোহা কারখানার পাশ দিয়ে গোপাল কুণ্ডু রোড। সেখান থেকে বিনোদের বাড়ির গলি তিন মিনিটের পথ। ওরা ট্রেন থেকে নামল তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে গেছে। দূরে সিগন্যালের লাল আলো জ্যাবড়া দেখাচ্ছে। রেললাইনের দুহাত উপরে কুয়াশা চাপ বেঁধে। ঘুমন্ত নীতুকে কোলে নিয়ে কমলা মন্থর হয়ে পড়েছে। পীতুর হাত ধরে বিনোদ স্লিপারে পা রেখে ধাপে ধাপে এগোতে লাগল।

খপ খপ আওয়াজ হচ্ছে সকলের পা ফেলার। পাথরে আঙুল ঠুকে সীতা একবার যন্ত্রণায় কাতরে উঠল। কমলা ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে। দেখে দেখে সবাই পা ফেলছে।

'প্রিন্সিপল থাকা দরকার, না হলে এলোমেলো হয়ে জীবন কাটে।' চাপা স্বরে বিনোদ বলল খোকাকে। 'বাবা একবার বলেছিলেন, তখন আমি খুব ছোটো। মেজোকাকার ভায়রা-ভাই যোগেন ঘোষ কর্পোরেশন ইলেকশ্যনে দাঁড়িয়েছিল। বাবার কাছে এলেন ভোট চাইতে। কুটুম বলে তো খুব আদর-যত্ন করে বসালেন। কিন্তু জানিয়েও দিলেন কংগ্রেস ছাড়া আর কাউকে ভোট দেবেন না। মেজোকাকাও অনেক করে বললেন কিন্তু বাবা অটল সারারাত ঘুমোলেন না, দোতলার বারান্দায় পায়চারী করলেন। পরদিন মেজোকাকা কোর্টে বেরোচ্ছেন তখন ডেকে বললেন, 'যোগেনবাবু নিজে এসেছিলেন, কুটুম, তার মর্যাদা আছে, সেটা রাখতেই হবে। ওকে জানিয়ে দিও আমি কাউকেই ভোট দেব না।'

একটানা গল্পটা করে বিনোদ প্রফুল্ল বোধ করল। খোকা মাথা নিচু

করে দেখে দেখে হাঁটছে। পিছন থেকে সীতা চেঁচিয়ে বলল, 'বাবা একটু দাঁড়াও, বড্ড এগিয়ে গেছ।'

কারখানার কাছে ওরা এসে পড়েছে। একটা পুরনো ঝাঁকড়া বটগাছের পাশ দিয়ে রাস্তাটা পুবে চলে গেছে। বিনোদ খোকাকে নিয়ে গাছটার নীচে দাঁড়াল। কমলার প্রায় এলিয়ে পড়ার দশা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তোমরা তো জিন লাগিয়ে ছুটছ। আমি ওদিকে ভয়ে মরি।'

সীতা বলল, 'ছ'টা পঁয়তাল্লিশের গাড়ি আসার সময় হয়েছে, মার খালি ভয় যদি আমারাও কাটা পড়ি।'

'না বাপু, গাড়িটাড়ি নিয়ে খেলা নয়। ও হচ্ছে নিয়তির মতো। হাত দেখালেও থামবে না পাশ কাটিয়েও যাবে না।'

কমলার বলার ভঙ্গিতে বিনোদের কৌতুক করার ইচ্ছা। সিগনালের রঙ সবুজ হয়ে রয়েছে। সে বলল, 'তাহলে একটু দাঁড়াও, তোমার নিয়তি আসছে তাকে দেখে যাও।'

'না, না, চলো। ঠাট্টা করতে হবে না।'

বিনোদ ওকে হাত ধরে টেনে রাখল। ছেলেমেয়েরা দেখছে; কমলা এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় দূরে এঞ্জিনের হুইসেল বাজল। সকলে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। গুমগুম শব্দ হচ্ছে। লাইনের উপরে পিছলে যাচ্ছে আলো। মাঠের মাঝে ইলেকট্রিকের লম্বা খুঁটির মাথা ঝকঝক করে উঠল। একটা শেয়াল ওদের কাছে দিয়ে ছুটে গেল।

'এসে গেছে, এসে গেছে।' বিনোদ কাঁপা গলায় অন্ধকারের মধ্যে বলল। ফিসফিস করে পীতু বলল, 'কি এসে গেছে বাবা?'

'নিয়তি।'

বিনোদ কয়েক পা এগিয়ে গেল। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া চাঙরের মতো হুড়দাড় করে ট্রেনটা এসে পড়েছে। বিনোদ দুহাত বাড়িয়ে শিশুর মতো কলধ্বনি দিয়ে লাইনের দিকে এগিয়ে গেল। কমলা ভয়ঙ্কর স্বরে চীৎকার করে উঠল। খোকা ছুটে গিয়ে বিনোদের কোমর জড়িয়ে ধরল। যখন, কামরাগুলোর আলো ওদের দেহ থেকে অদৃশ্য হল, মাটি স্থির হল, বাতাস শান্ত ভাবে বয়ে গেল, বটগাছের পাখিরা চীৎকার বন্ধ করল,

নক্ষত্রের মালিন্যও ঘুচল, তখন বিনোদ বলল, 'ভয় নেই রে, ও লাইন ধরে চলে। আমি ওর লাইনে যাচ্ছি না।'

কমলা ফুঁপিয়ে বলল, 'কবে তোমার পাগলামি থামবে?'

হা হা করে বিনোদ বলল, 'চলো, এবার যাওয়া যাক।'

বাড়ি পৌঁছে খোকা পড়তে বসল। আধাদামে কেনা গতকালের খবরের কাগজ নিয়ে বিনোদ ওর কাছে বসে পড়ছে আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে। খোকা কিছু একটা মনে করে রাখতে ভ্রূ কোঁচকাচ্ছে, থুতনিতে হাত রেখে ঠোঁট কামড়ে টেরিয়ে রয়েছে, হুবহু ওর ঠাকুরদার মতো। সারা মুখ এ সময় একটা দম্ভের মতো দেখায়। আত্মপ্রত্যয়ে কঠিন মনে হয়। বিনোদ মুগ্ধ চোখে খোকাকে দেখছিল। হঠাৎ তা খোকার নজরে পড়ল। কুঁকড়ে গেল সে।

'তোকে একটা কথা বলব, শুনবি?'

খোকা অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে রইল। ইতস্তত করে বিনোদ বলল, 'তোর ঠাকুরদার পর আর মান-সম্মানের মুখ দেখি নি। তুই আবার দেখা, পারবি না?'

কথাটা বোঝবার জন্য খোকা কিছু সময় নিল, ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে এল ওর মুখ। বিনোদ ঝুঁকে এগিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'মনের মধ্যে সদাসর্বদা বলবি বড়ো হবো। ফাঁকি দিবি না, ছোট কাজ করবি না, একবার নিচু হলে উঠে দাঁড়ানো ভারি শক্ত কাজ রে।'

ভয়ঙ্কর একটা ক্ষুধার্তের মতো সে অপেক্ষা করতে লাগল। খোকা অন্তত একবার মাথাটাও হেলাক। বা একছিটে হ্যাঁ বলুক।

সেই সময় ভিতরের ঘরে পীতু নাকী সুরে টেনে টেনে কান্না জুড়ল। বিনোদ বিরক্ত হয়ে গেল। ওর ক্রুদ্ধ মুখভাবে পীতু চুপ করল। সীতা দ্রুত বেরিয়ে গেল। নীতুও বেরোতে যাচ্ছিল, বিনোদ ওর কান ধরল। 'কাঁদছিস কেন, দাদা পড়ছে না ও ঘরে?'

সেই সময় পীতুও বলল, 'দিদি চপ খাচ্ছিল। ওকে দিয়েছে তবু আবার চাইছে।'

'পেল কোথায় তোর দিদি?' পীতু হঠাৎ চুপ করে গেল। সীতা

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। বিনোদ তাকে দুবার জিজ্ঞাসা করল। সীতা তবু চুপ। এবার কঠিন ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল, 'পয়সা পেলি কোথায়, কে এনে দিল ?'

'কেউ না।'

'তাহলে ?'

হঠাৎ পীতু বলল, 'সুশীলদা জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল্ল আমি দেখেছি।'

কিছুক্ষণ কেউই কথা বলল না, চোখের পাতাটুকু পর্যন্ত ফেলল না। তারপরই বিনোদের চড়ে সীতা ছিটকে পড়ল কমলার পিঠের উপর। লাথি মারতে যাচ্ছিল, কমলা তখন দুহাতে আগলে ধরে বলল, 'বিয়ের যুগ্যি মেয়ের গায়ে হাত তুলতে, লজ্জা করে না ?'

বিনোদ থরথর করে কাঁপছে, গলায় কথা আটকে গেছে। গলার স্বর দুমড়ে মুচরে কমলা বলল, 'বড়ো বংশের ছেলে, তা বস্তির লোকের মতো আচরণ কেন ?'

দিশেহারা হয়ে বিনোদ চার ধারে তাকাল। ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে খোকাকে বলল, 'সুশীলকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে ? এ সব কি ব্যাপার ?'

চোখ দুটো সরু করে বলল, 'কেন, কি করবে ?'

'ভেবেছে কি সে। বখামি করার জায়গা পায় নি ?'

'সুশীলদা আমায় সাজেশান এনে দেবে কলকাতা থেকে।'

'তাতে কি হয়েছে, তাই বলে—'

বিনোদের কণ্ঠস্বর মৃতের শেষ কম্পনের মতো। কেঁপে উঠে থেমে গেল। খোকার সারা মুখে যেন দম্ভ মাখানো। কঠিন দেখাচ্ছে। দাঁড়িয়েছে গোঁয়ারের মতো। বিনোদ চোখ নামিয়ে নিল। সন্তর্পণে খোকার পাশ কাটিয়ে বাইরে রকে এসে দাঁড়াল। একবার মুখ ফিরিয়ে ঘরের দিকে তাকাল যেন এইমাত্র তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জামা পরে খোকা হন হন করে ওর পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেল। তখন সে মনে মনে বলল, খোকা ফিরে আয়।

তারপর বিনোদ হাঁটতে শুরু করল। গলি ধরে সে ঘুরতে ঘুরতে চৌরাস্তায় পৌঁছল। তখন সিনেমা ভেঙ্গেছে। মানুষের ভীড় আর সাইকেল রিক্সার ভেঁপুতে বিরক্ত হয়ে কাছের গলিটায় ঢুকতে যাচ্ছে, দেখল চায়ের দোকানে সুশীল আড্ডা দিচ্ছে। সে থমকে দাঁড়াল। তখনই খোকা এসে ওর সামনে জুড়ে বলল, 'কেন এসেছ এখানে? আমি জানতুম তুমি আসবে। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে মান-সম্মান কথা ভেবে ভেবে।'

বিনোদ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। আমার ছেলে, আমারই ছেলে খোকা! ওকি ভাবছে আমি ইতর। মাথা নামিয়ে সে দ্রুত ভীড়ের মধ্যে মিশে যাবার জন্য লোকেদের ধাক্কা দিতে শুরু করল। ফুটবল মাঠের ওধারে রেললাইন। এধারে শিবমন্দির, বেশ্যাপাড়ার গলি, মিউনিসিপ্যালিটির দাঘি, বি-ডি-ও অফিস, তার পাশে ললিতের ঘর। রাস্তার ইলেকট্রিক আলো ঘরের দরজায় কোন ক্রমে আসে। খসখস শব্দ হচ্ছে। অন্ধকার ঘর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে ললিতের বুড়ো বাপ বেরিয়ে এল।

'কে?'

'আমি বিনোদ। রথতলার বিনোদ।'

বুড়ো আন্দাজে তাকাল। হাত দিয়ে মাটি থাবড়ে বলল, 'বসো। কি জন্যে।'

'এমনি।'

'অঃ।'

মাথায় টাক। মুখ ভর্তি দাড়ি। গায়ের চামড়া ভাঙা পাথরের মতো কর্কশ, কুঞ্চিত। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

'ছ'দিন হয়ে গেল। একাদশী থেকে আজ। সবাই বলল, একটু আগেই ছ'টার গাড়ির অনেকে ওখান দিয়েই হেঁটে গেছে, তখন কাউকে দেখি নি।'

বিনোদ টের পেল তার শীত করছে। এগিয়ে বুড়োর মুখোমুখি হয়ে বসল। ওর শরীর থেকে বন্য গন্ধ আসছে।

'আমাকে ওরা চলে যেতে বলেছে। নয়তো বার করে দেবে। ওরা এটা নিয়ে নেবে।'

'কোথায় যাবেন?'

আঙুল তুলে বুড়ো ফুটবল মাঠের ওপারে রেল লাইনের উদ্দেশ্যে দেখাল।

'কেন?' ফিসফিস করে বিনোদ বলল।

ও এমনভাবে মুখ তুলল যেন বিনোদের কথাটার অর্থ জানতে চায়। তারপর মাথা নাড়তে শুরু করল। ওর ঘন ভুরু, দাড়িতে ভরা মুখটা রাস্তার আলোয় বিক্ষত দেখাল।

'জানো, আমি আর কিছু বুঝতে পারি না, টের পাই না। গলির একটা মেয়ে কাল ভাত দিল, খেলুম, স্বাদ পেলুম না। লঙ্কা ঘষে আচার দিয়ে খেলুম, তবুও।' ছল ছল করে উঠল বুড়োর স্বর, 'কাল পেচ্ছাপ করে ফেললুম, তাতেই সারারাত শুয়ে রইলুম বুঝলে, আমার শীত করল না।'

বুড়ো হাতড়াতে লাগল। বিনোদ ডান হাতটা এগিয়ে দিতেই খপ করে ধরে কাছে টানতে লাগল। বিনোদ ঝুঁকে ওর বুকের কাছে মুখ এগিয়ে আনল।

'ছ'টা পঁয়তাল্লিশের গাড়িতে চলে গেল, আমাকে ফেলে। ও কি আমাকে ঘেন্না করত? আমি কথা বলতুম না।' বুড়োর স্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

'আজ কিছু খেয়েছেন?'

কথাটার অর্থ বুঝতে বুড়ো আবার মুখ তুলল।

'ও আমার কথা একদম ভাবলই না।' বুড়োর নীচের ঠোঁট ঝুলে পড়ল। বিনোদের মনে হল, চোখ দিয়ে জল নামছে। মুখ ভাল করে দেখার জন্য সে মুখটা বুড়োর মুখের কাছে আনল। মুখ দাড়িতে ভরা। বিনোদ বন্য গন্ধ পেল। আগাছা আর ঝোপ। গাছের পাতা ধূসর। খসখস শব্দে তিতির ছুটে গেল। দূর থেকে দূরের দিকে মহিষের গলায় বাঁধা ঘণ্টা বাজতে বাজতে চলে যাচ্ছে। উপরে বৃক্ষহীন মসৃণ ঢালু পাথরে পশ্চিম থেকে রোদ পড়েছে। বাবা বললেন, 'ঝর্ণা কোন্ দিকে বলোতো?'

মা চিবুক তুলে একটা দিক দেখালেন। বাবা হাসলেন, 'নন্তু, তুই বল্।'

বোকার মতো চারধারে তাকালাম। তখন বাবা বললেন, 'আয় আমরা খুঁজে বার করি, পারবি?' আমি মাথা নাড়লাম, বাবা আর মা দুধারে চলে গেলেন। চারধারে আলগা পাথর, হাঁটু-সমান ঝোপ। একটু নীচে বড়ো বড়ো গাছ। মনে হল ওই দিকেই ঝর্ণা। পা টিপে নীচের দিকে নেমে এলাম। একটা উঁচু পাথরে উঠে দাঁড়িয়েছি, দেখি মার হাত ধরে বাবা তাড়াতাড়ি নেমে আসছেন। আমায় দেখে হাত তুললেন। কাছে এসে বললেন, 'নন্তু, এখুনি ফিরতে হবে। এখানে কাল চিতাবাঘ দেখা গিয়েছিল। এক রাখাল বলল।'

ফেরার সময় বলেছিলাম, 'তোমার ঝর্ণা পেলে না?' কিন্তু ওরা খুব উদ্বিগ্ন থাকায় জবাব দিলেন না। প্রায় নীচে পৌঁছে গেছি। তখন মনে হল কাছাকাছিই কোথাও ঝর্ণা রয়েছে, শব্দ শুনতে পাচ্ছি। বাবাকে বললাম। তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না, না, বেলা পড়ে আসছে, এখন ঝর্ণার ধারে যায় না। এখন বাঘে জল খেতে আসবে।' মা খুব শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরলেন। তখন খুব সুন্দর সূর্যাস্ত হচ্ছিল; অনেক দূরে গিয়ে একবার পিছু ফিরে তাকিয়েছিলাম। পাহাড়টা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। ওর মধ্যে ঝর্ণা আছে, সেটা আর দেখা হল না। তবু বিনোদ মুখটা আরো কাছে আনল। আঙুলটা বুড়োর চোখে স্পর্শ করিয়ে আলোর দিকে বাড়িয়ে দিল। চিকচিক করে উঠলো আঙুলের ডগাটা।

বুড়ো মুখ তুলে তাকিয়ে। মসৃণ মাথা, ধূসর দাড়ি, পাথরখণ্ডের মতো কঠিন চাউনি। হামা দিয়ে ঘরের অন্ধকারে খসখস শব্দ করে চলে গেল।

তখন ফুটবল মাঠ পার হয়ে, বিনোদ রেললাইনের ধারে এসে দাঁড়াল। চীৎকার করতে করতে খোকা ছুটে আসছে, 'বাবা বাবা, একি পাগলামি হচ্ছে।' সারাক্ষণ ও পিছু নিয়ে রয়েছে। বিনোদ ভাবল, ওকি আমায় এখনো ইতর ভাবছে! কিন্তু ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন তো আজ আর আসবে না।

# মৃত্যুর পথ

## দিব্যেন্দু পালিত

ট্রেনের দোলায় ঝিমুনি আসছিল নৃসিংহের। হাত-পা অবশ, মাথা ও কপাল ভারী, শরীরের সর্বত্র একটা বিচ্ছিন্ন অনুভূতি। এখন, প্রবল ঝাঁকুনিতে, আচ্ছন্ন তন্দ্রার ঘোর কেটে গেলে, সোজা উঠে বসল সে। কতক্ষণ বুঝতে পারল না; তবে, অনুমান করল, বেশ কিছুক্ষণ সে অলস, আচ্ছন্নতার মধ্যে কাটিয়েছে। এ রকম হওয়া উচিত ছিল না, সাবধানে চিন্তা করল নৃসিংহ, তাকে সজাগ থাকতে হবে সব সময় এবং সতর্ক।

সতর্ক ও সাবধান হয়ে নৃসিংহ এবার কামরার ভিতরটা দেখে নিল। না, ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। ট্রেনটা ছুটছে অসম্ভব দ্রুত। ধাতব গমগমে একটা শব্দ উঠছে চাকায়, সম্ভবত কোনো ব্রীজ পার হচ্ছে এখন। মেরুদণ্ড টান করে, কান পেতে কয়েক মুহূর্ত শব্দটা শুনল নৃসিংহ। যেন নৃসিংহের চিন্তার সঙ্গে তাল রেখে শব্দটা বলে দিচ্ছিল: ঠিক আছে, ঠিক আছে।

আত্মস্থ হবার চেষ্টায় একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল নৃসিংহ। প্যাকেটটা বন্ধ করে, আবার খুলে দেখল। আর মাত্র তিনটি সিগারেট বাকি। খুব কম ক'রেও এখনো চার ঘণ্টা পথ যেতে হবে। এই সিগারেটটা জ্বালাতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু যে-কারণে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ছ' ছটা সিগারেটের ধোঁয়া গিলতে হয়েছে তাকে, ঠিক সেই কারণে, ভয়ঙ্কর উত্তেজনায়, সপ্তম সিগারেটটাও ধরাতে বাধ্য হলো সে।

অবসাদ কেটে গেলে এখন সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল নৃসিংহ। জানলাগুলো বন্ধ থাকার দরুণ বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। শীত আজ একটু বেশি। শার্সির ওপাশে অস্পষ্ট অন্ধকার, নিশুতি রাত, কুয়াশার জন্য দ্রুত অপসৃয়মান ছোট ছোট ষ্টেশনগুলির আলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

ভিতরে, মালতী এখন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর যাত্রার কোন

চিন্তা তাকে স্পর্শ করেছে মনে হয় না। হালকা আলোয় নৃসিংহ তার ভারি উন্নত বুক, স্ফীত উদর, বাদামী মোমের মতো মুখ—এইসব অনেকক্ষণ ধ'রে দেখল। মালতী, আহা, মালতী। করুণা বা উত্তেজনায় নয়, এই দীর্ঘ সময় আত্মচিন্তায় সে এত বেশি বিভোর ছিল যে মালতীকে দেখা মাত্র তার কথা মনে পড়া মাত্র, কনকনে ঠাণ্ডায় নৃসিংহের কপালে ঘাম ফুটে উঠল।

অস্বস্তি বোধ হ'তে থাকায় উঠে গিয়ে দরজা খুলল নৃসিংহ। ভিতরের যে-টুকু আলো বাইরে পড়ল, অন্ধকার ভেদ করতে পারল না। দূরে, কাছে যতোটুকু দেখল শুধু অন্ধকার। অন্ধকার ছাড়া আর-কিছু ছিল না। একটানা ঝিঁ-ঝিঁর মতো শব্দে সমস্ত পরিবেশটাই কেমন নেশা-ধরানো, থমথমে। এখন বোধহয় কৃষ্ণপক্ষ চলছে; তা না হ'লে কুয়াশা সত্ত্বেও, অন্ধকার উথলে উঠত না। কনকনে হাওয়ায় চোখ, মুখ, গলে যাবার উপক্রম। রাত-কানা একটা বড় পাখি উড়তে উড়তে টেলিগ্রাফের তারে ধাক্কা খেয়ে চীৎকার করে উঠল। নৃসিংহের মনে হলো ট্রেনটা হঠাৎ গতি বাড়িয়ে দিয়েছে; আর চাকার সেই অবিশ্রাম গর্জন, হাওয়া সুঁচের মতো তীব্র, তীক্ষ্ণ হাওয়া।

পিছনে অস্ফুট শব্দ শুনে ভিতরে তাকাল নৃসিংহ। ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগায় বোধহয় পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করছে মালতী। হাঁটু দুটো ঈষৎ তুলে আবার সোজা করে রাখল। এই অবস্থায়, ওইটুকু জায়গায় তার পক্ষে পাশ ফেরা সহজ নয়। মোমের মতো মসৃণ ত্বক মালতীর; আলগোছে জড়ানো ফিতেহীন বেণীটা ঝুলে পড়েছে নিচে। বাইরে শীত যে-রকম প্রবল, যা ঝাঁকুনি গাড়ির, তাতে এতক্ষণে জেগে ওঠা উচিত ছিল তার। নৃসিংহ জানে, যত সময় যাবে ততই ঘুমে পেয়ে বসবে মালতীকে। বাইরে হিংস্র প্রকৃতি, ভিতরে ভরামাসের অন্তঃসত্ত্বা রমণী—দুয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নৃসিংহের নখের ডগা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত পাপ ছুটতে লাগল। দ্রুত ধাবমান এই ট্রেন থেকে দৈবাৎ ছিটকে পড়লে বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই। মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ রাত্রির লিপ্সা; তালগোল পাকিয়ে থেঁতো মাংসপিণ্ডের মতো সে যাবে, তার আর কোনো অস্তিত্বই অবশিষ্ট থাকবে না।

কোনদিন যা হয়নি, নৃসিংহ এই মুহূর্তে ঈশ্বরকে স্মরণ করল। অতর্কিত মৃত্যুর সম্ভাবনা মাথায় ঢোকার পর থেকেই উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ কাঁপতে শুরু করেছিল তার। অথচ নিজে সে অত্যন্ত সাহসী, অত্যন্ত চতুর অত্যন্ত তৎপর। তবু তবুও। শারীরিক এই প্রকম্পনের যথার্থ কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছিল না নৃসিংহ। কখনো তার হৃৎপিণ্ড যেন ঢুকে পড়ছিল পাকস্থলীর ভিতর, কখনো মনে হচ্ছিল, সূক্ষ্ম তন্তুগুলি ছিঁড়ে রক্তাক্ত ফুসফুস উৎক্ষিপ্ত হবে বাইরে।

তাহলে কি মালতীকে ভালোবাসে নৃসিংহ? তাহলে কি অর্থ হয় এই উত্তেজনার! হাস্যকর মনে হয় সব কিছু। যা না করে পারবে না, তা সে করবেই, যতই ভয়াবহ হোক, বা পাপ, তবু। শুধু মালতী হলে কথা ছিল। কিন্তু আগুনের দাহের মতো মালতীর ওই মায়াবী উদর যেন দ্বিগুণ চতুর্গুণ হয়ে লাগছিল নৃসিংহের শিরাবহুল চোখে।

শরীরের শীত ও উত্তেজনা প্রশমনের জন্য হাত দুটি পরস্পর ঘষে, দরজাটা এইবার বন্ধ করে দিল নৃসিংহ। বিশ্বাসঘাতক এই শরীর, মদের মতো উচ্ছল; ভীষণ উত্তেজনায় ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। শরীর, শরীর, বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল সে। নিজের স্ত্রী ও সন্তানের মুখ মুহূর্তের জন্য মনে পড়ল নৃসিংহের।

এখন ভাবলে খুব আশ্চর্য লাগে। নির্জন কামরা, মাত্র তারা দুজন, ভিতরে সব রকম সুবন্দোবস্ত—এইরকম নৈশযাত্রার কথা স্বপ্নেও কি ভেবেছিল কোনদিন! ধাতস্থ হবার সময় খুব ভালো করে তার চতুঃপার্শ দেখে নিচ্ছিল নৃসিংহ, তা ভিন্ন এই মুহূর্তে করণীয় আর কিছুই নেই। আয়নার ঠিক নিচে রাখা ছিল কালো রঙের বড় একটা ট্রাঙ্ক। মালতী জানত ট্রাঙ্কটা খালি; নিশ্চয় জানত, পাণপণে তার উত্তরাধিকার রোধ করতে চাইছে নৃসিংহ। অন্তের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আবার সে অস্ফুট শব্দ করে উঠল, এক ছুটে নৃসিংহ তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ব্র্যাকেটে ঝুলছে মরা কাকের মতো মালতীর কালো ব্লাউজ। ট্রেনে ওঠার পর বিষম যন্ত্রণায় ছটফট করার মুহূর্তে অন্তত এইটুকু করুণা তাকে উপহার দিয়েছিল নৃসিংহ। এখন ঘটনাটা মনে পড়ল তার।

নৃসিংহ ঝুঁকে তাকিয়ে ছিল নীচে, প্রায় মালতীর মুখের উপর। এত কাছে যে মালতীর ফাঁক ফাঁক মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। মালতী শুয়ে আছে প্রায় নিস্পন্দ, বস্তুত ঘুমিয়ে আছে কিনা বোঝার উপায় নেই। চিৎ হয়ে পড়ে আছে, আবরণ না থাকলে এই সময় তাকে দেখাত অতিকায় এক জন্তুর মতো। এখন যদিও তাকে মনে হয় খুব শান্ত ও সমাহিত; ঠোঁটের সব রক্ত গিয়ে জমেছে দুই কষে, ভরাট মুখের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে বাদামি আভা। মুহূর্তের মায়ায় মালতীর ওই মুখ বড় কোমল মনে হলো নৃসিংহের, মনে হলো, মালতী তার খুব কাছের জন ও আত্মীয়। কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে পড়ল নৃসিংহের, অন্ধকার জঠরে মালতী বহন করছে তার পাপের ফল। নিরুপায় আক্রোশে হাহাকার করে উঠল সে।

ট্রেনটা ছুটছে একই গতিতে, একই শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘষে যাচ্ছে জানলার কাচে। অন্য কোনো শব্দহীন, নিরুপদ্রব সময়ে নিজেকে নিমজ্জিত হতে দেখে ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল নৃসিংহ। নিঃশ্বাসের নাগালে শুয়ে আছে প্রার্থনাহীন মালতী। ঝিনুকের মতো তার গভীর আয়ত চোখের কোনে এইবার অশ্রু জমে উঠতে দেখল নৃসিংহ। এই শরীর, এই মাংস, ভাবল, যা-কিছু করার এখনই করে ফেলা দরকার।

কি হয় যদি সমস্ত পাপ মুছে যায় এক নিমেষে মাত্র একটি মুহূর্তের তৎপরতায়! পৃথিবী তখনো সুন্দর, মাংসের আগুন তখনো প্রজ্জ্বলিত; ক্ষমাহীন নৃসিংহের শরীর থেকে বিক্ষুব্ধ উত্তেজনার মেদখণ্ডগুলি টুপ টুপ করে ঝরে পড়তে থাকে…

মালতী জেগে উঠেছিল তার আগেই। ঝিনুকের ঢাকনা দুটি খুলে গেল অতি নিঃশব্দে। এবং অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্য পরিষ্কার দুই চোখে, সম্মুখে কিংবা আশেপাশে কিছুই দেখবার চেষ্টা সে করল না। স্বপ্নের ভিতর জেগে উঠলে যা হয়, এত শান্ত ও নির্বিকল্প তার দৃষ্টি যেন হঠাৎ তাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে অদৃশ্য কোনো দেবদূত। হয়তো নৃসিংহ তার এই অবস্থার সুযোগ নেবে।

জোরে সিটি বাজিয়ে ট্রেনটা এই সময় ঢুকে পড়ে পাহাড়ের গুহার ভিতরে। টানেলটা রীতিমতো দীর্ঘ, গুমগুম শব্দের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে হা

হা করে ছুটে এলো অন্ধকার—ভিতরের মৃদু আলোর রশ্মি নিষ্প্রভ হতে হতে ছোট্ট শাঁসে পরিণত হল।

মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করেছিল মালতী। আবার আলো দেখা দিতে শিথিল হাতটি তুলে প্রথমেই সে রাখল নিজের গলার উপর ; আরো কয়েক মুহূর্ত পরে, তার সমগ্র ভঙ্গির মধ্যে উঠে বসার একটা ক্ষীণ চেষ্টা দেখা দিল। প্রাণপণ চেষ্টায় অবশেষে কোনো রকমে উঠে বসল সে। মাংসের আগুনে হৃৎপিণ্ডে সেঁক নিতে নিতে নৃসিংহ মালতীকে ভাবল, নিজেকে ভাবল।

স্থির দাঁড়িয়ে মালতীকে লক্ষ করছিল নৃসিংহ। ভীত, পর্যুদস্ত ও কিছুটা সন্ত্রস্ত, মালতী উঠে বসার পর হঠাৎ চঞ্চল হয়ে পড়েছিল সে। হয়তো ধরে নিয়েছিল নৃসিংহ, মালতী মৃত, তার উত্থান শক্তি একেবারেই অন্তর্হিত হয়েছে। বিমূঢ় ও স্তব্ধ এখন সে হতবুদ্ধির ভাব আয়ত্ত করছিল। মালতীর নিঃশ্বাস পড়ছিল থেমে থেমে ভয়ে ভয়ে।

'উঠলে কেন ?' বিচলিত হবার ভান করল নৃসিংহ : 'শুয়ে পড়ো ; এখনো অনেকটা রাস্তা যেতে হবে···'

বারেক চোখ তুলে সামনে দাঁড়ানো নৃসিংহকে দেখল মালতী তারপরেই চোখ নামিয়ে নিল। ঝুলে-পড়া চাদরটা শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরেছিল সে। উত্তর দিল না।

'জল খাবে ?'

নৃসিংহ ঢোঁক গিলল ; যেন সে নিজেই পিপাসার্ত।

মালতী ঘাড় নাড়ল।

'তাহলে···'

অস্থিরভাবে কয়েক মুহূর্ত পায়চারি করল নৃসিংহ। ঘড়ি দেখল, মালতীকে দেখল।

'শুয়ে পড়ো।'

কাছে সরে এসে এইবার নৃসিংহ মালতীর গায়ে হাত রাখল। সস্নেহ হাত। গায়ে পোকা-মাকড় বসলে যেমন হয়, ঠোঁট কুঁচকে উঠল মালতীর, নৃসিংহের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল গা থেকে। রোঁয়া-ওঠা বিড়ালের মতো বেঁকে উঠেছে তার পিঠ। নৃসিংহ ভয় পেল।

'কি হল ?'

'তুমি আমার গলা টেপার চেষ্টা করেছিলে !' মালতী অত্যন্ত স্পষ্ট।

'আমি !' বিস্ময়ের ধ্বনি থাকলেও, মনে হতে পারে নৃসিংহ প্রশ্ন করছে। আরো মনে হতে পারে, স্থিরতা যার স্বভাব-বিরুদ্ধ, মুহূর্তের মধ্যে কি করে, কি অদ্ভুত তৎপরতায়; সে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে !

নৃসিংহ দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। স্থির চোখে মালতীকে নিরীক্ষণ করে আস্তে আস্তে—নিপুণ অভিনেতার মাপা ভঙ্গিতে—বসে পড়ল। এই সময় দীর্ঘশ্বাসের মতো একটি গাঢ় শব্দ কোনোরকমে সংবরণ করল সে। তারপর হঠাৎ, হঠাৎই, তুই হাতের তালুতে নিজের মুখ ঢেকে ফেলে।

'তুমি কষ্ট পাচ্ছিলে,' যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল নৃসিংহের কণ্ঠস্বর। 'আমি শুধু তোমার চাদরটা ·'

'তুমি আমায় মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলে।'

খুব স্বাভাবিক স্বর মালতীর, ঈষৎ কাঁপা তবু সব মিলিয়ে মনে হয় এখন সে স্বচ্ছন্দ ও সহজ বোধ করছে। জলভরা অপলক চোখে তাকিয়েছিল মাটির দিকে। নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে বড় ট্রাঙ্কটি দেখে নিল একবার। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিল। তারপর, শরীরের ভারসাম্যে টান পড়ার জন্যই সম্ভবত, পা তুটো ছড়িয়ে দিল নিচের দিকে, যেখানে স্থাণুর মতো বসে ছিল নৃসিংহ। চোখের উপর একটা হাত চাপা দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল মালতী।

কনকনে শীতের রাতে পাহাড় প্রান্তের কুটিরে নৃসিংহ ভূমিষ্ঠ হতে দেখল তার পাপের ফল, একটি নীল শিশু। বাতাস তেমনি প্রবল, দমকে দমকে শীত শিহরণ উৎসারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে হাওয়ায়। আকাশ খুব পরিষ্কার ও জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে থাকলে কি হবে, আলের পথে যেতে গ্রাম্য মানুষ কয়েকজন বলে গেল, আজকের শীত বড় বেশী। দূরে দাঁড়িয়ে মুষ্টিবদ্ধ নৃসিংহ তাদের লণ্ঠনের আলো জ্যোৎস্নায় হারিয়ে যেতে দেখল। ঢেঙা, নিষ্পত্র গাছের পর গাছ ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ল না। চোখের ওপারে শুধু শূন্যতা। আরো অল্প দূরে ছোট পাহাড়ের পিছনে আকাশে অস্পষ্ট আগুনের আভা। পরে, আগুনের আভা অদৃশ্য হলে; নৃসিংহ বুঝতে পারল, যেতে হলে পাহাড়

পেরিয়ে তাকে যেতে হবে আরো দূরে। আকস্মিক তীক্ষ্ণ চাৎকার নৃসিংহকে প্রভাবিত করতে পারল না। স্তব্ধতার ভিতর ছুটে গিয়ে নৃসিংহ দেখল ডানা বিস্তার করে পড়ে আছে অবসন্ন মালতী—অনেক ঝড়-ঝাপটার পর পরিশ্রান্ত জাহাজ এখন নোঙরে স্থির। হা ঈশ্বর, মালতীর শিথিল, ক্লান্ত দেহের দিকে তাকিয়ে মনে মনে উচ্চারণ করল সে, হা ঈশ্বর! রমণীর মুক্তি মুহূর্তের জন্য বিহ্বল করে তুলল তাকে।

ঘরের মৃদু আলোয় নৃসিংহ সেই নরম মাংসপিণ্ডের চমৎকার গড়ন আবিষ্কার করে ধিক্কার দিল নিজেকে। আত্মঘাতী মাংস তার পরিশ্রম ফিরিয়ে দিয়েছে। পাহাড়ের পিছনে মুহূর্তের আগুনের আভা মনে পড়ল তার।

বুকের কাছে কাপড়ে জড়ানো সেই মাংসপিণ্ড; পিছনে তাড়া করে আসছে শীতার্ত বাতাস। শীতে আড়ষ্ট মৃত শিশুটি তার রোমশ বুকে ঠোঁট ঘষছে অনুভব করে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল নৃসিংহ। মিনিট কয়েকের পরমায়ু এখন দীর্ঘ যন্ত্রণার মতো ঝুলছিল তার বুকে। শিশুটিকে চোখ খোলার সুযোগ দেয়নি সে, জন্মান্ধ এবং মাত্র একবারের ক্ষীণ চীৎকারের পর নিঃশব্দ, মনে হলো আবরণের ভিতর তার নরম চোখ থেকে ঝরে পড়ছে আঠার মতন নীল জল। নিজের সম্পর্কে অনিশ্চিত বোধ গাঢ় থেকে ক্রমশ গাঢ়তর হচ্ছিল নৃসিংহের। সামনে ধাপে ধাপে উঠে গেছে পাহাড়, চতুঃপার্শ্বের পৃথিবী ও বাতাস মাংসের গন্ধে মাখামাখি।

পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে দূর আকাশে মড়ার খুলির মতো চাঁদটিকে স্পষ্ট দেখতে পেল সে। ওইখানে পড়ে আছে অবসন্ন মালতী। সাময়িক আছন্নতার ঘোর কেটে গেলে, এতক্ষণে হয় তো সে তার অপহৃত রক্ত-মাংস-নিঃশ্বাসের অভাবে হাহাকার করছে।

নির্জন প্রান্তরের দিকে পাহাড়ের ঢল ভেঙে সাবধানে নামতে নামতে মৃত শিশুটিকে সাপ্‌টে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরল নৃসিংহ। তীব্র শীতের ধাক্কা সহ্য করতে না-পেরে মাঝে মাঝেই থেমে দাঁড়াতে হচ্ছিল তাকে। হাওয়ায়, জ্যোৎস্নায়, অন্ধকারে প্রায়ই মনে হচ্ছিল, অশরীরী মালতী ছুটে আসছে হাহাকার তুলে, চুল উড়িয়ে, তার অপহৃত রক্ত-মাংস ছিনিয়ে নিতে। দ্রুত পা চালাল নৃসিংহ। পাহাড়ের ঢালু পথ থেকে মাঠে নেমে

পা দুখানি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। ধানকাটা মাঠের সুঁচিমুখ খড়কুটো প্রতি মুহূর্তে বিঁধছিল পায়ের তলায়। মাঠ শেষ হবে আর একটু পরেই। তারপর পাহাড়ী নদী, শ্মশান। বুকের মধ্যে নীল শিশু। তার শিশু। নৃসিংহ তার জন্য করুণা অনুভব করল। এই মুহূর্তগুলির জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘদিন। প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে; উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে। নৃসিংহ নিজের পাপ সম্পর্কে সচেতন হলো। ভয়ঙ্কর দুর্বলতা ও আশঙ্কার মধ্যে তার স্নায়ুগুলি ক্রমশ অবসন্ন হয়ে আসছিল। মালতী নয়, নৃসিংহের মনে হচ্ছিল, আবরণের ভিতর শিশুটি ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে, অল্প অল্প করে ফিরে পাচ্ছে পূর্ণতা এবং ছোট্ট নরম দুইখানি হাত ক্রমশ বড় হতে হতে যে-কোনো মুহূর্তে তার হৃদপিণ্ড চেপে ধরবে।

আতঙ্কে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল নৃসিংহের। একটু বাতাসের জন্য উপরে তাকাতে হঠাৎ তার চক্ষু বিস্ফারিত হলো। মাথার উপর কালো ডানা ছড়িয়ে ঘুরে ঘুরে উড়ছে একটা বড় পাখি। নৃসিংহ সতর্ক হয়ে থেমে দাঁড়াতেই নিমেষে চলে গেল দূরে, তারপর আরো নিচু হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার মাথার উপর। প্রবল দুই হাতে শিশুটিকে আড়াল করে কোনরকমে আত্মরক্ষা করল নৃসিংহ। তীব্র স্বরে পাখিটা এই সময় চীৎকার করে উঠতে ম্লান জ্যোৎস্নায় নৃসিংহ দেখল, একটা শকুন। মাটিতে পড়ে শকুনটা কিছুক্ষণ ঝিমানোর ভাব করল, তারপর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কিছু দূর গিয়ে আবার ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে গেল।

হাওয়া ফুঁসছে তেমনি দ্রুত, এত শীতেও আগুনের হল্কা ছুটতে লাগল নৃসিংহের সমস্ত শরীরে। চকিত বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো প্রকৃতি দারুণ শব্দে ফেটে পড়ল তার চোখের সম্মুখে। দিক-চিহ্নহীন চতুর্দিকে তাকিয়ে নৃসিংহের মনে হলো সে একা নয়; মৃত শিশুর শব বুকে লুকিয়ে লক্ষ লক্ষ ঘাতক ছুটে চলেছে নির্বিশেষ শূন্যতার দিকে।

অন্ধের মতো ছুটছিল নৃসিংহ। সম্মুখের পথ ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। প্রবল ও এলোমেলো বাতাস এই সময় তীব্র হয়ে উঠল; এত তীক্ষ্ণ যে দুই হাতের পরিসরে শিশুটিকে ধরে রাখা অসম্ভব মনে হয়।

সদ্য-প্রসূত শিশুর গায়ের নরম আঁশটে গন্ধে ঝিমঝিম করছিল মাথা মধ্যরাত পার হয়েছে অনেকক্ষণ, আর একটু পরেই হয়তো ভোর হবে না হলে হঠাৎ জ্যোৎস্নার আলো ম্লান থেকে ম্লানতর হয়ে অন্ধকার ঘন করে তুলত না। এমনও হতে পারে, নৃসিংহ ভাবল, তার চোখের ভুল শক্তি ও মনের জোর কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে চতুর্দিকে অন্ধকার দেখছে। দৃষ্টির জড়তা কাটানোর জন্যে চোখ রগড়াল সে, নিঃশ্বাস নিল হুঁ করে, সামনে ও পিছনে যতটা পারল স্পষ্ট দেখে নিল। সামনে নদীর জল আবছায়া অন্ধকারে শান্ত নদী, শীতের সময় বলে জল কম, ওপারে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। প্রায় দিগন্ত ছুঁয়ে, আকাশ রক্তাভ হয়ে উঠেছে।

গন্তব্যে পৌঁছে নৃসিংহ অনেক সহজ বোধ করছিল। এখন সে তার কাজ শেষ করতে পারে। অস্পষ্ট আলোয় আকাশের দিকে তাকিয়ে নৃসিংহ তার করধৃত শিশুর মুখ দেখল। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে-ওঠা ঠোঁটের কোণ থেকে গড়িয়ে পড়ছে ডিমের কুসুমের রঙ, ফ্যাকাশে রস। কাঁপা আঙুলে সেই রস মুছিয়ে দিতে দিতে নৃসিংহ তার শিশুর জন্য প্রার্থনা করল।

শিশুটিকে মাটিতে নামিয়ে রাখল নৃসিংহ। দ্রুত হাতে বের করল কোমরে ঝোলানো ছুরিটা। পায়ের নিচে নরম মাটি ; হয়তো দু'একদিন আগেও এই অবধি জল ছিল, ভাটার টানে এখন সরে গেছে। পবিত্র এই মাটির গর্ভে তার পাপ নির্বাসনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিল নৃসিংহ।

এতক্ষণ বাতাস বইছিল এলোমেলো ; এত দূর এসে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। ওপারে, দিগন্তের রক্তাভা কখন মুছে গেছে নিঃশেষে ; ক্ষীণ ধোঁয়ার রেশ কিছুক্ষণ আকাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে, তারপর স্থির হয়ে যায়। শবদাহকরা এসে থাকলে নিশ্চিন্তে ফিরে গেছে এতক্ষণে। অদৃশ্য অন্ধকার থেকে আকস্মিক শেয়ালের চীৎকারে সচকিত হলো নৃসিংহ। নদীর পাড় ঘেঁষে একটি শেয়াল চলে এসেছিল খুব কাছে, নৃসিংহ ফিরে তাকাতে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। হঠাৎ ঝড়ের মতো শব্দে তার চোখ পড়ল উপরে। সেই শকুনটা। ঘন ঘন ডানা নেড়ে নেমে আসছে উল্টো দিক থেকে। একটা নয়, দুটো নয়, পিছনে তাকিয়ে নৃসিংহ দেখল, ছোট থেকে ক্রমশ বড় হয়ে একের পর এক উড়ে আসছে শকুনেরা। দ্রুত ছুটে গিয়ে নগ্ন শিশুটিকে মাটি থেকে তুলে আনল সে। অন্ধকারে বিবর্ণ, শীতের জন্যই সম্ভবত নরম চামড়ায় টান ধরেছে। নাক, মুখ, চোখ, নিরাকার, অস্পষ্ট।

ছায়াচ্ছন্ন সেই মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভয়ে হাত, পা, সমগ্র অবয়ব শিথিল হয়ে এল নৃসিংহের। পাখিগুলি এই সময় একে একে মাটিতে নামতে শুরু করে। এক হাতে শিশুটিকে আড়াল দিয়ে, অন্য হাতে মাটি খুঁড়তে শুরু করে নৃসিংহ। বস্তুত, এখন সে তার সমস্ত শক্তি ও দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেছিল, দৃষ্টিও আচ্ছন্ন। যা করছিল, করে যাচ্ছিল যন্ত্রের মতো, অনায়াসে।

সাহস পেয়ে শকুনেরা এগিয়ে আসে আরো কাছে। এখন তারা নৃসিংহের প্রায় কাছে, দর্শকের ভঙ্গিতে, প্রায় বৃত্তাকারে উড়ে এসে বসে। উত্তেজনায় সর্বাঙ্গে ঘাম ছুটছিল নৃসিংহের। গর্ত খুব গভীর হয়নি। তবু শেষবারের মতো নৃসিংহ শিশুটির অন্ধকার মুখের দিকে তাকিয়ে, গর্তে শুইয়ে, মাটি চাপা দিতে শুরু করল। মাংসময় এই দেহ, পাপের ফল, হে শিশু, মৃত্তিকায় লীন হও।

নৃসিংহ তার কপাল থেকে মুছে ফেলল দীর্ঘক্ষণের বিপর্যয়, ঘাম। মাথার চুল টেনে ধরল হাতের মুঠোয়; স্বস্তির নিঃশ্বাসে খালি হল বুক। লবণাক্ত জিব দাঁতে নিংড়ে থুথু ফেলল। লাফাতে লাফাতে তার হাতের সীমানার মধ্যে একটা শকুন এইবার ঢুকে পড়ে। স্নায়ুর পীড়নে উত্যক্ত নৃসিংহ কোনোরকমে ছুরিটা তুলে ছুড়ে মারল সেদিকে। চতুর্দিকে ডানা মেলার ঝটপট শব্দ। পাখিরা উড়ে যাচ্ছে। একের পর এক, সারিবদ্ধ, তারপর সামনে ও পিছনে। মাংসের গন্ধে থমথম করছে বাতাস; প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় নিঃশ্বাস আটকে যাবে। হাতের তালুতে নাক ঘষে সাময়িক স্বস্তিতে উঠে দাঁড়াল নৃসিংহ। এখন সে ফিরে যেতে পারে।

পাংশু চাঁদ ঢলে পড়েছে দিগন্তে। চলে যাবার জন্য প্রস্তুত নৃসিংহ, কয়েক পা এগিয়েছে হঠাৎ অসংখ্য ডানার শব্দে সচকিত হয়ে ভীত ও বিভ্রান্ত সে দেখল শকুনের পাল নেমে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। একের পর এক নেমে চতুর্দিকে থেকে সদ্য মাটি চাপা দেওয়া শিশুটিকে ঘিরে ধরল তারা।

চোখে অন্ধকার দেখল নৃসিংহ; যেন তার চোখের উপর হঠাৎ কুয়াশার পর্দা পড়েছে। থরথর করে কাঁপছিল সর্বাঙ্গ। একবার জোরে চেঁচিয়ে ওঠার চেষ্টা করল; পারল না। মনে হলো মৃত্তিকার নিচে চোখ খুলে শিশুটি তাকিয়ে আছে তার দিকে। আঠার মতন নীল জল ও মাটিতে মাখামাখি সেই মুখের আকর্ষণে ক্রমশ আত্মহারা নৃসিংহ, টলতে টলতে এগিয়ে গেল কয়েক পা; তারপর, শকুনময় চরাচরের আর্তনাদ ও আক্রমণের মুখে নিজেকে সঁপে দিয়ে, শিশুটিকে আড়াল দেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল।

# জল্লাদ

## পার্থ চট্টোপাধ্যায়

খাকির পোষাক পরা সেপাই সাত নং বস্তীর মধ্যে ঢুকে তার দরজায় কড়া নাড়ল, ভগবান আছ নাকি হে এ—ভগবান ?

আশে পাশে লোকেরা বুঝতে পারে। পাশের ঘরের সনাতন জানলা দিয়ে উঁকি মেরেই সিপাইকে দেখতে পায়। মন্তব্য করে ভগবান আছে নাকি হে, সিপাই বাবা ? ভগবান থাকলে ও বুড়ো এখনও এত লোককে যমের বাড়ি পাঠিয়ে আজও বেঁচে থাকে !

আশে পাশের লোক যারা শোনে তারা মুচকি মুচকি হাসে। ঘরের ভেতর খক খক কাশির শব্দ। ভগবান সরদার কাশছে। কাশির দমকে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। তারপর দরজা খুলে সেপাইকে দেখে চোখের মণি দুটো খুশীতে চক চক করে ওঠে।

—কী খবর সিপাই বাবা ?

—নাও, আর একজনকে পরপারে পাঠিয়ে এস। সনাতন পাশের ঘর থেকে চিৎকার করে। তার কুৎসিৎ হাসিটা লকলকে বিদ্যুতের মত আকাশে একটুখানি উঠে আবার মিলিয়ে যায়।

—তুই থাম, হারামজাদা ! ধমক দিতে গিয়েই আবার গলা চিরে কাশি বেরিয়ে আসে। একটু সামলে নিয়ে ভগবান আবার বলে, এস, এস সিপাই বাবা। একটু বসবে না ?

—না, বসব না। চিঠি আছে তোর নামে। পিওন বুক আর বাদামী খামে মোটা চিঠিখানা তার দিকে এগিয়ে ধরে সিপাই। এ চিঠির ভাষা ভগবানের মুখস্ত। টিপ ছাপ দিয়ে চিঠিখানা হাতে নেয় ভগবান। তারপর জিজ্ঞাসা করে, কবে ?

—এই শনিবার।

তার মানে শুক্রবার থেকেই তাকে তৈরি হতে হবে।

—কোন জেলে ?

—আলিপুর।

—অনেকদিন পরে কিন্তু এলে সিপাই বাবা।

—তোর বরাত খারাপ। বছরে এখন দুটোর বেশী ফাঁসী হয় না। জজ সাহেবরা সব দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর হয়ে উঠেছে তুই কী করবি বল!

সিপাই চলে গেল। চিঠির কাগজখানা নিয়ে ঘরে চলে যায় ভগবান। দরজা দিয়ে আবার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে যায়। তবু এতদিন পরে ফাঁসীর আসামী এল ওর হাতে। আগের আসামী ফাঁসীতে ঝুলেছিল মাস আষ্টেক আগে।

ছ'ফুট লম্বা স্বাস্থ্যবান যোয়ান ছিল সেটা। কালো মোষের মত চেহারা। টেরি কেটে ছিল আগের দিন পর্যন্ত। শেষ রাতের ক্লান্ত তেরছা আলোতে ওকে দেখাচ্ছিল দুর্গা প্রতিমার অসুরের মত। কিন্তু অসুরটাকে যখন টানতে টানতে ফাঁসীর মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সেই অসুরটার চোখে জল দেখেছিল সে। সে চেঁচায়নি, প্রতিবাদ করেনি, বাঁধা দেয়নি। ভগবান যখন কালো টুপিটা দিয়ে চোখ মুখ ঢেকে দিতে যাবে তখন দেখে ছিল অসুরটা ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে চেয়ে আছে। ভগবান তাড়াতাড়ি কালো ঠুলিটা তার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। ড্যাবডেবে চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর গলায় ফাঁসীর দড়িটা পরাতে পরাতে বলেছিল, আমার অপরাধ নিও না, আমি যা করছি তা নেহাত চাকরির দায়ে করছি।

চাকরির দায়—কথাটা একটু বাড়িয়ে বলেছিল ভগবান। না, ও এখন জেল ডিপারমেনটের মাইনে করা ফাঁসুরে নয়। সে ছিল ওর ঠাকুরর্দা। তখন কলকাতায় মাসে একটি দুটি করে ফাঁসী হত। ওর বাবার আমলে ফাঁসীর সংখ্যা কমে এসেছিল। তবু সেটা ছিল স্বদেশীর যুগ। বছরে সাত-আটটা গলা পড়ত। বাবাও তাই মাইনে করা কাজ করত। কিন্তু ভগবান আর চাকরী পায়নি। তখন সবে স্বাধীন হয়েছে। অপরাধীদের সঙ্গে দৃষ্টিভংগি পালটাচ্ছে সরকারের। না, সরকারের আর মাইনে করা ফাঁসুড়ের দরকার নেই।

ভগবান তাই জেলখানার চাকরির ওপর ভরসা করেনি। সে ইলেকট্রিকের কাজ শিখেছিল। তারপর চাকরি পেয়েছিল করপোরেশনে।

মধ্যে মধ্যে ফাঁসীর আসামী এলে ডাক পড়ত। এক একটি ফাঁসী দিতে পারলে পঞ্চাশ টাকা। জেলখানা ছেড়ে যাবার সময় জেলরের অফিস থেকে করকরে নোট গুণে নিয়ে যেত। প্রথম দিকে বছরে চার পাঁচবার ডাক আসত। এখন ডাক আসে ন' মাসে ছ' মাসে। বছরে একটি দুটি ফাঁসীর অর্ডার হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফাঁসী আর হয় না। ছাড়া পেয়ে যায় আপীলে। অথবা রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে চিঠি আসে শেষ মুহূর্তে। চরম দণ্ড মুকুব। তার বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

কালিঘাটের সাত নং বস্তীর ভগবান সরদারকে ও তল্লাটের সবাই চেনে। আবলুশ কাঠের মত গায়ের রঙ। এককালে শক্ত সমর্থ মজবুত দেহ ছিল। একবার অসুখে ভুগে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে, মনটা ভেঙেছে তারও আগে। এককালে তার মনেও রঙ ধরেছিল। তার ভাল লেগেছিল তরলাকে। নগদ পাঁচশ' টাকা গুণে গুণে তার বাবাকে দিয়ে সে তরলাকে বিয়ে করে এনেছিল ঘরে। তখন সে করপোরেশনের চাকরিতে ঢুকেছে। ফাঁসীর জন্য ডাকও আসে দু-তিন মাস অন্তর। তরলা জানত ভগবান ফাঁসী দেয়। সে নিজেই বলেছিল একদিন বিয়ের পর, আচ্ছা তোমাকে ওরা ফাঁসুড়ে বলে খেপায় তুমি জান? ভগবান বলেছিল, উয়াদের কথায় থাকিস কেন তুই?

—বারে, কানে আসলে কি করব? একজাগায় বাস না?

—হিংসায় বলে সব হিংসায়। দুটো টাকা আসে দেখে জ্বলেপুড়ে মরে।

—তুমি ওই কাজ না করলেই পার?

—কেন করব না? দপ করে জ্বলে ওঠে ভগবান। আমি কি নিজ থেকে খুন করি? আইনের বিচারে ফাঁসী হচ্ছে। জজসাহেবের দোষ হলনা, উকিল ব্যারিসটারবাবুদের দোষ হল না, যারা সাক্ষী দিয়ে এল তাদের দোষ নাই, আমারই যত দোষ?

তরলা বোঝেনা। তার মন তবু খুঁত খুঁত করে। ভগবানেরও জেদ চেপে যায়। কেন সে কি কোন অন্যায় করেছে? তার প্রতিবেশীরা তাকে দেখতে পারেনা, তাকে ঘেন্না করে, আড়ালে গায়ে থুথু দেয়। কিন্তু তরলা কেন ওদের কথায় কান দেবে? সে কি তরলার কোন অযত্ন করছে।

কিন্তু তরলাও বুঝি তাকে ঘেন্না করতে আরম্ভ করে। প্রথম প্রথম

ফাঁসীর অর্ডার থাকলে আগের দিন রাতে তাকে ভাত বেড়ে যত্ন করে খাইয়ে দিত তরলা। রাত্তির বেলা গিয়ে জেগে থাকতে হয়। রাত তিনটের সময় উঠে ফাঁসীকাঠে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। চারটেয় ফাঁসী। একঘণ্টা আগে থেকে গিয়ে হাজিরা দাও। কয়েক সেকেণ্ডের তো ব্যাপার। কিন্তু তার জন্যে কত বায়নাক্কা, কত প্রস্তুতি। ফাঁসী দেবার আগে এক বোতল দিশী মদ খেয়ে নিত ভগবান। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠত করমচার মত। পা দুটো একটু একটু টলত। কিন্তু জেলার বাবু বলে দিয়েছিলেন, খবরদার বেশী খাবিনে। তাহলে তোকে দিয়ে কিন্তু কাজ করাবো না, দূর করে দেব। নেশার চোটে হয়ত আমার গলাতেই ফাঁসীর দড়ি টেনে দিবি।

জেলের পুরনো কর্মচারী শ্যামলবাবু বলতেন, মাল টানতে পারত বটে ওর বাবা। তখনতো ব্রিটিশ টাইম, মাসে দুটোতো লেগেই থাকত। আর এক একটা ফাঁসীর খবর পেলে কী খুশী। তারপর ভগবানকে বলতেন, কিরে, তুই কটাকে ঝোলালি? ভগবান হেসে বলত, আমি আর কি ঝোলাই বাবু, ঝোলানতো হাকিমরা।

আরে, লে-লে! হাকিমতো হুকুম দিয়ে খালাশ। তুই-ই ঝোলাবার আসল মালিক। তোর বাবার নাকি সারা জীবনে একশ' পুরে গিয়েছিল। তা তোর শত রজনী হতে কত দেরী?

কী বুঝল কে জানে! ভগবান বিগলিতভাবে বলল, কী যে বলেন ছার। ফাঁসীতো উঠেই যাচ্ছে। আমার জীবনে দশ বারোটার বেশী লোককে তো ঝুলতে দেখলাম না।

কী আফশোষ দেখ হারামজাদার! জেলারবাবু হো হো করে হেসে উঠেছিলেন। হেসেছিল শ্যামলবাবুও।

আফশোষ। আফশোষ। সত্যি ফাঁসী উঠে গেলে আফশোষ হবে ভগবানের। না, আফশোষ শুধু তার লোকসানের জন্য নয়। ন-মাসে ছ-মাসে পঞ্চাশটা টাকা। তাও সে টাকাতো মদ খেয়েই উড়িয়ে দিত ভগবান। বিয়ের পর তরলাকে শাড়ি কিনে দিত। প্রথম প্রথম খুশী হয়েই নিয়েছিল তরলা। তারপর একদিন বলেছিল, ও আমি নেব না।

কেন নিবিনা কেন ?

ও মানুষ মারা টাকা। ও পাপের টাকা।

এতদিন তবে নিছলি কেন ? পাপের টাকাতো তখন মনে হয়নি তোর ?

তখন বুঝতাম না। এখন বুঝি।

কী বুঝিস ?

বুঝি তুমি একটা পিশাচ। তুমি মানুষ নও। ভগবান কথা বলতে পারেনি কিছুক্ষণ। তারপর পরক্ষণেই যেন একটা বোমার মত ফেটে পড়েছিল।

আর তোর বাদল একটা বড় মহাপুরুষ তাই না ? বুঝেছি, মনের মত নাগর পেয়েছিস, এখনতো পিশাচ বলবিই তুই আমাকে।

থাম তুমি, থাম।

কেন থামব কেন ? তোর ভাল না লাগে তুই বেরিয়ে যা। বেরিয়ে যা তুই এখান থেকে হারামজাদী মাগী।

তাই যাব, তাই যাব।

রাগের মাথায় ভগবান বেরিয়ে যেত বলেছিল তরলাকে। বলেছিল যদি এতেও তার শিক্ষা হয় এই ভেবে। কিন্তু যে মেয়েছেলে একবার পর পুরুষের রসে মজেছে, তাকে ঘরে ফেরানো শক্ত। ওর বাবা বলত, ছাড়া গরু আর বারমুখো মেয়েমানুষ কখনও ঘরে রাখা যায় না। তারা দড়ি ছিঁড়ে পালাবেই একদিন। তরলাও পালিয়েছিল। বাদলের বাড়ি বেলগাছিয়া না কোথায়। সাত নম্বর বস্তীতে সে আসত তার বোনের বাড়ি। সেইখানেই তরলাকে দেখেছিল সে। দেখে মজেছিল। কে আগে মজেছিল বলা শক্ত। বাদলের কালো কুচকুচ শরীর, ছোকরা বয়স মাথায় একমাথা চুল। সে তখন কোন প্ল্যাসটিকের কারখানায় কাজ করে। তরলা তাকে নিজেই ওদের বাড়ি ডেকে এনেছিল। ভগবানের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

ভগবান সে সময় একবার অসুখ থেকে উঠেছে। কাহিল চেহারা। চোখ দুটো বসে গিয়েছে। বাদল চলে গেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছিল নিজকে, সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। তারপর প্রায়ই আসত বাদল। বস্তীর লোকেরা আড়ালে হাসাহাসি করত। একদিন বস্তীরই কিছু ছেলে

ভগবানকে বলে গেল, বেপাড়ার লোক এসে তোমার বউর সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করে যাবে আমরা তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারব না। তুমি একটা বিহিত কর নয়ত আমরা ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব ওই ছোকরার।

তারপরেই একদিন শরীর খারাপ হওয়ায় দুপুরেই বাড়ি চলে এসেছিল ভগবান। দরজা তখন ভেতর থেকে বন্ধ। ঘা দিতেই তরলা দরজা খুলেছিল। আর ঘরের ভেতর থেকে তাকে ধাক্কা দিয়ে এক লহমায় যে লোকটি পালিয়ে গিয়েছিল তাকে চিনেছিল ভগবান, সে বাদল।

না, ভগবান ধৈর্য হারায়নি। সে শুধু বলেছিল তরলাকে—বেরিয়ে যা তুই বেরিয়ে যা। এ মুখ আর আমার সামনে দেখাস না।

তরলা চলে গিয়েছিল সেইদিনই।

এসব চার বছর আগের ঘটনা। তারপর ভগবান আবার অসুখে পড়েছিল। হাসপাতালে একমাস থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিল, তখন তাকে চেনা যায় না। শীর্ণ চেহারা দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে ঢাকা মুখ, একটা অরণ্যের হিংস্র জানোয়ারের মত। সে দিনরাত কাশত খক খক করে। আর আপন মনে গালাগাল দিত বিড় বিড় ক'রে।

তাকে দেখে জেলরবাবু বলেছিলেন, এইবার তোর চেহারাটা ঠিক জহ্লাদের মত হয়েছে ভগবান। একেবারে টিপিক্যাল জহ্লাদ!

ভগবান হেসেছিল। বলেছিল, মরতে মরতে বেঁচে উঠেছি ছার। একমাস হাসপাতালে। জেলের সেই কর্মচারী বলেছিলেন, তোর মরণ কি এত সহজে হবে ভগবান। তুই মরে গেলে, ওই ওদের ফাঁসীতে ঝোলাবে কে?

তরলার খবর মাঝে মাঝে পেত ভগবান। দুটো বাচ্চা হয়েছে তরলার। বাদলের শখ মিটে গিয়েছে। যে কারখানায় কাজ করত সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে বেকার। ওয়াগন ভাঙ্গার দলে যোগ দিয়েছে এখন। তরলা লোকের বাড়ি ঝিগিরি করে। মদ খেয়ে এসে প্রতিদিনই তরলাকে ধরে পিটোয় বাদল। ভগবান মনে মনে হাসে। আর আপন মনে বিড় বিড় ক'রে বলে, ঠিক হয়েছে। ভগবান তুমি আছ তাহলে।

অনেকদিন পরে এই জেলে আবার ফাঁসী হচ্ছে। প্রায় এক বছর, হ্যাঁ এক বছর হবে। এক বছর পরে ফাঁসীর খবর শুনে জেলখানায় সাজো

রব পড়ে গিয়েছে। আই, জি, প্রিজন নিজে এসে সব তদারক করে গেছেন। যে লোকটার ফাঁসী হবে এক মণ দশ সের ওজন তার। বছর চল্লিশেক বয়স। তার সমান ওজনের বালির আস্থা ঝুলিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে ফাঁস ঠিকমত আঁটছে কিনা। দড়ি কিনে মোম লাগানো হয়েছে ক'দিন ধরে। যারা গার্ড অব অনার দেবে সেই সব সিপাইদের ড্রিল হয়েছে ক'দিন ধরে। ভগবান আগের রাতে গিয়ে হাজির হল। সারা জেলে একটা দারুণ কর্মব্যস্ততা।

এই যে এসে গেছ, আমি ভাবছিলাম। খাতির ক'রে টুলের ওপর বসালেন ভগবানকে। যেন আজকের পূজোর পুরোহিত। সভার সভাপতি। জহ্লাদ যদি না থাকে তাহলে ফাঁসী হবে কি করে।

দেখিস বেশী খেয়ে চুর হয়ে থাকিসনে যেন আবার। জেলর ঠাট্টা করেন।

ভগবান ঘাড় নাড়ে। ওর ঘাড় নাড়া দেখে জেলর হেসে ওঠেন।

ইস বেটা একেবারে ধর্মপুত্তুর !

সেই কর্মচারীটি বলেন, এটাই বোধহয় তোর হাতের শেষ ফাঁসী ভগবান। ফাঁসী উঠে যাচ্ছে। এবার থেকে খুন জখম রেপ যাই করনা কেন, বড় জোর বারো বছর জেল খেটে শুদ্ধি হয়ে ফিরে আসবি।

জেলর বললেন, এটা কি ভাল হচ্ছে। এই দেখুন না কেন এই কেসটা —নিজের বউ আর তার লাভারকে কুচি কুচি করে কেটেছে। তারপর মাংসের টুকরোগুলো বস্তায় করে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে ফেলে এসেছে। কী নৃশংস ভাবুন তো। ফাঁসী ছাড়া আর কোন শাস্তির কথা ভাবা যায় !

ঃ কেন খুন করেছে হুঁজুর ? কি বললেন ?

জেলর বলেন, ওর বউটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরপুরুষের সঙ্গে থাকত। তাই দেখতে পেয়ে—। ওরা হল দখণের লোক। বাড়িতে কালীপূজোর খাঁড়া ছিল, সেই খাঁড়া দিয়েই—।

সারাটা রাত ধরে বসে বসে ভাবল ভগবান। ওর বউটা নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। রাগ সে সামলাতে পারেনি। দুঃখে, জ্বালায় সে খুন করেছে। লোকটাকে তার দেখতে ইচ্ছে করছে এখনই। যদি এখনই পারে এখনই। নয়ত কয়েক ঘণ্টা পরেই তো সব শেষ হয়ে যাবে। অবশেষে দেখল লোকটিকে। বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা। শ্যামবর্ণ গায়ের রঙ। শখ করে রাখা গোঁফ। বাবরি চুল। উদ্‌ভ্রান্ত চোখের দৃষ্টি। না, ওকে খুব বেশী জোর করতে

হয়নি। ও আস্তে আস্তে হেঁটে এল ফাঁসীর মঞ্চ পর্যন্ত। তারপর ওর হাত দুটি পিছমোড়া ক'রে বেঁধে দেওয়া হল। মুখে ঠুলিটা পরিয়ে দিতে যাবার সময় চিৎকার করে উঠল লোকটা—না-না-না-আ-আ।

আর্তনাদ শেষরাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেঙে চুরমার করে দিল। আম গাছের ডালে কয়েকটি পাখি আচমকা ঘুম ভেঙ্গে ডানা ঝটপট করে উঠল। ইলেকট্রিকের আলোয় লোকটার ভিজে চুল বেয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে মাটিতে। কপালে ওটা জল না ঘাম ভগবান তা ঠাহর করতে পারল না।

ওকে চেপে ধর। কুইক। কুইক।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি সিপাই উঠে পড়ল মঞ্চে। তারপর জোর করে তাকে ঠেলে তুলল পাটাতনের ওপরে। ভগবান ওর গলায় দড়িটা পরিয়ে দিল। আর তাড়াতাড়িতে ঘটনার আকস্মিকতায় বলতেও ভুলে গেল সেই মুখস্ত করা কথাটা—আমার ওপর অপরাধ নেবেন না। যা করছি আইনমতে করছি।

আর একমুহূর্ত দেরী না করে পুলিশ সুপার ইংগিত করলেন। রেডি—তারপর একটি হেঁচকা টানে পাটাতনটি সরে গেল। একটা ভারি দেহ ঝুলে পড়ল নিচে। দেহটা থর থর করে কাঁপছে। তারপর নিথর নিস্পন্দ হ'য়ে গেল একসময়ে। সি এম, ও এগিয়ে গেলেন।

জেলখানার ফটক দিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এল ভগবান। এই কিছুক্ষণ আগে একটা মরা মানুষের জন্য বড় দুঃখ হয়েছিল। সে জানে না, কেন দুঃখ হল তার। কারণ, জহ্লাদ জীবনে কোন অনুশোচনাই তার ছিল না।

একসময়, হ্যাঁ একসময় তার মনে পড়ে গেল। কেন দুঃখ হল লোকটার জন্য। বোকা, একদম বোকা লোকটা। মিছিমিছি ফাঁসীকাঠে ঝুলল! ও ভেবেছিল, খুন করেই বুঝি বেশী শাস্তি দেওয়া যায়। কিন্তু খুন না করে বাঁচিয়ে রেখে একটা নীচে নেমে যাওয়া মানুষকে আরও নীচের দিকে ঠেলে দেওয়া যে চরম শাস্তি, ভগবান বুঝলেও ও লোকটা তা বোঝেনি। তরলা আর বাদলকে ভগবান সেই শাস্তি দিয়েছে। কিন্তু ওই বোকা লোকটা বুঝল না। কেউ যদি না বোঝে আমি কি করতে পারি। আমার কোন অপরাধ নেই। আমি যা করেছি তা আইন মতই করেছি।

যে কথাটা ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে তখন বলতে ভুলে গিয়েছিল সেই কথাটাই এখন রাস্তায় চলতে চলতে বিড়বিড় করে বলল ভগবান। যেন সকালের ফাঁসীতে মরা মানুষটা ছায়া হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে।

# মাটি

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দেওয়ালের ওপাশে প্রথমে ফিসফিস করে ডাকছিল—মাটি চাই, মাটি! তারপর যেন শূন্য কুম্ভের ভিতর গমগম করে বল্গে উঠছিল—মাটি, মাটি! এবং শেষে একটা চাপা হিংস্র আর ভৌতিক গর্জনে উচ্চারিত হচ্ছিল—মাটি, মাটি, মাটি! যেন তাকে ফেলে রেখে, তার উপর পা মাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল শব্দগুলো—বদ্ধ জায়গায় আটকেপড়া পাখির ডানা-ঝাপটানির মত নিস্ফল চেষ্টা চলছিল। বাইরের ওই আলোড়ন টের পাবার সময় কোথায় শুয়ে আছি বুঝতে পারছিলুম না। নিরেট অন্ধকারে ঠাসা চারপাশটা। কোথাও একটা মৃদু ক্ষীণ টিকটিক শব্দ। আমি এখানে কেন? পাশ ফেরার চেষ্টা করে চুপি-চুপি প্রশ্ন করলুম—আমি এখানে কেন?

সেই সময় হঠাৎ চোখের সামনের অন্ধকার কেটে গেল। চতুষ্কোণ আলোর উজ্জ্বলতা স্থির হল সামনে। একটা হলুদ খসখসে থাম দেখা যাচ্ছিল। আমার ছেলে টুটুলকে দেখলুম সেখানে দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে।—টুটুল, এদিকে আয়। আমি ডাকলুম। টুটুলকে কেমন ভীত দেখাচ্ছিল। সে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছিল। ফের বললুম—শিগগির আয়!

ও কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার চেতনার ওপর থেকে কী ঝড়ের গতি সব ধুলোবালি মুছে দিল। বুঝতে পারলুম, আমার ঘরেই আমি শুয়ে আছি।

আমার গায়ের উপর লেপ চাপানো। শীতের দুপুরে ছুটির দিনের ঘুমটা সঙ্গে নিয়ে কোথায় ছিল আমার পর্যটন? জীবনে পাহাড় দেখবার বড় সাধ ছিল আমার। একবার মাত্র সরকারী কাজের সূত্রে মাইথন যেতে হয়েছিল। সেই প্রথম হয়ত শেষ আমার পাহাড় দেখা। সেগুলো আসল পাহাড় মোটেও নয়, আমার কলিগ রবি বলেছিল।

আসল পাহাড় হিমালয়ে।···সে কি আর আমি জানিনে? পাহাড় নিয়ে লেখা বিস্তর ভ্রমণ কাহিনীও কি আমার পড়া নেই?···মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ার আগে অদ্ভুত শান্ত সব অরণ্য-ঢাকা পাহাড়তলীর পথে যাত্রীদের সঙ্গে হাঁটবার সুখ কল্পনা করেছি। সেইসব পাহাড়ী মানুষগুলোও ছিল বড় মিশুকে আর বন্ধুবৎসল। আমি তে নিজেকে অন্য এক জন্মের পাহাড়ী মানুষ ভেবে পাহাড়তলীর মেলা দেখে ফেরা যাত্রীদের সঙ্গে জ্যোৎস্নার রাতে মাদল ও বাঁশি বাজিয়ে হেঁটেছি! এবং শীতের দুপুরে লেপের ভিতর থেকে আজ আমি চুপি-চুপি তাই কি কেটে পড়েছিলুম কোন পাহাড়তলীর দিকে, টুটুলদের ফেলে রেখে, আমার চাকরিবাকরি ঘরসংসার সকল দায়-ঝক্কি ফাঁকি দিয়ে? কিন্তু দেখছিলুম, পাহাড়েও সুখ অবাধ নেই। এলিয়টের পোড়ো জমির মত ভয়ঙ্কর শূন্য নিষ্ফল পাথরের চত্বরে জলের ফোঁটার শব্দ শুনতে শুনতে আমি পালাচ্ছিলুম। তারপর কানের কাছে ফিসফিস করে কে বললো—মাটি চাই, মাটি!···

—টুটুল, আমাকে ছোঁও। আমি বললুম! টুটুল ভয়ে-ভয়ে আমাকে ছুঁল। কিছু অস্বাভাবিক লক্ষ্য করছিল হয়ত আমার মুখে।—টুটুল, আমার গা কি গরম লাগছে?

—না তো! টুটুল বললো। তুমি ভীষণ ঠাণ্ডা, জলের মত।

আমি হাসলুম।—তাই নাকি? তোমার মা কোথায়?

—পুতুলদের নিয়ে ডলিদের বাড়ি গেছে।

—তোমাকে বুঝি পাহারা দিতে বলে গেছে?

টুটুল একটু হাসলো নিঃশব্দে।

—হ্যাঁ রে, বাইরে কোন শব্দ হচ্ছিল এতক্ষণ?

—শব্দ? টুটুল যেন অবাক হল এ প্রশ্নে। দশ বছর বয়সী ছেলের চোখের এমন অবাক হওয়া কেমন অশ্লীল দেখায়। সে বললো—শব্দ তো অনেক হচ্ছিল। বিয়ের বাজনা গেল একদল। তারপর, সান্নুদের ছাদে মাইক দিয়েছে না? বুলুর বিয়ে যে!

—ও। একটু চুপ করে থেকে বললুম—আচ্ছা টুটুল, তুই কি শুনেছিস, কেউ মাটি মাটি বলে চিৎকার করছিল?

টুটুল লাফিয়ে উঠলো হঠাৎ—বারে! সেই মাটিওলাটা আজ এসেছিল না? মা মাটি চেয়েছিল, উনুন বানাবে।....ওকে ওবেলা আসতে বলেছি।

মাটি চাই, মাটি? অদ্ভুত এই ডাক। গলির পথে হঠাৎ কখন যেন গর্জে ওঠে, মাটি মাটি! হাসতে গিয়ে ক্রুদ্ধ হয়েছি। এখানে কোথাও মাটি নেই। সব পোড়ামাটি ঢাকা—যেখানেই পা রাখি। তাজা সোঁদাগন্ধভরা আসল আগমার্কা বিশুদ্ধ মাটি কতদিন দেখিনি! সেই লোকটির কাছে যে মাটি থাকে, সে মাটি কি তেমনি বিশুদ্ধ সত্যিকার মাটি? এখানে সবই তো ভেজাল কৃত্রিম আর বিষযুক্ত! লোকটিও নিশ্চয় সত্যযুগের আদমপুত্র নয়।···আমার মধ্যে তীব্র একটা আকুতি নিষ্ফলবেগে ছোটাছুটি করতে লাগলো। ও যদি আমার ছেলেবেলায় দেখা সেই সত্যিকার মাটি দিতে পারে, কৃতজ্ঞতায় আমার চোখ ছল ছল করে উঠবে। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—ওকে আমার পরম বান্ধব বলে মানবো ·· আর যদি তা না হয়, যদি না হয়! ওই লোকটাকে আমি খুন করে ফেলবো।

অদ্ভুত ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে আমি লেপ উল্টে দিলুম পায়ে ঠেলে। ধুড়মুড় করে উঠে বসলুম। কার উপর ক্রোধ আমি জানি নে; অথচ এখনই একটা ভয়ঙ্কর কিছু করতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

বাইরে বারান্দায় এসে দেখলুম সূর্যের আলো এখনও ফুরিয়ে যায়নি শহর থেকে। উঁচু ঘরবাড়ির দেয়ালে বিকেলের নরম রোদ ঝুলে আছে। ছাদে কোথাও কেউ বা কারা বসে আছে, তাদের দেখাচ্ছে সুখী রাজপুত্রদের মত—পৃথিবীর সব রকম আপদ পায়ে মাড়িয়ে ওরা অনেক উপরে পৌঁছে গেছে। আর দূরের আকাশে কোথাও চিরকালের এক নীলকণ্ঠ পাখি বসে থাকা দেখছে ওরা। ফিরে এসে নাতিপতিদের সে গল্প শোনাবে। গল্প চলবে বংশপরম্পরা—পৃথিবী যত দিন বেঁচে থাকবে। বড় হেরে যাচ্ছি আমি—এই দুঃখে ঝটপট উঠোনের খোলা সিঁড়ি বেয়ে একতলা ঘরের ছাদে চলে গেলুম। কোথাও কোন রোদ নেই। চার পাশের উঁচু দেয়াল সব ঢেকেছে সেখানে। কেবল একফালি রোদ আকাশের এক টুকরো ঝরাহাসির মত কোণে পড়ে আছে—যেমন করে ছেলেবেলায়

গাছের নীচে মিয়ানো শেষ ফুলটিকে ধুলো থেকে দ্রুত কুড়িয়ে নিতুম তেমনি দ্রুত আমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। অথচ অবিশ্বাস আমার চোখে হাতচাপা দিচ্ছিল পিছন থেকে। এ কি সত্যিকার রোদ? আঃ, গঞ্জের নদীতীরে মাঠের বুকে পড়ে থাকা সেই রোদ কতদিন আমি দেখিনি।

অনেক ছুটির দিনে গড়ের মাঠে হেঁটেছি। মসৃণ ঘাসের উপর বসেছি। গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি। গঙ্গার ধারে জল নৌকো ও জাহাজগুলো দেখতে এগিয়ে গেছি। তখনও এমনি করে অবিশ্বাস পিছন থেকে দুষ্টুমি করে আমার চোখে হাত রেখেছে। সব মিথ্যা, মেকী আর বানানো দেখনি না কি? এই শহরে অধুনা প্লাস্টিকশিল্পের উৎকর্ষ ও সমাদর প্রবল। এই শহরের পথে ফেরিওলাদের হাতে বিস্তর নকল ফুল। একদিন আমার স্ত্রী টুনু একটা রজনীগন্ধার মালা কিনেছিল—সেটা প্ল্যাস্টিকের। আমি বলেছিলুম—সামনে মাসের পয়লা তোমাকে একটা খাঁটি রজনীগন্ধার মালা কিনে দেব। মনে পড়ছে, দিয়েছিলুম কিনে। অথচ সারা রাত তার খোঁপায় জড়ানো রজনীগন্ধার সব গন্ধ ও স্পর্শ আমাকে সহজ বিশ্বাসের সুখ দেয়নি! মনে হচ্ছিল—এর চেয়ে আরো খাঁটি আরো টাটকা রজনীগন্ধা ফুটতো আমাদের গঞ্জের সেই গ্রাম্য উঠোনে। তুমি খুব সন্দিগ্ধ। টুনু বলেছিল। সে গজগজ করেছিল, সব তাতেই তোমার খুঁতখুঁতেমি। খুব ভালো জিনিস দেখেও বলবে, আরো ভালো আছে··· ঠিক তাই। আরো ভালো, যাকে বলে, চরম ও পরম ভালো—তা তো আছেই কোথাও। এবং এর ফলে ট্রামে কি বাসে, কিংবা হেঁটে যেতে যেতে যেসব প্রাকৃতিক জিনিস আমি দেখেছি এ শহরে, আরো পাঁচটা বানানো জিনিসের সঙ্গে তাদের কোন পার্থক্য থাকে না। এমন কি এক ব্ল্যাকআউটের রাত্রে সারকুলার রোডের পূর্বে গোল চাঁদ দেখে আমি চমকে উঠে ভেবেছিলুম, বিদেশী উপগ্রহ নাকি।

একথা সত্য, খুঁতখুঁতে মন নিয়ে কিছু বিচার করা কঠিন। মাঝে মাঝে নিজের এই খুঁতখুঁতেমির প্রতি ভীষণ বিরক্ত হই। 'অনেক ভালো'র তীব্র আলো সম্ভবত কবে কোথাও দেখেছিলুম; সেই আমাকে খেল। 'কিছু ভালো' আমার চোখে পড়ে না। এ পৃথিবীতে আমার

যাত্রা ছিল সেই অনেক ভালোর দিকে। কোথাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিলুম, কে জানে। মাঝে মাঝে ডেকে বলি, মাতলি, তোমার সপ্তাশ্ববাহিত পুষ্পক জাহান্নমের দুয়ার ঘেঁষে চলেছে যে।

একটা বিশ্বাস থাকলে তাতে পরগাছার মত অনেক অবিশ্বাস গজিয়ে ওঠে। অনেক অবিশ্বাস ঢেকে ফেলে বিশ্বাসের মসৃণ কাণ্ডটা। কোথাও অপরিমিত সুখ আছে?…খাঁটি জিনিস আছে, ন্যায্য দর সঠিক ওজন নির্ভেজাল? আহা, কোথায় কোন বাজারে চৌমাথায় সেই সমবায় ভাণ্ডার, নির্দ্বিধায় যার সভ্য হতে পিছপা হব না? জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষায় চরম সুখের প্রজাপতি-ফসকে যাওয়া রঙের ছোপ লেগে গিয়েছিল, হাতের চিটচিটে রঙছোপভরা তালু মুঠোয় লুকিয়ে আমাকে পথ চলতে হচ্ছে। গঞ্জের স্টেশনে দাঁড়িয়ে একদা ভাবতুম, সব রেলগাড়িই যায় সুখের দেশে—ইচ্ছাপুরণের অতিকায় সব স্কাইস্ক্রেপার যে শহরে দাঁড় করানো, বুঝি সেখান থেকেই বাবা এনে দিতেন পশমী নীল মাফলার, গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত, লাল পেন্সিল, সবুজ সার্ট।

রাত এগারোটায় রেডিও শেষ হলে টেবিল ল্যাম্পের সুইচে হাত দিয়ে টুনু হঠাৎ বললো—দেখ, আমার বড় ভয় হচ্ছে।…

চমকে উঠে বললুম—কেন? কিসের ভয়?

ঘরের স্তব্ধতায় চাপা কণ্ঠস্বর দিয়ে দুঃখের ভাঁজ ফেলে ও বললো—কদিন থেকে ঘুষঘুষে জ্বর হচ্ছে। বমিভাবও আছে। আবার নাকি…

বাধা দিয়ে হাসলুম—ধেৎ! আবার কী? ব্যবস্থা তো করা হয়েছে।

আমার ছেলে টুটুল ভীষণ কৌতূহলী এবং সে তখনও জেগে ছিল লেপের আড়ালে। হঠাৎ মুখ বের করে বলে উঠলো—কিসের ব্যবস্থা বাবা?

নির্বিকারভাবে বললুম—তোমার কোন ভাই-বোন আর যাতে না হয়। এবং টুনু আমার হাতটা খামচে ধরলো।

—কেন হবে না বাবা?

—হলে মানুষ করতে পারবো না।

—মানুষ হওয়া কী বাবা?

—জানি না। এবার ঘুমোও। ভোরে স্কুল আছে।

একটু চুপ করে থেকে টুটুল বললো—আমি···আমরা মানুষ হবো ?

—হবে···বলেই আমার বাবার মত ভুল করা উচিত নয় ভেবে পরক্ষণে গলা ঝেড়ে ফের বললাম—কী জানি !

—আমি মানুষ হব না।

—কী হবে ?

—ড্রাইভার।

—কেন ?

—গাড়ি চালাতে আমার ভালো লাগে। আর পুতুল কি বলে জানো ? ওর কিছু হতে ভালো লাগে না। কেবল শ্বশুরবাড়ি যেতে খুব ভালো লাগে।

আমরা স্বামী-স্ত্রী ভীষণ হাসছিলুম একথা শুনে, যদিও রাত এগারোটা বেজে গেছে এবং গলির মোড়ে কেলুবাবু মাতাল হয়ে ফিরে রিকশওলাকে দেশজাত তুলে গাল দিচ্ছিলেন। শেষে বললুম, আর মিঠুলের কী ভালো লাগে জানো ?

—পুলিশ হতে।

বড় চমৎকার ছিল এসব কথাবার্তা। শেষে টুনু বললো—আমরা ছেলেমেয়েদের দিকে বেশী মনোযোগ দিই নে; খুব ভুল হচ্ছে। এবার ওদের একটু দেখাশোনা করবে কি ?

—কেন, তুমি তো রয়েছো !

—আহা, কী থাকা ! ঘরকন্নার দায় কাঁধে, একটা ঝিও নেই, দুবেলা নিশ্বাস ফেলার যো নেই···

—আচ্ছা, টুনু, ছেলেবেলায় সবারই একটা করে ইচ্ছে থাকে, সে কী হবে। তোমার কী ছিল ?

—সে আর শুনে কী হবে !

—আহা বলই না শুনি।

—কী জানি, ভুলে গেছি !

টুটুল ব্যস্তভাবে বলে উঠলো—আমি জানি বাবা। তুমি যখন ঘরে নেই, মা বলে—কত সাধ ছিল···এই সময় মা উঠে তার ছেলেকে ঠাস-ঠাস করে চড় মারতে থাকলে আমি খুবই অসহায় বোধ করলুম। আমার

শরীরের ভিতরে বাহিরে সকল কোষ—যা পিতৃকোষ ছাড়া কিছু নয় এই আমার ধারণা, আস্তে আস্তে ক্যান্সারকোষে পরিণত হচ্ছিল। দুঃখ ও পরাজয়ের গ্লানিতে স্যাঁতসেঁতে অপরিচ্ছন্ন হচ্ছিল মন এবং আর কোনদিনও ছেলেপুলের বাপ হতে পারবো না—ভাবতে ভাবতে দেখছিলুম, আমার অজাত সন্তানেরা অসম্ভবের তীব্র স্রোতে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে ভেসে চলেছে নরকগামী, এবং মাতলি হে, তোমার পুষ্পক আর কোনদিনও স্বর্গে ফেরার পথ খুঁজে পাবে না, একথা নিশ্চিত জেনো।

আমি যখন খুবই ছোট ছিলুম, দেবতাদের সেই বন্ধুবৎসল রাজার কথা শুনেছিলুম। তিনি পৃথিবীর বন্ধুদের তাঁর স্বর্গরাজ্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে পুষ্পক-রথ পাঠান যার সারথির নাম মাতলি। কতকাল তার প্রতীক্ষায় ছিলুম। আমার দুয়ারে কবে তার চাকার ধ্বনি বাজবে, পারিজাত-সৌরভে আমোদিত হবে আমাদের ছোট্ট বাড়িখানি! সন্ধ্যায় শঙ্খ বাজলে চমকে উঠে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছি। আকাশের দিকে তাকিয়েছি ব্যাকুল অন্বেষী চোখে। পাংশু আকাশে কোথাও কয়েক পোঁচ লালচে রঙ, কোথাও জাগছিল কালপুরুষের ধনুর্বাণের শেষ বিন্দুতে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি, শিরীষগাছের শীর্ষদেশ পেরিয়ে উড়ে আসছিল নিঃসঙ্গ কোন পাখি। যারা বাইরে ছিল সবাই ঘরে ফিরে আসছিল অবিশ্বাস্য দ্রুততায় এবং তারপর অন্ধকার ঘন হয়ে এলে পার্থিব সকল দৃশ্য ও বাস্তবতা যত্ন করে যেন ঢেকে দেওয়া হল অপবিত্র বস্তুপুঞ্জের মত—কেন না মাননীয় অতিথি এখনই এসে পড়বেন যেকোন মুহূর্তেই—দেখ, মাথার উপর কারুকার্যখচিত চন্দ্রাতপ, ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, ফুলের গন্ধ ছুটেছে পথে-পথে, তুমি প্রস্তুত হয়েছো তো?

এমনি করেই আমার রথারোহণ ঘটেছিল।

অথচ পথ ভুল করলো পুষ্পক। স্বর্গরাজ্যে পৌঁছতে পারলুম না আমরা। যে পথে যাই নরকের দুয়ার, অতিকায় যমদূত, দুঃখের পথের দুপাশে ভীষণ শব্দে শেল ফাটে; সুতরাং চক্ষে যা অবিশ্রাম ক্ষরিত, তা অশ্রু বলে ভুল করো না মাতলি হে! তোমার দেবশরীর অনশনে অনশনে শীর্ণ, দুশ্চিন্তায় মস্তিষ্ক উত্তপ্ত, তোমার দেবকান্তি নিষ্প্রভ—আজ তুমি আমার মত নরকবাসের আশঙ্কায় ক্লিষ্ট। এবং এখন আমরা মধ্যদেশে।

—অত কী হবে ?

—ভাঙা বালতি আছে দুটো। টবও কেনো। ওবেলা নার্শারী থেকে কিছু বীজ এনো কয়েক রকম···টুটুল সোৎসাহে হাততালি দিল।—ফুল ফুটবে, ফুল ফুটবে !

পুতুল বললো—না, বেগুন।

মিঠুল বললো—না, না, মুলো। মুলো খেতে খুব ভালবাসি বাবা।

আমি বললুম—এখন তো বসন্তকাল পড়ে যাচ্ছে···

বাসররাতের টুনু ফিরে এসে বললো—বেশ তো, ফুলের চাষই করবে। বসন্তে কী ফুল ফোটে গো ?

মাটিওলার হৃদয় গলে পড়ছিল—বাবু মাটির কদর কেউ আর বোঝে না !

আমি খানিকটা মাটি তুলে নিয়ে শুঁকলুম। যেমন করে একদিন গঞ্জের মাঠে সরিষার ক্ষেতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে নাক রাখতুম—ঠিক তেমনি। পরক্ষণে যেন চাবুক খেয়ে শিউরে উঠলুম। একটা উৎকট তীব্র ঝাঁঝালো দুর্গন্ধে আমার বমি এসে গেল। দ্রুত মাটি ফেলে দিয়ে নাকে হাত রাখলুম। রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বললুম—মাটিওলা সত্যি বলো এ মাটি কোত্থেকে এনেছো ?

—বিশ্বাস করেন বাবু, অনেক দূরের এ মাটি···

—মিথ্যুক কোথাকার। এ মাটি এখানের নর্দমা থেকে তোলা পচা···

—বাবু অনেক কষ্টে আনা মাটি, আমার খুরপীটা দেখুন।

টুনু বললো—চেঁচামেচি করে কী হবে ? কলকাতার নীচেটা তো এই। ওর কী দোষ ? কলকাতার নীচেটা এই।···কথাটা নতুন করে যেন জানা গেল। আরে তাই তো তাই তো ! মাটিওলার দিকে আঙুল তুলে বললুম—যাও, ভাগো !

—বাবু, আপনার পায়ে পড়ি, অনেক ঘুরেছি। পেটে দানাপানি নাই....

—ভাগ্ ব্যাটা জুয়াচোর !

—মাটি নেবেন না বাবু ?

টুনুও বললো—না। কোনদিন আসল মাটি আনলে নিতে পারি।

মাটিওলা আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল। আড়ষ্টভাবে সে ডাকছিল—

মাটি, মাটি! তারপর ক্লান্ত উলঙ্গ তার শরীর চলতে চলতে হঠাৎ থামলো। সে পিছন ফিরে এগিয়ে এল। বললো—বাবু কথা দিলাম, আপনার জন্যে আসল মাটি একদিন এনে দেবো। নেবেন তো?

—নেবো।

—এই থলে ভরতি মাটি আনবো। পলাশডাঙা চেনেন বাবু পলাশডাঙা? সেখান থেকেন আনবো। দাম কিন্তু একটু বেশীই লাগবে…

বললুম—যা চাও দেবো।

—পলাশডাঙা আমার বাড়ি ছিল বাবু। আহা, অমন মাটি ভূ-ভারতে নাই। গেছেন কখন ওদিকে? কতরকম ফসল ফলে, আহা, মা বসুমতী বুক উজোড় করে সব দিয়েছেন সেখানে? শুধু আমিই এক হতভাগা…

চোখ মুছতে মুছতে ও চলে গেল। আমার পরিবারে একটা বিপুল প্রতীক্ষা রেখে সে এগিয়ে গেল। স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা সেই মাটিতে কী কী ফলাবে, তাই নিয়ে পরস্পর আলোচনা করছিল।

আমি ভাবছিলুম, ওই মাটি পেলে আমি কি পারিজাত ফোটাতে পারি, যে পারিজাতের গন্ধ দূর শৈশবে আমাকে বিপন্ন করেছে?

আমাদের প্রতীক্ষায় রেখে যে চলে গেল, সে আর ফিরলো না। কত গভীর রাত অবধি আমরা তার কথা বলাবলি করতুম পরস্পর। আর আমি শোনাতুম, ছেলেবেলার অজস্র গল্প—গঞ্জের মাটিতে যে ছেলেবেলা কেটেছিল আমার। টুটুল বলতো, সে একটা আশ্চর্য ফুল ফোটাবে। টুনু বলতো—উনুন করে কী হবে! বরং একটা লাউবীজ পুঁতে দেবো। পিসিমার বাড়ি দেখেছি, মাচানে ঝোলে সব—কী সুন্দর না লাগে, যেন ইয়ের মত।

আমি বললুম—ছেলেপুলের মত কি?

—যাও! বয়স হয়েছে, এখনও অসভ্যতা।

আমি ওকে আকর্ষণ করলুম। ও ফিসফিস করে বললো, ওরা ঘুমোয়নি।

—টুনু! আমি ডাকলুম।

—উঁ?

বলতে গিয়ে থেমে যেতুম। কারণ কথাটা আমার কাছেও স্পষ্ট নয়।

আমার মধ্যে দিনেদিনে অদ্ভুত একটা ভয় বাড়ছিল। পলাশডাঙার মাটির কথা ভাবছিলুম। আমি কত ব্যর্থ হয়ে বেঁচে আছি এই শহরের নিষ্ফলা বন্ধ্যা মাটির মত—পচা আর দুর্গন্ধভরা! আমি আর ছেলেপুলের বাপ হতে পারবো না। প্রকৃতি খুব ভিতর থেকে আমার পোড়ো জমিতে হলকর্ষণ করছে তুখোড় চাষার মত। অজস্র প্রজন্মের নিঃশব্দ কান্না তার ভাঁজে-ভাঁজে! মাতলি, স্বর্গরাজ্যে কোথায় জন্মায় পারিজাত তরু? মাটি তো চাই-ই, অন্যরকম হোক না সে মাটি! এবং সে মাটি জন্মদান করে। অসংখ্য পারিজাতে ভরে ওঠে নন্দনকানন। মাতলি হে, শূন্যে বড় জ্বালা। স্বর্গরাজ্যের পথভুলে জাহান্নমের দরজায়-দরজায় উঁকি মারে তোমার পুষ্পক-রথ। দেখ তার ধ্বজাধারী চূড়া কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে! আর কতকাল মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হবে জন্মহীন অন্ধকার পথেপথে, কতকাল?

তারপর একদিন আপিস ফেরার পথে দেখি রাজভবনের প্রাঙ্গণে বিশাল শিমুলগাছ লাল ফুলে ভরে গেছে। দক্ষিণের হাওয়া ছুটেছে গঙ্গার প্রান্ত ঘেঁষে। পথের উপর শুয়ে আছে এক রোগী, তার শিয়রে খাঁচায় রাখা সবুজ টিয়াপাখি, তার উপাধান হয়েছে তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ। দুটো পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে এগোতেই কে ওপাশে ফিসফিস করে উঠেছিল—বাবু, বাবু!

বললুম সবিস্ময়ে—আরে তুমি! এখানে যে? শুয়ে আছ কেন—কই, কোথায় তোমার পলাশডাঙার মাটি?

অনেক শুয়ে থাকা লোকের মধ্যে একজন লোক সেই মাটিওলা বললো—'কাল' আমাকে খেল বাবু, আমার আর যাওয়া হল না।

যাওয়া হল না! তবে কে আনবে সেই পবিত্র সোঁদাগন্ধমাখা ফলনশীল মাটি? প্রতীক্ষায় আমরা বংশ-পরম্পরা বুড়ো হতে হতে বুড়ি হতে হতে মরে যাবো! আর, চকিতে পাশে চেয়ে দেখি, সারথিবিহীন রথ দাঁড় করানো, ভগ্নচক্রধ্বজা বিশাল পুষ্পক। মাতলি, তুমি অবশেষে মাটিওলার বেশে শুয়ে আছো অনেক শুয়ে থাকা লোকের পাশে—যারা নানারকম পার্থিব ও স্বর্গীয় মাটির অন্বেষণে যাত্রা করেছিল। মাতলি, অপেক্ষা করো, আমাকেও তোমার পাশে যেতে হবে। ওই ঘর-ছাড়া পরিবারের মত আমার স্ত্রী টুটুল-পুতুল-মিঠুল আমার পরিবার, ফুটপাতে এসে শুয়ে থাকবো। আমরা কোনরকম মাটি আর ফিরে পাবো না। সারথিবিহীন শূন্য ভগ্নবপু রথ মরচে ধরে একটু একটু করে ভেঙে গুঁড়ো হতে থাকবে দিনের পর দিন।

ওদিকে স্বর্গের রাজা আমাদের প্রতীক্ষা করে। তার প্রেরিত প্রিয় রথের অপেক্ষা করে।